স্মৃতির শেষ পাতায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড্
৩৩, কলেজ রো : কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

ওঁ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চিন্তাশীলেষু,

আপনি "শৃণ্বন্ত" পত্রিকায় জ্যোতির্ময় শ্রীঅরবিন্দের যে-জীবনী লিখছেন প'ড়ে আনন্দ পেয়েছি ব'লেই আমার "স্মৃতির শেষপাতায়" আপনাকে উৎসর্গ করছি। শুধু মহাপুরুষদের জীবনী নয়, নানা অমহান্ পুরুষ-এর জীবনীও আমার মন টেনে এসেছে আশৈশব। রম্য সাহিত্য বলতে আমি বুঝি—সবপ্রথম গান ও কবিতা, তারপরে উপন্যাস ও নাটক, তারপরে জীবনী ও প্রবন্ধ। আমার নিজের জীবনী আমার নানা রচনায়ই লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তবু মন মানা মানে নি—আমি চেয়েছি আমার জীবনস্মৃতি যথাপর্যায়ে লিখতে। আমার "স্মৃতিচারণ"-এ দুখণ্ডে আমি যা লিখেছি তার জের টেনেছি "স্মৃতির শেষপাতায়"। কিন্তু এর পরে আমাদের পুনা আশ্রম-জীবনের কাহিনী লিখে আমার দপ্তরে রেখেছি, আশাকরি কোনোদিন কোনো সদয় প্রকাশক ছাপবেন—আমার দেহান্তের পরে।

"স্মৃতির শেষপাতায়" নামটি তাই সমীচীন হয় নি, যেহেতু এর পরে লিখেছি—"স্মৃতির জোয়ারে দুকূল ছেয়ে"—পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গানের অন্তরা। এরও পরে আছে আমাদের হরিকৃষ্ণ মন্দির-এর আশ্চর্য ইতিহাস। কিন্তু সে-বিচিত্র অধ্যায় এখনো লেখা হয় নি। আশা করি বেলাশেষের আগে লেখা সম্ভব হবে। যদি হয় তবে সব জড়িয়ে অন্তত তিনচার হাজার পৃষ্ঠার আত্মজীবনী লেখা হবে। এত দীর্ঘ আত্মজীবনী আর কেউ কখনো লিখেছেন ব'লে আমার মনে হয় না। তবে লেখার মূল্য তার বহরে নয়—রসোত্তীর্ণতায়। তাই এই বইটি প'ড়ে যদি ভবাদৃশ দরদী মনীষী আনন্দ পান তবে সেই হবে আমার লেখার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

ইতি

ভবদীয় গুণগ্রাহী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বম্বে

চৈত্র, বর্ষশেষ, ১৩৮০

ভূমিকা

আগেও বলেছি, তবু আবার বলি—স্মৃতিচারণ আত্মজীবনী নয়। আত্মজীবনীতে লেখক তাঁর জীবনের ক্রমবিকাশের একটা ধারাবাহিক ছক কেটে চলেন নানা ঘটনা চিন্তা ও মন্তব্যের মাধ্যমে। স্মৃতিচারণ—যাকে ইংরাজিতে বলে reminiscences—হ'ল নানা বাছাই-করা ঘটনার মালা-গাঁথা—যতদূর সম্ভব গল্পের সূত্রে। "যতদূর সম্ভব" বলছি, কারণ স্মৃতিচারণে গল্প ছাড়াও আর একটি উপাদান থাকে—চরিত্রচিত্রণ। আমি আমার স্মৃতিচারণে বিশেষ ক'রে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি যেসব স্মরণীয় মানুষকে আমি দেখেছি কাছ থেকে। আমার কাছে মহনীয় চরিত্রই চিরকাল বেশি স্মরণীয় মনে হয়েছে। তাই আমার ইতিপূর্বে প্রকাশিত "স্মৃতিচারণে"-র দুটি ভাগেই প্রধানত মহানুভব মানুষেরই ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছি। ফলে বইটি দুভাগে দাঁড়িয়েছে আটশো পাতা। কিন্তু তবু অনেক স্মরণীয় বন্ধু বান্ধবীর ছবিই বাদ প'ড়ে গেছে—এবং কয়েকজনের ছবি ফলিয়ে তোলা হয় নি সরস ক'রে। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের কথা বলেছি আমার "স্মৃতির শেষপাতা"য়—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের দেহলিতে পৌঁছানো পর্যন্ত। তারপরে আরো তিনটি পর্ব আছে: পণ্ডিচেরিতে আমার আশ্রম জীবন, পণ্ডিচেরি ছেড়ে পর্যটক জীবন, সবশেষে বিশ্বভ্রমণ সেরে ১৯৫৯ সালে পুনায় হরিকৃষ্ণ মন্দিরে কায়েম হ'য়ে এক অভিনব মন্দির-আশ্রম জীবন—যার জের টেনে এখনো চলছি বার্ধক্যের আক্রমণেও হার না মেনে। কিন্তু শুধু বার্ধক্যের ব্যক্তিগত বাধাই নয়—এ-যুগে ভাগবত আশ্রমের পত্তন সম্ভব হ'লেও প্রতিষ্ঠার পথে বাইরের বাধাও কম দুস্তর নয়। তবু শেষ ডাক আমার আগে এ-অধ্যায়টি সমাপ্ত ক'রে যেতে চাই।

কেন চাই?—প্রধান কারণ—এর বাদী সুর হবে মুখ্যতঃ ধর্মীয় অনুভূতি উপলব্ধি দর্শনাদির সমাবেশ। এ-পর্বটি সমাপ্ত করবার সময় পাব কি না বলতে পারি না। তবে আশা করি—যে-অলক্ষ্য নিয়ন্তা আমাকে তাঁর চরণে শরণ দিয়ে আমার নানা তৃষ্ণায় জল জুগিয়েছেন, তিনি আমার এ-আকাঙ্খাটিকেও রূপ দেবার শক্তি দেবেন। তাঁর ডাকেই তো আমি পঞ্চাশ বৎসর আগে চলতি রাজপথ ছেড়ে "গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথে" পা বাড়িয়েছিলাম। শেক্সপীয়র ঠিকই ধরেছিলেন যখন তিনি হ্যামলেটে লিখেছিলেন: "There is a divinity that Shapes our ends rough-hew them how we will," কবির এ-উক্তিটি যে মুখের কথা কি কবিকল্পনা নয় এ-উপলব্ধিভিত্তি প্রত্যয় আমার মনে জেগে উঠেছিল বিশেষ ক'রে

সূত্রে চোখে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমি যে-পথে চলব ভেবেছিলাম সে-পথ থেকে তিনি বার বার আমাকে অন্য পথের পথিক করেছিলেন আমাকে এইভাবেই ভেঙে ভেঙে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ব'লে। তাই সে-হাত যদি আমাকে ফের ঠেলা দেয় তবে আমাকে লিখতেই হবে। লিখবার লোভও আছে বিলক্ষণ—আরো এই জন্যে যে, এসব মিস্টিক অনুভূতি আদৌ ঝাপসা (misty) কি নীরস নয়—রকমারি অতিপ্রত্যক্ষ অঘটনের আলোয় দীপ্ত, সমৃদ্ধ। তাই আমার মনে হয় যে, সেসব কথা যদি ফলিয়ে লিখি তাহ'লে ধর্মবিমুখ পাঠকেরাও মানবেনই মানবেন যে, ধর্মজীবনেব স্মৃতিচিত্রণের ষোলো আনাই রসোত্তীর্ণ হ'তে পারে।

যদি সবটুকু লেখা হয় তাহ'লে তার ছক দাঁড়াবে মোটামুটি :

প্রথমার্ধ : স্মৃতিচারণ (১ম ও ২য় ভাগ—যা ছাপা হয়েছে) ৮০০ পৃষ্ঠা
স্মৃতির শেষপাতায় (সদ্যোজাত এই বইটি) ২০০ „

শেষার্ধ : পণ্ডিচেরি-পর্ব—(লিখতে হবে)—আন্দাজ ৩০০ পৃষ্ঠা হবে
অনিকেত পর্ব—(লিখতে হবে)— „ „ „ „
হরিকৃষ্ণমন্দির পর্ব—(লিখতে হবে)—„ „ „ „

অর্থাৎ, একুনে ২০০০ পৃষ্ঠার ধাক্কা। শেষার্ধের প্রকাশক জুটবে কি না বলতে পারি না—কিন্তু সে-ভাবনা আমার নয়: লেখকের একমাত্র নিয়ন্তা—লেখার আন্তর তাগিদ আনন্দের প্রেরণায়।

ঐ যাঃ—একটু চুক্ হ'য়ে গেল: আমার জীবন স্মৃতির যখন পূর্ণ ফিরিস্তি দিচ্ছি তখন অন্যত্র যেখানে যেখানে আমার আত্মকথা প্রকাশ্যে অথবা গুপ্তভাবে আসীন. তাদেরও খবর দেওয়া চাই, যথা :

(৬) তীর্থঙ্কর

(৭) উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল

(৮) ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা—দ্বিতীয় সংস্করণে এর নাম দিয়েছি—ভ্রাম্যমাণ

(৯) ভূস্বর্গ-চঞ্চল—দ্বিতীয় সংস্করণের নাম : কাশ্মীর-পেশোয়ার-এলোরা

(১০) আবার ভ্রাম্যমাণ

(১১) দেশে দেশে চলি উড়ে

এছাড়া আমার নানা উপন্যাসে তথা রমন্যাসে আমার জীবনের অনেক কিছু ঘটনা বেনামীতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। উপন্যাসে, যথা :

(১২) মনের পরশ—দ্বিতীয় সংস্করণে এর নাম দিয়েছি—ভাবি এক হয় আর

(১৪) ধূসরে রঙিন—দ্বিতীয় সংস্করণের নাম, প্রথম সংস্করণের নাম ছিল—রঙের পরশ

রমন্যাসে, যথা।

(১৫) অঘটন আজো ঘটে (১৬) অভাবনীয়

(১৭) অঘটনের ঘটা (১৮) অঘটনের শোভাযাত্রা

(১৯) অঘটনের পূর্বরাগ (২০) অশ্রুহাসি-ইন্দ্রধনু

(২১) আশ্চর্য—এ-কাহিনীটি কবে ফের ছাপা হবে বলতে পারি না

(২২) অঘটনী গল্পমালা (২৩) ছায়াপথের পথিক

(২৪) পতিতা ও পতিতপাবন

এ-আটটি রমন্যাসের মধ্যে অবশ্য কল্পনার কমবেশি মিশেল আছে। (যেমন কিছুটা খাদের মিশেল না থাকলে গহনা গড়া যায় না, তেমনি কল্পনার মিশেলকে বাতিল ক'রে গল্প গাঁথা যায় না।) কিন্তু তবু এ-গুলি স্মৃতিচারণের সগোত্রই বটে। বলতে কি, আমার প্রায় সব রচনাই আত্মজীবনীকেন্দ্রিক। কিন্তু তবু আমার প্রতি রচনাই রম্য রচনা ব'লে তার সুবিচার হবে রসের নিরিখেই, অর্থাৎ রসোত্তীর্ণ হ'লে তবেই সার্থক নৈলে নয়।

আরও দুটি কথা বলার আছে।

প্রথম কথাটি এই যে, আমি এখানে ওখানে একটু আধটু পুনরুক্তি করেছি এইজন্যে যে, একই ঘটনাকে আজ যে চোখে দেখি বা তার যে-ভাষ্য করি—কাল তার রূপ রঙ বদলে যায় ব'লে দর্শন ও ভাষ্যও বদলে না গিয়ে পারে না। মহাকবি গেটে তাঁর DAUER IM WECHSEL কবিতাটিতে এই সত্যটির পরেই জোর দিয়েছেন :

Ach, und in demselben Flusse
Schwimmst du nicht zum zweitenmal

অর্থাৎ

পারে না কেহই দুবার করিতে স্নান একই নদীজলে
নদী ব'য়ে যায়, তাই নব নব রূপ ধরে প্রতি পলে।

গেটের শ্লোকটির নিহিতার্থটিকে আর একটু ফলাও ক'রে বলি : যাকে আমরা অতীত বলি তার কোনো ঘটনাই আজকের দৃষ্টিতে ঠিক সে-রঙে প্রতিভাত হয় না যে-রঙে সে হয়েছিল অতীতে।

দ্বিতীয় কথাটি এই যে, আমি বিশ্বাস করি—আমাদের দেশের ও সংস্কৃতির এ ক্ষয়ের যুগ আবার প্রগতিমুখী হবে এবং এ-প্রগতিকে পদে পদে উস্কে দেয় মহানুভব হৃদয়ের জীবনসাধনা ও কীর্তিকলাপ। তাই আমার এ স্মৃতিকথায় আমি পাঠককে

মনে করিয়ে দিতে চেয়েছি যে, এ-দুর্দিনেও সুভাষ শাপিরো ক্‌াদিয়া ডুহামেল মাসারিক পল রিশারের মতন মানুষ জন্মায় একটা না একটা দাগ রেখে যেতে—তাদের ব্যক্তিরূপের রাগমালায় গাইতে অপরাজেয় প্রত্যয়ে :

যে-স্বপ্ন দেখেছি নেত্রে, করেছি প্রাণে যে-দুরাশার
অঙ্কুরে লালন পূজারীর ম'ত, শুনেছি মধুর
ঝঙ্কার যে স্বপ্নবরদার, ম্লান জাগরণে যার
চেয়েছি অবতরণ : জানি—একদিন সে-সুদূর
চিন্ময়ী উদিবে এই মৃন্ময়ী ধরার বেদনায়
বিলাতে অপার প্রেমে মাটির মানুষে অনিবার'
অমৃত প্রসাদ তার—ঝরায়ে আর্তের নিরাশায়
অচিন্ত্য আনন্দ—সব ত্রুটি চ্যুতি ক্ষমি' মরতার।

১লা বৈশাখ
সন ১৩৮১ সাল
হরি কৃষ্ণ মন্দির
পুণা-১৬

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এক

জীবনীর দুটি রূপ আছে: এক, অপরের লেখা জীবনচরিত; দুই আত্মজীবনী। দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গি উল্টো। অপরের লেখা জীবনী বাইরে থেকে দেখে অন্তর্লীন সত্যকে প্রকাশ করতে চায়; আত্মজীবনী আন্তর দৃষ্টিতে যা দেখে বাইরে তার ছক কাটে। প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির যেমন স্বকীয় সুবিধা আছে তেমনি আছে অসুবিধা। বাইরে থেকে দেখি—বর্ণনীয় মানুষটির আচরণ—অর্থাৎ যা চোখে পড়ে। কিন্তু অনেক সময়েই শুধু বহির্দৃষ্ট ঘটনালোককে দিয়ে মাপা বা ওজন করা যায় না অদৃশ্য অন্তর্লোকের নিহিত সত্য। পক্ষান্তরে, আমার অন্তরের দৃষ্টি আমার কাছে প্রত্যক্ষ হ'লেও তার ভাবরস ঠিক কি ভাবে আমার আচরণে ঝিকিয়ে উঠেছিল তার হদিশ দেওয়াও কম কঠিন নয়। তবু সুলিখিত আত্মজীবনীরই আদর বেশি সব দেশেই, কেন না গভীরের খবর তার মধ্যে দিয়ে যেভাবে ফুটে ওঠে (অবশ্য লেখক আন্তরিক ও সত্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যাতা হ'লে) সেভাবে ফুটে উঠতে পারে না অপরের লেখা জীবনচরিতে। আমি নিজেকে আন্তরিক ও সত্যনিষ্ঠ জিজ্ঞাসু ব'লে মনে করি, তাই আশা করি আমার স্মৃতিচারণ সত্যজিজ্ঞাসুদের কাছে অনাদৃত হবে না। এইটুকু গৌরচন্দ্রিকা গেয়েই পালাগানে নামি। কী ভাবে ফুটিয়ে তুলব আমার জীবনসাধনাকে তার কোনো স্পষ্ট ছক কাটি নি, কাটা হয়ত সম্ভবও নয়। কারণ লেখার ঝোঁক প্রতিপদেই ঢুঁ মারে নানা অচিন অলিগলিতে—কেন ও কী ভাবে—আগে থাকতে তার কোনো দিশা মেলে না। তাই লেখনীকে অনুমতি দেওয়াই ভালো তার মর্জিকে মেনে চলতে। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। কোনো চিত্রী যখন রেখা কাটেন তখন এ ও তা আঁচড়ে কোন্ ছবি কী ভাবে ফুটে উঠবে আগে থাকতে জানতে পারেন না—আঁচড় কাটতে কাটতে এক একটা গোটা ছবি ফুটে ওঠে, কোনোটা স্পষ্ট কোনোটা বা আবছা। তবে চিত্রী যদি সত্যিকার শিল্পী হন তবে সাধারণতঃ তাঁর হাতে নানা আবছা ছবিরও ব্যঞ্জনা যুগপৎ চোখ ও মনকে খুশী করে। আমার "স্মৃতিচারণ" দুটি খণ্ডে নানা ছবি অনেককে আনন্দ দিয়েছে এবার তার শেষ পর্বেও আশা করি সে সমান আনন্দ দেবে। সাহেবী ভাষায় একে বলে অপ্‌টিমিসম্‌। জীবনে বহু ঘা খেয়ে, নানা স্বপ্নভঙ্গের পরে আজও আমি অপ্‌টিমিস্ট্‌ আছি, না থাকলে অন্তরে এ-শেষ অধ্যায় সমাপ্ত করবার প্রেরণা পেতাম না। কারণ জীবনে—বিশেষ ক'রে হাল আমলে—মানুষের দুঃখ কষ্ট দ্বন্দ্ব দোলা দেখ দেখ করতে করতে এতই ফুলে উঠেছে—যে শুধু সে-দুর্দশার ছবি আঁকার বিশেষ কোনো সার্থকতা আছে ব'লে মনে হয় না।

এক চিন্তাশীল ইংরাজ লেখকের একটি উক্তি পড়েছিলাম সুদূর যৌবনে—উক্তিটি আজও আমার মনে গাঁথা আছে: "শুধু বাস্তবকে ফলিয়ে তুলে শিল্প কৃতকৃত্য হয় না, বাস্তব জীবন যে-গভীর সত্যকে ঢেকে রাখে তাকে ফোটাতে না পারলে শিল্পসাধনা পণ্ডশ্রম।" দৈন্যের মাঝে যখন শোচনীয় উপাদান দেখি তখন তাকে আঁকতে যাওয়া—অর্থাৎ বাস্তববাদ, realism—অপচেষ্টা নয়, কিন্তু সে-উপাদানকেই সর্বেসর্বা ব'লে ঘোষণা করলে ভুল হবে কেন না প্রকৃতির বিবর্তনে থতিয়ে মানুষ অন্ধকার থেকে আলোকলোকের দিকেই উধাও হয়েছে, জীবন থেকে মৃত্যুলোকের দিকে নয়। যতই কেন না শোচনীয় মনোবৃত্তিদের নিয়ে হাহাকার করি, যুগে যুগে মানুষ নানা ওঠাপড়া হাসিকান্না ধুপছায়ার মধ্যে দিয়ে উর্ধ্বাভিসারকে বরণ ক'রেই বরেণ্য হ'য়ে উঠেছে—নরখাদক বর্বরতার গুহা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে লক্ষদীপমালিকা শিল্পকাব্য-বিজ্ঞানপ্রেমলোকের আশ্চর্য রাজধানীতে—চন্দ্রাভিযানের মতন অসম্ভবকেও সম্ভব ক'রে। এ-মহাসত্যটিকে আমরা আজকের দিনে প্রায়ই ভুলে যাই চোখের সামনে যে-সব বিভীষিকা ঘটছে তার উৎপাতে। তাই স্মরণ করা ভালো যে জীবনের একটি চিরন্তন সত্য এই যে,—

ঝড় তুফানে নিভলে আলো অকূল পাথারে
হিরণ্ময়ী ধরবে তারার প্রদীপ আঁধারে।
ডাক শুনে যে অপার বাঁশির
দেয় সাড়া—সে অবিনাশীর
পাবেই অভয়—বাঁধবে তাকে কোন সে মায়া রে?

* * * *

দৈব দুর্বিপাকে উৎকণ্ঠায় ভয়ে যে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে অভয় পায় এ একটি ঐতিহাসিক সত্য। থেকে থেকে এক একটি জাতিও পেয়েছে এ-অভয় যার ফলে ইতিহাসের মূল ধারাটিরও মোড় ফিরেছে। মনে পড়ে—এ-যুগে এ-অভয় দিয়েছিলেন মহাবীর চার্চিল যখন বৎসরাধিক কাল (১৯৪০-১৯৪১) ইংলণ্ড একাই দাঁড়িয়েছিল দুর্ধর্ষ জগজ্জয়ী নাজিদের বিরুদ্ধে। স্পষ্ট মনে আছে সে-সময়ে আমাদের পণ্ডিচেরি আশ্রমে দুটি দল গ'ড়ে উঠেছিল: একটি দলের সে কী আনন্দ ইংলণ্ড ডুবল ডুবল ডুবল ব'লে। অন্য দলটির পুরোধা তথা দিশারি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তিনি আমাদের নিষেধ করেছিলেন এ-আত্মঘাতী উল্লাসকে বরণ করতে—বলেছিলেন: মিত্রশক্তি যদি হিটলারের দানবিক নাজি চমূর কাছে হার মানে তাহ'লে মানুষের আত্মিক প্রগতির পথে এমন সব দুস্তর বাধা আসবে যার ফলে তার নৈতিক সংস্কৃতি বা অধ্যাত্ম বিকাশের আলো জ্বেলে রাখা প্রায় অসাধ্য হ'য়ে উঠবে। তাই বহুলোকের নিন্দা সত্ত্বেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন অকুতোভয়েই যে, তাঁর সমস্ত

গশক্তি নিয়ে তিনি মিত্রশক্তির স্বপক্ষেই দাঁড়াবেন। এ সম্বন্ধে আমাকে তিনি দুটি দীর্ঘ পত্র লিখেছেন তাঁর পত্রাবলীতে ছাপা হয়েছে, তাই উদ্ধৃত করলাম না। তীর চার্চিলের প্রাণকে বাজি রেখে হিটলারের বিরুদ্ধে একা দাঁড়ানোকে তিনি অন্তঃকরণে আশীর্বাদ করেছিলেন আরো এই জন্যে যে, চার্চিলের এই চ্যালেঞ্জের কল্যাণেই বিশ্বযুদ্ধের মোড় ফিরেছিল। সাবিত্রীতে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন :

One mighty deed can change the course of things.

আমার নিজের জীবনে অভয়ের প্রতীক তথা অভীপ্সার দিশারি হ'য়ে এসেছিলেন তিনটি মহাজন : শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামীজি ও শ্রীঅরবিন্দ।

(১) শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পাঠ নিয়েছিলাম : "যে আন্তরিক আত্মসমর্পণে মা-কে ডাকবে সে পাবেই পাবে তাঁর শরণ। একটি গান তাঁর ছিল অতিপ্রিয় প্রায়ই গাইতেন শ্রীমুখে : "ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে ?"

(২) স্বামীজির "বীরবাণী"-র আহ্বানে আমার বালক মন সাড়া দিয়েছিল :

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন ভয় কি তোমারে সাজে ?···
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।"

(৩) শ্রীঅরবিন্দ গেয়েছিলেন প্রত্যাসন্ন দিব্যজীবনের সামগান :

I know that thy creation cannot fail···
I know there shall inform the inconscient cells,
At one with Nature and at height with Heaven,
A Spirit vast as the containing sky
And swept with ecstasy from invisible founts,
A god come down and greater by the fall.

জানি আমি সৃষ্টি তব পারে না মানিতে হার শেষে···
জানি আমি এ-দেহের অচেতন অণু পরমাণু
হ'য়ে স্বর্গসম তুঙ্গ, প্রকৃতির মর্মে অনুস্যূত,
উঠিবে জাগিয়া এক অলোক সম্বিতে—বিশ্বম্ভর
অম্বরের ম'ত যে বিশাল—অলক্ষিত গঙ্গোত্রীর
আনন্দের তরঙ্গে বিপ্লুত—যেথা দেবতা স্বয়ং
অবতীর্ণ হ'য়ে হবে দেবতার চেয়েও মহান্।

পণ্ডিচেরিতে আমি তাঁর জ্যোতির্ময় কান্তি দেখি সর্বপ্রথম ১৯২৪ সালে। তাঁর সঙ্গে দুদিন কথালাপও হয়েছিল—যার অনুলিপি লিখে রেখেছিলাম—পরে ছাপা হয় আমার "তীর্থঙ্কর" ও "Among the Great"-এ।

কিন্তু সে অনুলিপি আজ পড়তে গিয়ে দেখি—যে অভয় তিনি দিয়েছিলেন তার সিকির সিকি অনুরণনও আমার রিপোর্টে বেজে ওঠে নি। কী ক'রে উঠবে? তাঁর মুখে যে আশ্বাসের ঝঙ্কার শুনেছিলাম সে-ঝঙ্কারের পিছনে ছিল শুধু তাঁর দীপ্ত মুখ, অভী প্রাণ ও ধ্রুব প্রতীতিই তো নয়—ছিল তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিরূপ। লেখায় এ অমেয় আত্মিক বিকাশের কতটুকু বর্ণনা হয়? তবু কিছুটা হ'তে পারে ভেবেই অনুলিপি লিখেছিলাম—আরো "শ্রীম"-র উপদেশ মনে রেখে: "মহাজনদের স্মরণীয় বরণীয় যা কিছু বাণী শুনবে লিখে রাখবে বাবা, কেমন?" এ-উপদেশটির কথা আমি অন্যত্র লিখেছি একাধিকবার। আজও মনে করতে আনন্দ হয় যে, আমাকে "শ্রীম" এ-অনুলিপিকারের পতাকা-বহনের যোগ্য মনে করেছিলেন। কিন্তু কেন করেছিলেন? আমি তখন মাত্র তেরো চোদ্দ বৎসরের বালক—স্কুলে পড়ি, ভগবান আছেন কি না এ নিয়ে অজ্ঞ হ'য়েও বিজ্ঞ ভঙ্গিমায় সাব্যস্ত করি যে, তিনি যখন অবাঞ্ছনীয় সব কিছুকেই বাতিল ক'রে মানুষকে সব-পেয়েছির দেশে বসিয়ে দিয়ে নিত্যানন্দ পরিবেষণ করতে নারাজ দেখাই যাচ্ছে—তখন তাঁকে অন্তত "দয়াল" উপাধি দেওয়া চলে না। এ-সস্তা অভিযোগ যে ছেলেমানুষি একথা ছেলেমানুষে কেমন ক'রে জানবে? ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে বুঝতে শিখি—"রামকৃষ্ণকথামৃত" প'ড়েই বলব—যে, ভগবানের কাজ কিছুই বুদ্ধির "কম্পুটার" দিয়ে আঁকড়ে পাওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই তার্কিকদের টুকতেন: "একসেরী ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে গো? তাঁর লীলা কে বুঝবে? তাই আমি আদবে বুঝতে চেষ্টা করি না, শুধু মাকে বলি: 'আমাকে তোমার পায়ে শুদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস দাও।' প্রার্থনা করি: 'মা আমার বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।' এক কথায়, খুঁজতে হবে তর্কযুক্তির রংমশাল জ্বেলে নয়—শরণার্থী হ'য়ে, চোখের জলে—এমন কি দুশ্চর তপস্যার অভিমানেও মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বহু ঘা খেয়ে শেষে পণ্ডিচেরি গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে একটু একটু ক'রে চোখ ফুটেছিল, তাই দেখতে পেয়েছিলাম (আমারই একটি প্রিয় গান):

যে চায় তোমায় আপন সাধনে ধরিতে চপল সাথী,
মুঠিমাছে জল সম তুমি দাও ফাঁকি তারে দিন রাতি।
যে চায় বিরহে তোমার চরণে
পূর্ণ শরণ- সে ই কানে শোনে
তোমার অপার সুরঝঙ্কার প্রেমশিহরণভরা।
অকিঞ্চনেরি বল্লভ তুমি, তারে শুধু দাও ধরা।

দুই

অকিঞ্চন মন্ত্রে দীক্ষাই যে ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র পথ এ-সত্যটি হয়ত আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না যদি না—

(১) রামকৃষ্ণকথামৃত আমার শিশুবুকের তারে বেজে উঠত;

(২) "শ্রীম" ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের আশীর্বাদে আমার নবজন্ম হ'ত—তর্ক ছেড়ে জিজ্ঞাসার কোঠায় উত্তীর্ণ হ'য়ে।

নবজন্ম বৈ কি—একশোবার। নৈলে কি আমার সংশয়ী মনও এমন আচম্কা দ'ল উঠত তাঁদের কথায়, চাহনিতে, স্নেহস্পর্শে—আমার বুকের বীণায় বেজে উঠত রামপ্রসাদের একটি অপূর্ব উপলব্ধি: "না জেনে নাম—শুনে কানে, মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'ল!"

এ-দুই মহাপুরুষের কথা আমি অন্যত্র বলেছি একাধিক বার। কিন্তু এঁদের কণ্ঠে আমার আকুল অন্তর কী অভয়বাণী শুনেছিল তার কি কোনো সত্যি খবর আমি রাখি, যখন জানি না—সাধুর কৃপাশিস কী ভাবে তারণ করে? শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, তাঁরা একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই আমার কাছে এসেছিলেন ঠাকুরের প্রেমদূত হ'য়ে। "শ্রীম" আমাকে উস্কে দিয়েছিলেন সাধুদের মহাবাণীর অনুলিপি রাখতে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে বলেছিলেন—ঠাকুরের কৃপা আমাকে ঘিরে আছে এ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁর সমাধিতে।

তারপরে শ্রীমা সারদামণির দর্শন পাই—তিনি আশীর্বাদও করেছিলেন। সে-ও কি অভয় নয়? অতঃপর পড়ি স্বামী বিবেকানন্দের ঘোষণা (ভর্তৃহরির বৈরাগ্য শতকের) যে "বৈরাগ্যম্ এবাভয়ম্"—সংসারে বৈরাগ্য ছাড়া কিছুই আমাদের অভয় দিতে পারে না।

বৈরাগ্য বলতে অনেক কথাই মনে জাগে। বৈরাগ্যের ভাবানুষঙ্গে নানা পথে মন দুলে উঠত। আমি ছিলাম সুখী বালক, কৃতী ছাত্র ও জনপ্রিয় গায়ক কৈশোর থেকেই। জীবনে আসক্তি ছিল আমার প্রবল। যা কিছু দর্শনীয় দেখে মন দুলে উঠত, শ্রবণীয় শুনে প্রাণ উজিয়ে উঠত, অভাবনীয় চাক্ষুষ ক'রে অন্তর চমকে উঠত—যথা, পিতৃদেব ও তাঁর নানা মনীষী বন্ধুর দীপ্ত ব্যক্তিরূপ, নানা গায়ক গায়িকার গান, সর্বোপরি মহাজনদের আশিস-স্পর্শ। মুখ্যতঃ, কবি-শিল্পী, গায়ক-গায়িকা, ও মহাত্মাদের চুম্বকশক্তি—এই তিনটির আকর্ষণ আমার মনপ্রাণকে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলত। তাই আমি স্বভাবে বৈরাগী ছিলাম না—মানতেই হবে। জীবনের বহুমুখী বিকাশের প্রতি কীর্তিসৌধ তথা আলোকস্তম্ভই আমার মনকে দোলা দিত; উত্তর জীবনে আমি যাদের ছবি এঁকেছি আমার স্মৃতিচারণে তথা উপন্যাসে ও রমন্যাসে। কিন্তু তবু বলব—জীবন যেমন আমাকে টানত তেমনি প্রতিহতও করত। একদিকে

ঝোঁকা, অন্যদিকে ফেরা। এ ও তা চাই—কিন্তু পেয়ে দেখি মন ভরে না, আসে বৈরাগ্য, জাগে প্রশ্ন—এমন কিছু কি আছে জগতে যাতে মন ভরে, প্রাণ গান গেয়ে ওঠে, অন্তরে নিটোল শান্তি বিছিয়ে যায়? নানা মহানুভব মানুষের সান্নিধ্যে প্রথমে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠি, কিন্তু তার পরেই কে যেন বলত আমার অভয় গহনে:

এ ই কি সত্যি পরম চাওয়া, পরম পাওয়ার দান?
ধন্য কি হয় জীবন পেলে সুখ ভোগ সম্মান?

আমি জীবনাসক্ত, অথচ এই-ই তো বৈরাগ্যের বাদী স্বর—"হেথা নয় হেথা নয় আর কোনো খানে।" শ্রীঅরবিন্দের মুখে পরে শুনি—তিনি কস্মিন্‌কালেও বৈরাগ্যমন্ত্রী ছিলেন না, গীতার অনাসক্তি কথাটিই ওঁর প্রিয়। আমাকে একবার লিখেছিলেন যে, বৈরাগ্যও প্রাপ্তির একটি পথ একথার মার নেই. কিন্তু হ'লে হবে কি, বৈরাগ্যের অভিসার হয় কাঁটাবনের মধ্যে দিয়ে, নয় মরুপথে। "এ বড় দুঃখের পথ, কৃচ্ছ্রসাধনের পথ." লিখেছিলেন তিনি, "তাই আমি চাই না তুমি এ পথের পথিক হও। রবি-করোজ্জ্বল পথেই (sunlit path) চলো না কেন—এ যুগে বৈরাগ্যের বাণী তেমন জোর পায় না·· ইত্যাদি।" এ-চিঠিগুলি পরে ছাপা হ'যে প্রকাশিত হয়েছে তাই এ-সম্বন্ধে বেশি ব্যাখ্যা করার দরকার দেখি না। শুধু এই কথাটি বলতেই বৈরাগ্যের অবতারণা যে, বৈরাগ্যই আমাকে পেয়ে বসত, বৈরাগ্যকে আমি স্বেচ্ছায় বরণ করি নি। স্বভাবে আমি প্রসন্ন মানুষ, স্বধর্মে রসবাদী তথা সহজ পন্থী—তাই বরাবরই দর্শনীয় শ্রবণীয় বরণীয় সব কিছুতেই মনে প্রাণে সাড়া দিয়ে এসেছি—যাদের মধ্যে একটি প্রধান আনন্দনিলয়—বন্ধুপ্রীতি; যেখানে যেতাম বন্ধু জুটত। বাজে বন্ধুও জুটত বৈ কি, কিন্তু সর্বত্রই আমাকে ধন্য ক'রে রেখে গেছেন আমার নানা স্মরণীয় ও বরণীয় বন্ধুবান্ধবী। তাই থেকে থেকে "হোমসিক" হ'লেও বিদেশকে আমার কখনো অনাত্মীয় মনে হয় নি, মনে হয়েছে রঙিন—ধূসরে রঙিন। কত জাতের মানুষ আসত কাছে, তাদের সাড়ায় মন উঠত দুলে, আমার সাড়ার প্রতিদানে তারাও কাছে এসে আমাকে দিত বরণমালা। এ কথার কথা নয়। একবার মনে আছে ভূমধ্যসাগরে জাহাজে পিয়ানো বাজিয়ে গাইছিলাম:

"এ কী অগণন জলবালা পাথারে
খেলে হোলি হীরক ফাগে···"

(এ গানটি পরে গাই এক চ্যারিটি কন্সার্টে রাজবন্দীদের সাহায্যার্থে—য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে—যেখানে সুভাষ পৌরোহিত্য করেছিল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও ছিলেন) গান শেষ হ'তে দেখি এক খাস গোরা আমার পিছনে দাঁড়িয়ে। সে এক গাল হেসে বলল: "ব্রাভো ফ্রেণ্ড!" ব'লেই করপীড়ন—সে কী স্নেহে! তার সঙ্গে ভাব হ'য়ে গেল একটিমাত্র শুভদৃষ্টিতে গানের কদমতলায়। রবীন্দ্রনাথেরও

বারবারই এ-অভিজ্ঞতা হয়েছিল। একদা তিনি বলেছিলেন আমাকে: "গানের টানে যত সহজে পর আপন হয় এমন আর কিছুতে নয়।" শুধু তাই নয়, আর একটি কথাও তিনি বলেছিলেন তাঁর অপরূপ ভঙ্গিতে: "যার সঙ্গে তোমার কোথাও কোনো মিলই নেই—দেখতে পাবে সেও গানের টানে কাছে এসে তোমাকে মিতালির রাখী পরাতে পারে অকুণ্ঠে।" কবিতা বা চিত্রশিল্পে এ-অঘটন কখনই ঘটে না বলি না, কিন্তু গানে যে-ভাবে পদে পদে প্রীতির সাড়ার নগদবিদায় মেলে সে-ভাবে অন্য কোনো শিল্পে মেলে না—কবিগুরু এই কথাটিই বলতে চেয়েছিলেন। অভিজ্ঞতাটি অপ্রতিবাদ্য মনে হবেই হবে তাদের কাছে যারা গানের মালা গেঁথে অপরিচিতকে কাছে টেনে এনেছে—দেশ ভাষা সংস্কার সব ডিঙিয়ে।

তিন

গান ও সাহিত্য এই দুটি পাখায় আমার মন সানন্দে সঞ্চরণ করত কল্পনার আকাশে। স্মৃতিচারণে লিখেছি কী ভাবে পিতৃদেবের কাছে এই দুটি আনন্দে দীক্ষা পেয়েছিলাম আমার শৈশব ও কৈশোরে। তাঁর গল্পসভায় আসতেন সে-যুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা—কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ওস্তাদ গুণী। কিন্তু সর্বপ্রথম তাঁর নানা গানের সুরই আমার প্রাণের তারে রণিয়ে উঠে আমাকে করেছিল সুদূরবিবাগী। তিনি যে শুধু নাট্যকার বা হাস্যরসিক ছিলেন না, ছিলেন গানের পাখী এ-সত্য আমাব কাছে ছেলেবেলায়ই প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। নিত্য নতুন সুর রচনা করতেন তিনি—কখনো হার্মেনিয়ম বাজিয়ে, কখনো বারান্দায় পায়চারি করতে করতে গুনগুন ক'রে। তাঁর দেহান্তের কয়েক মাস আগে তিনি বাঁধেন তাঁর প্রখ্যাত গঙ্গাস্তোত্র—"পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে।" বেশ মনে আছে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে তাঁর এ-গানটির সুর দেওয়া। অনেক সময়ে সুর তার আগে আসত, কথা সাজাতেন সেই সুরের কাঠামোয়। অনেক সময় কথা আগে হাজিরি দিত, সুর পরে। উদাসী বাউল গান ছিল তাঁর অতি প্রিয়। "আমার আমার ব'লে ডাকি," ও "মহাসিন্ধুর ওপার থেকে" গান দুটি আমার বড় ভালো লাগত। প্রথমটি নিছক বৈরাগ্যের—তাঁর "তারাবাই" নাটকে এক উদাসী রঙ্গমঞ্চে এসে গেয়ে যেত। গানটি শাদামাটা ভৈরবী, কিন্তু বন্দেশে বৈশিষ্ট্য ছিল। আমার "দ্বিজেন্দ্রগীতি"-তে এ গানটির স্বরলিপি দিয়েছি। এ গানটির মিল পাড়াগেঁয়েই বলব—শুধু শেষে মুক্তদলে মিলের আমেজ। গানটি উদ্ধৃত করি:

> আমার আমার ব'লে ডাকি, আমার এ ও আমার তা।
> তোমার নিয়ে তুমি থাকো, নিয়ো না কো আমার যা।

আমার বাড়ি আমার ভিটে
আমার যা তা বড়ই মিঠে
আমার নিয়ে কাড়াকাড়ি, আমার নিয়ে ভাবনা।

আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাবা, আমার মা।
আমার পতি আমার পত্নী—সঙ্গে তো কেউ যাবে না।
আমার যত্নের দেহ ভবে
তা-ও রেখে যেতে হবে
আমার ব'লে কারে ডাকি—চোখ বুঁজলে কেউ কারো না।

পাড়াগেঁয়ে বাউলে মিলের জৌলুষে ঘাটতি হ'লে সুর করত ক্ষতিপূরণ, যথা একটি বিখ্যাত সেকেলে বাউল :

দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা
ধরি ধরি মনে করি—ধরতে গিয়ে আর পেলাম না
পথিক কয় : ভেবো নারে, ডুবে যাও রূপসাগরে
ডুবিলে পাবে তারে আর ভেবো না।
এবার ধরতে পেলে মনের মানুষ ছেড়ে যেতে আর দিও না।

বাউল রামপ্রসাদী ভাটিয়ালি বর্গীয় লোকসঙ্গীতে সে-যুগে মানুষের কান আপত্তি করত না কারণ এসব গান এক উদাস সুরের আনন্দে আমাদের মনকে বাস্তব জগতের দুঃখদৈন্য-আশাভঙ্গ-স্বপ্নভঙ্গের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেত মনের মধ্যেই "মনের মানুষ"কে খুঁজতে উস্কে দিয়ে। খৃষ্টদেব বলেছিলেন : "স্বর্গরাজ্য তোমারি মধ্যে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে বিরাজ করছে—তাকে পেলে আব ভাবনা থাকবে না।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মানুষের ধর্ম" নিবন্ধে বাউলের এই বাদী সুরটির কথাই বলেছেন বড় সুন্দর ভঙ্গিতে : "বৃহদারণ্যকে একটি আশ্চর্য বাণী আছে—'অথঃ যোঽন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে অন্যোঽসৌ অন্যোঽহম্ অস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্।' যে-মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে 'সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য' এমন কথা ভাবে, সে তো দেবতাদের পশুর মতোই।...সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকেই বলে মনের মানুষ। বলে, 'মনের মাঝে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।'"

গ্রাম্য নানা বাউলে এ-উদাস সুরটি ভেসে আসত না পাওয়ার মধ্যেই পাওয়ার

আভাস দিয়ে। পিতৃদেবের আসরে সুগায়ক শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু একটি চমৎকার বাউলে পরিবেষণ করতেন এই অতৃপ্তির তৃপ্তি :

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না।
ওরে, সারা জনম বইলাম বৈঠা রে, তবু তোর মনের নাগাল পালাম না॥

আমি আমার "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল"-এ লিখেছি যে, পিতৃদেব তাঁর শেষ জীবনে প্রায় পুরোপুরি উদাসী হ'য়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি বাউল গান এত ভালো-বাসতেন ও রসিয়ে তুলতেন শ্রোতাদের মন তাঁর নানা উদাসী বাউল গানে। এর মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁর দুটি নির্ভেজাল বাউল :

একবার গালভরা মা ডাকে।
মা ব'লে ডাক মা ব'লে ডাক মা ব'লে ডাক মাকে।

অন্যটিও বাউলের বৈশিষ্ট্যে চমকপ্রদ, উদাসী সৌরভে মর্মস্পর্শী :

জীবনটা তো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল।
এখন যদি সাহস থাকে মরণটাকে দেখবি চল্।
প'ড়ে আছে অসীম পাথার, সবাই তাতে দিচ্ছে সাঁতার,
অঙ্গ এলে অবশ হ'য়ে সবাই যাবি রসাতল।
সিন্ধু 'পরে গর্জে ঢেউ, সে দণ্ডমাত্র নয়ক স্থির,
নিচে প'ড়ে আছে অগাধ স্তব্ধ শান্ত সিন্ধুনীর।
এতদিন তো ঢেউয়ে ভেসে দিলি সাঁতার উপর দেশে,
ডুব দিয়ে আজ দেখব—নিচে কতখানি গভীর জল।

এ-গানটি ছন্দে মিলে নিখুঁৎ, অথচ গ্রাম্য বাউলের ব্যঞ্জনায় নিটোল। শুনি, ছেলেবেলায় মনে যেসব ছাপ পড়ে আর মোছে না কোনোদিনও। তাই হয়ত বাউলের উদাস সুরে আমি পূর্ণ দীক্ষা পেয়েছিলাম সর্বপ্রথম পিতৃদেবের নানা বাউল গানে, পরে তাঁর নানা কীর্তন ও কীর্তনাঙ্গ গানে, যথা (চন্দ্রগুপ্তে ছায়ার অপরূপ গান)

আর কেন মিছে আশা মিছে ভালোবাসা মিছে কেন তার ভাবনা?
সে যে সাগরের মণি আকাশের চাঁদ—আমি তো তাহারে পাব না।
... ...
আমি জানি না তো হায় ধুলায় গড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো!
তবে কেন সে যেচে দুখ লই বেছে, কেন না ভুলিতে পারি গো?
না না, তবু সেই দুখ বাঁচিয়া থাকুক আমরণ মম স্মরণে :
আমি লভেছি যদি এ-বিরস জীবন—লভিব সরস মরণে।

এ-গানটি শুনতে না শুনতে আমার বালক মন যেন পাখা মেলে উড়ে চ'লে যেত সে কোন্ অচিন পুরে যেখানে মরণও সরস হয়! মানুষ জীবনে যা পায় না তার

ক্ষতিপূরণের আশা রাখে মরণের পরে। খৃষ্টদেব বার বার বলতেন: "এখানে যে দীন হ'তে শিখবে পরে সে হবে ঐশ্বর্যশালী।"* এ-মধুর আশ্বাসে বুক বেঁধে কত বরেণ্য মানুষই না দারিদ্র্যব্রত বরণ করেছেন যুগে যুগে! উদাসী মনোভাবের তো এইই রীতি—অপ্রাপ্তিকেও সে বরণ করে প্রাপ্তিলোকের ছাড়পত্র পেতে—নৈলে "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" এ-বৈরাগ্যবাণী কি আবহমানকাল মহাজনদের উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারত ত্যাগের মধ্য দিয়ে ধন্যজন্মা হবার স্বপ্নে? যাঁরা বলেন ধর্ম মনের আফিং তাঁরা আদৌ জানেন না ধর্ম যথার্থ ধার্মিককে কী দেয়—কী ভাবে শক্তির সেবার আত্মোৎসর্গের দীক্ষা দিয়ে রিক্ত জীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে স্তোকবাক্যে ভোলাতে চান নি যখন তিনি বলেছিলেন:

অফলো যদি ধর্মঃ স্যাৎ চরিতো ধর্মচারিভিঃ
অপ্রতিষ্ঠে তমস্যেতদ্ জগন্মজ্জেদ্ অনিন্দিতে!

অর্থাৎ, ধার্মিকের আচরিত ধর্ম যদি নিষ্ফল হ'ত তা'হলে এ-জগৎ বহুদিন আগেই গভীর অন্ধকারে ডুবে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত।

সে-সময়ে ধরতে পারি নি অবশ্য, কিন্তু পিতৃদেবের দেহান্তের পর যখন একটু একটু ক'রে তলিয়ে ভাবতে শিখি তখন দেখতে পাই আর সব মহানুভব প্রতিভাধরদের মতন তাঁরও চরিত্রে নানা স্ববিরোধী ঝোঁক ও ভাব পাশাপাশি আসর জমাত। তাই তিনি মনে তার্কিক হ'য়েও ছিলেন প্রাণে বিশ্বাসী, দেহে বলিষ্ঠ হ'য়েও ছিলেন অন্তরে কোমল, সংশয়ী হ'য়েও শ্রদ্ধাবান্, শরণার্থী হ'য়েও স্বাবলম্বী, রসিক হ'য়েও ভাবুক, আনন্দী হ'য়েও দুঃখবাদী।

তাঁর চরিত্রের এ-সব প্রবণতারই ছোঁয়াচ আমার শিশুমনে লেগেছিল, কৈশোরে যার পরিণতি হয় তার্কিক হওয়া সত্ত্বেও মহাজনদের কাছে নত হ'তে চাওয়ায়, ক্রোধন হওয়া সত্ত্বেও অসংযমের পরে অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমার্থী হবার অভীপ্সায়! তাই প্রথম যৌবনেই আমি টের পেয়েছিলাম—যেকথা পরে একটি গানে ফলিয়ে তুলেছিলাম:

ধরিব ধরিব যে বলে সে-ই তো পায় না।
জানিব জানিব বলিলেই জানা যায় না।

অর্থাৎ দাবি করলেই মণি মেলে না, তার জন্যে চাই মণিমন্ত্রের সাধনা—প্রণতি ও নিষ্ঠা যার ভিৎ। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যেদিন আমার শেষ দেখা হয় কলকাতায়—বোধহয় ১৯৩৮ সালে—তিনি একটি কথা আমাকে বলেছিলেন, আমার মনে দাগ কেটেছিল। বলেছিলেন: "মণ্টু, আমি ধর্মকর্ম যোগযাগ বুঝি না, কিন্তু এটুকু

*"And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted,......(St. Matthew)

মানি যে সত্যি প্রণাম করতে না শিখলে কোন মহৎ লাভই হয় না।" বস্তুতঃ শ্রদ্ধা আর প্রণামই হ'ল অধ্যাত্ম পথের প্রথম দুটি ধাপ—শ্রদ্ধা শাস্ত্রবাক্যে আর প্রণাম মহাজনের পায়। শ্রীঅরবিন্দের কাছে পরে একথার সমর্থন পাই যৌবনের সীমান্ত পেরিয়ে। তিনি লিখেছিলেন : "আমি জানার মতন কিছুই জানি না এই উপলব্ধিই হ'ল যথার্থ জ্ঞানের বনেদ।" গর্ব আমাদের বল দেয় না, উত্তরোত্তর দুর্বলই করে, যার সমাপ্তি আত্মঘাতে। উপমাসম্রাট্ শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন : "উঁচু জমিতে ফসল ফলে না। উর্বর হয় নিচু জমির।" উত্তর জীবনে ঘা খেয়ে এই সত্যটি আমি উপলব্ধি করেছিলাম—আমার একটি প্রিয় গানে অঙ্গীকার করে :

নয়নের নীরে তাই নাথ গাই : "করো মোরে দীনতম।
তনুমন মোর হোক আজ তব চরণের ধূলিসম।
প্রতিভা শকতি গরব বিভব
করো পদানত, প্রণতিনীরব,
হে ঘনশ্যামল! অহেতু বরষা হ'য়ে এসো তাপহরা।
দুর্লভ তুমি জানি, তাই গাই : করুণায় দাও ধরা।

চার

আমার কৈশোরে আমি অবশ্য জানতাম না মানুষ উদাসী হয় কোন্ নিহিত তাগিদে, কেন অপ্রাপ্তির দুর্ভাবনা প্রাপ্তির রঙিন আশাকে ধূসর ক'রে দেয় থেকে থেকে। যতদূর মনে পড়ে তা এই যে, নানা আশাভঙ্গের বেদনা থেকেই আমার চেতনা ঊর্ধ্বগামী হয়েছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিই।

মা যেদিন মারা যান মৃতবৎসা হ'য়ে সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ উঠে দেখি সবাই কাঁদছে—দিদিমা মাসিমারা ও দুই মামা। শুনেছিলাম ছোট ভাই বা বোন জন্ম নেবে। মা প্রায়ই বলতেন আদর ক'রে : "কিন্তু তাকে ভালোবাসিস।"

আমার মন মুষড়ে পড়ত। ভালোবাসব? কাকে? যে আসছে সে তো মা-র ভালোবাসায় ভাগ বসাবে—যেমন আমার ছোট বোন মায়া বসিয়েছিল যথাবিধি। ঈর্ষা—জেলাসি—মনের একটি আদিম বৃত্তি।

তাই যখন শুনলাম—মা মরা শিশুর জন্ম দিয়েছেন তখন মন খুশী হয়েছিল বৈকি। কিন্তু ওরা সবাই কাঁদে কেন—এ এক সমস্যা! আমি সূতিকা ঘরের দিকে যেতে চাইতেই দিদিমা বাধা দিয়ে বললেন : "তোর মা এখন ঘুমিয়ে। তুইও এখন ঘুমো, ধন!" ব'লে আমাকে ঘুম পাড়ান।

কিন্তু পরদিন উঠে যখন মা-কে কোথাও দেখতে পেলাম না (পিতৃদেব

সে সময়ে মফঃস্বলে) তখন একে ওকে তাকে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু কেউই উত্তর দেয় না। এর আগে কাউকে চোখের সামনে মরতে দেখি নি, তবে এটুকু বুঝতাম যে, যারা চ'লে যায় তারা আর ফেরে না আর এই না ফেরার নামই মৃত্যু। (একথার মর্ম পরে ষোলো বৎসর বয়সে বুঝতে পারি পিতৃদেবের মৃত্যুর পরে তাঁরই একটি গানে :

জগত যা নিয়ে যায় একবার ফিরায়ে দেয় না আর তায়।
নিয়ে যায় সব ভেঙেচুরে—শুধু স্মৃতিটুকু তার রেখে যায়।

ক্রমশঃ যখন বুঝবার কিনারায় এলাম যে মা আর ফিরবেন না, তখন মনে গভীর বিষাদ ছেয়ে গেল। তাঁর অপরূপ সুন্দর মুখ আর দেখব না, শুনব না তাঁর আদরভরা ডাক, নিজে হাতে আর তিনি খাইয়ে দিতে আসবেন না কোলে বসিয়ে।—বুঝলাম এই-ই মৃত্যুর নিষ্ঠুর রূপ। আমার বোন মায়া তখনও একথা বোঝে নি। কারণ তার বয়স তখন চার, আমার ছয়। আর আমি আশৈশব এঁচড়ে-পাকা ছেলে নাম কিনেছিলাম—যদিও পিতৃদেব আমাকে সুভদ্র সাহেবি উপাধি দিয়েছিলে precocious. তাই আমি টের পেয়েছিলাম—ছয় বৎসর বয়সেই—যে চাইলেই হাতে চাঁদ আসে না। হয়ত মাতৃবিয়োগ না হ'লে এ-চেতনা জাগত না ছ সাত বৎসর বয়সে। পরে ঠেকে শিখে জেনেছিলাম—বেদনার আওতায় শিশুর বোধ ও ধারণাশক্তির বিকাশ হয় দ্রুত রেটে। আমার ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। তখন স্নেহময়ী শ্রীমন্তিনী মাকে হারিয়ে আমি শৈশবেই উধাও হলাম উদাসী হবার দিকে—যার ফলে আমার দুর্নাম রটেছিল অকালপক্ব বা এঁচড়ে-পাকা।

এরপরে দেখলাম পিতৃদেবেরও পরিবর্তন। মা থাকতে তিনি হাসির গান গাইতেনই বেশি—আমিও সেসব গানে সোল্লাসে দোয়ার দিতে দিতে তাঁর বহু হাসির গানই শিখে নিয়েছিলাম। কিন্তু স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি ঝুঁকলেন নানা উদাস মধুর গান বাঁধতে—সুরু হ'ল নাটক লেখা। তারপর শুধু আমার নিজের মা হারানোর বেদনার মধ্যে দিয়ে নয়, আমার বরেণ্য ও প্রিয় পিতার আমার বেদনার সরিক হবার মধ্যে দিয়েও আমার বোধশক্তির দ্রুত বিকাশ হয়—যেজন্যে পিতৃদেব প্রায়ই বলতেন তাঁর বন্ধুবান্ধবকে যে, তাঁর প্রিয় পুত্রের মনের বয়স দেহের বয়সের চেয়ে অনেক বেশি। আমার মনের মধ্যে উদাসী সুর কায়েম হওয়ার একটি প্রধান কারণ নিশ্চয়ই—প্রথম, শৈশবে মাতৃহারা হবার দুঃখ, পরে কৈশোরে পিতৃহারা হবার গভীর বেদনা।

পাঁচ

আমার চিত্তাকাশে উদাসী ভাব হাল্কা মেঘের মত থেকে থেকে সব উৎসাহের আলো ঢেকে ফেললেও আমার মন ছিল শুধু অকালপক্ক নয়, অতি জীবন্ত—তাই টাল সামলে নিয়েছিলাম পিতৃমাতৃহারা হওয়ার গভীর দুঃখ সত্ত্বেও। আমার পিতৃবন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ আমার নাম দিয়েছিলেন—live wire: তর্কাতর্কি, হাসিঠাট্টা, গানবাজনা, বিশেষ ক'রে বহুপাঠিতায় আমি হ'য়ে উঠেছিলাম অনন্য। কেবল স্কুলপাঠ্য বইয়ে আমার মন বসত না। আমি বেশি পড়তাম মহাভারত রামায়ণ নানা পুরাণ সংহিতা—এমন কি রমেশ দত্তর ঋগ্বেদও কিনে পড়েছিলাম—যদিও বুঝতে না পেরে ছেড়ে দিয়েছিলাম—যেকথা ইতিপূর্বে লিখেছি।

আমার বিকাশের কাহিনীর এর পরের পর্বগুলি আমার নানা বইয়েই লিখেছি বিশেষ ক'রে "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল", "স্মৃতিচারণ প্রথম খণ্ড" ও "মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল" এই তিনটি গ্রন্থে। তাই এবার সুরু করি পিতৃদেবের মৃত্যুর পরের পর্ব—আমার মাতামহের স্নেহনিলয়ে থিয়েটার রোডে। (চেষ্টা করব যথাসাধ্য পুনরুক্তি এড়িয়ে চলতে।)

সেখানেও আমি অত্যধিক আদরে আদরে মোড় নিচ্ছিলাম স্বেচ্ছাবিহারের দিকেই—এমন সময়ে দেখা হ'ল কয়েকটি যোগীর সঙ্গে। তাদের মধ্যে একজনের কথা আমি লিখেছি আমার "স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় খণ্ডে"। তাঁর নাম—কুমারনাথ, মহাতান্ত্রিক, সিদ্ধপুরুষ।

সিদ্ধপুরুষ অবশ্য এর আগেও আমি দেখেছিলাম—শ্রীম, স্বামী সারদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দকে। কিন্তু তাঁদের দীপ্যমান ব্যক্তিরূপে মুগ্ধ হ'লেও তাঁদের কাউকেই এত কাছে তো পাই নি। কুমারনাথ তাঁর একটি কথায় আমার কিশোর হৃদয়ে কায়েম হয়েছিলেন যখন তিনি স্নিগ্ধ হেসে বলেছিলেন আমাকে: কুলপি? খাব বৈকি বাবা। আমি সব খাই পরমানন্দে।"

আনন্দময় পুরুষ বৈকি। কিন্তু এ-সহজিয়া অবস্থা লাভ করতে তিনি রাণাঘাটের কাছে এক শ্মশানে বহুবৎসর তান্ত্রিক সাধনা করেছিলেন—শুনেছিলাম আমার মেশোমহাশয় শ্রীগিরিশ শর্মার কাছে। আমার মন তাঁর এই কথায় যেন গান গেয়ে উঠল: "এই তো চাই—স্বাধীন, বেপরোয়া। আচার ছুঁৎমার্গ অতি সাবধানতা এসব কে চায়? মানুষ চায় স্বাধীন হ'তে।" বহুবৎসর পরে শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীতে পড়েছিলাম—সাবিত্রী পুরুষোত্তমের কাছে দাবি করছেন:

I am a deputy of the aspiring world
My spirit's liberty I ask for all.

ঊর্ধ্বে অভীপ্সার দীপ্ত প্রতিনিধি রূপে চাই আমি
আমার অন্তরাত্মার দিব্য মুক্তি সকলের তরে।

এরই তো নাম জীবন্মুক্তি—মনের প্রাণের খাঁচা ভেঙে আনন্দের আকাশে পাখা মেলে গা ভাসিয়ে চলা।

কিন্তু তখন আমার কোনো ধারণাই ছিল না একনিষ্ঠ সাধনার—যার প্রসাদে মেলে এই জীবন্মুক্তির পরম বর। তাই চেয়েছিলাম কুমারনাথের উপদেশ। তিনি কী উপদেশ দিয়েছিলেন মনে নেই, কেবল এইটুকু ছাড়া যে, আমার লক্ষণ ভালো কেবল প্রতীক্ষা করতে শিখতে হবে। উপনিষদের ভাষায় "ন ত্বরমানেন লভ্য:"—হাঁকুপাকু করলেই বস্তুলাভ হয় না—সাধনা বিনা সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

কিন্তু সাধনা করব কী ভাবে? নির্দেশ দেবেন কিনি? কে? গুরুবরণ করতে একদিকে যেমন আমার গভীর আগ্রহ ছিল, তেমনি অন্যদিকে ছিল দারুণ ভয়। কে জানে গুরু কী ভাবে সব স্বেচ্ছাবিহারের পথ আগলে দাঁড়াবেন? কাজ নেই বাবা! পড়াশুনোয় মন বসেছিল, দুদিন বাদে বিলেত যাব; তারপর যথাকালে লক্ষ্যহীন জনপথ ছেড়ে জীবন্মুক্তির রাজপথের খোঁজ করা যাবে।

এই সময়ে আমার কয়েকটি স্নেহময় তথা বুদ্ধিমান্ বন্ধুর দেখা মেলে যাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন প্রথম থাকের অন্তরঙ্গ: সুভাষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও নীরেন্দ্রনাথ রায়। ধূর্জটির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় বিলেত থেকে ফেরার পরে।

বন্ধুরা আমার জীবনে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়েছেন চিরদিনই, তবে এ-বয়সে—মানে প্রথম যৌবনেই—তাদের প্রীতিবীজে ফসল ফলেছে সবচেয়ে বেশি। তাদের স্নেহ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যা বুদ্ধি দরদ এককথায় তাদের ব্যক্তিরূপের প্রবল প্রভাব আমাকে শুধু আলো নয় শক্তিও দিয়েছে দেখবার ভাববার সত্য সন্ধানের। কেবল উদাসী বৈরাগ্য বাদ। কারণ সুভাষ যদিও উচ্চকোটির সাধকের শুদ্ধি ও স্বপ্ন নিয়ে জন্মেছিল কিন্তু তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশসেবা, একমাত্র স্বপ্ন—দেশের স্বাধীনতা। সত্যেন আমাকে দিয়েছিল সংস্কৃতির দীক্ষা—তার প্রভাবে পড়েই আমি ফরাসী ভাষাশিক্ষার দিকে ঝুঁকে দেখতে পাই যে, বিদেশী ভাষা শিক্ষার ফলে শুধু-যে সাহিত্যে রস পাওয়ার ক্ষমতা বাড়ে তাই নয়, দৃষ্টির প্রসার হয়, চিন্তা গভীর হয়, ভাবুকতার ফুল ফোটে। নীরেনের কাছে শিখি—বন্ধুর বিকাশে ঔৎসুক্য কীভাবে নিজের বিকাশকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু এদের কথা আমি অন্যত্র ফলিয়েই লিখেছি। তাই ফিরে হারানো খেই ধরি।

ছয়

বলছিলাম আমার বৈরাগ্যের কথা।

বাইরে থেকে কেউ ধরতে পারত না আমার মনের উদাসী ভাব। এমন কি বন্ধুদের কাছেও আমি বল্‌তাম না আমার মন থেকে থেকে কেন উড়ুক্ষু হ'তে চায় মাটির মায়া কাটিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি নির্দেশ আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল: "ধ্যান করবে—মনে কোনে বনে।" অর্থাৎ মন্ত্রগুপ্তি—বাইরের লোক যত কম জানে অন্তরের ঊর্ধ্বচারণী অভীপ্সার কথা ততই ভালো। কারণ প্রার্থনার ফলে উপর থেকে কৃপার যে সাড়া আসে সে থিতিয়ে যায় নির্জনতায়, প্রগল্‌ভতায় এ-প্রাপ্তির রংঢং ফিকে হয়ে আসেই আসে।

আমি তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি ছবির সামনে সকাল সন্ধ্যা ধ্যান করতাম ও প্রার্থনা করতাম যেন বিবাহ না করি, যেন মনে রাখি তাঁর মহাবাক্য যে, ঈশ্বর দর্শনই মানবজীবনের শেষ লক্ষ্য। সংসারে যতবার আশাভঙ্গ স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে ততবারই এই বিবাগী সুরের কাছে হাত পেতেছি সান্ত্বনার জন্যে: অর্থাৎ কী আসে যায় এ ও তা না পেলে—চাইতে হবে শুধু সেই পরমপদ যার নাম জীবন্মুক্তি—যার প্রসাদে প্রতি অপ্রাপ্তিও এগিয়ে দেয় বিকাশের দিকে। গীতার একটি শ্লোক আমার মন সাদরেই বরণ করে নিয়েছিল এই সময় (ঠিক বিলেত যাত্রার আগে):

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে॥

এমন পরম লাভ চাই—যার পরে মন কিছু চায় না আর,
এমন স্থিতি—যে দুঃখদাহের পরেও বিরাজে নির্বিকার।

কিন্তু বিলেতে পা দেবার আগে জাহাজেই ঘা খেলাম—যার ফলে আরো উপলব্ধি করলাম—হাড়ে হাড়ে—নির্বিকার থাকা কত কঠিন। ঘটনাটির কথা আমার "ভাবি এক হয় আর" উপন্যাসে বলেছি তবু ফের বলি এ-আত্মকথার ভূমিকায়।

আমি কলকাতা থেকে "থংগোয়া" নামে একটি জাহাজে উঠি ও মাসখানেক বাদে পৌঁছই লণ্ডনে। জাহাজে উঠে সে কী যন্ত্রণা—বিষাদ! কোথায় চলেছি অন্তহীন জলের দুঃসহ মরুপার হ'তে? যে-পরম পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছি বিদেশে তো সে—"মনের মানুষ কাঁচাসোনাকে" মিলবে না, মিলতে পারে না। তার জন্যে চাই ভারতের পুণ্যভূমির আবহ। আমাদের হাজারো অবনতি হয়েছে মেনেও আমার এ-বিশ্বাস কোনোদিনই টলে নি (যে কথা স্বামী বিবেকানন্দ বারবার ...

বিখ্যাত কলম্বো-ভাষণে) যে, ভারত পুণ্যভূমি। সুভাষও একথা বলত উঠতে বসতে। জাহাজে "সী-সিক" হ'য়ে মন আমার যেন আরো বৈরাগী হ'য়ে উঠল। কেবল মনে পড়ত শ্রীম-র মধুর মূর্তি, স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিব্যকান্তি, শ্রীমা সারদামণির স্নিগ্ধ আশীর্বাদী বাণী : "ঠাকুরকে যে ছেলেবেলায়ই মনে মনে বরণ করেছে বাবা, সে ভাগ্যবান্—কারণ ঠাকুর তার হাত ধ'রে চালাবেন।" অতুলপ্রসাদের একটি গানও মনে পড়ত :

আমারে এ-আঁধারে এমন ক'রে চালায় কে গো ?
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি, বুঝতে নারি কিছুই যে গো !

মনে হ'ত—অলক্ষ্য ভাগবতী কৃপা যখন আমাকে চালাচ্ছে তখন কেন আমি ছুটেছি সাত সমুদ্র পারে—কী পাব সেখানে যাতে মন ভরতে পারে ? এ একটুও বাড়িয়ে বলা নয় যে, কেবলই মনে হ'ত ফিরে যাই এডেন থেকে। শুধু আমাকে সেন্টিমেণ্টাল তথমা দিয়ে লোকে হাসবে—এই ভয়েই আমি দুরন্ত মনকে বসে আনতে পেরেছিলাম, এ-দুঃসহ নিঃসঙ্গতার মধ্যেও ধৈর্য ধ'রে ছিলাম অনাগতকে বরণ ক'রে। একটি চিন্তা কেবল মনকে আমার আশ্বাস দিত : সুভাষ বলেছিল আমাকে—সেও কেম্ব্রিজে আমার সঙ্গে যোগ দেবে।

নিঃসঙ্গতা ব'লে নিঃসঙ্গ। আমার কেবিনে একটি আইরিশ সহযাত্রী কেবল আমার সঙ্গে কথা কইতেন। আর সব যাত্রী—সাহেব ও মেম—আমার দিকে ফিরেও তাকাত না।

এই সময়ে দুটি ইংরাজশিশু আমার কাছে আসত ও অনর্গল গল্প করত। আমি তাদের চকলেট বা টফি দিলে তারা আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে আমার গলা জড়িয়ে কোলে বসত।

মনে শান্তি না হোক কিছুটা সান্ত্বনার রস পেলাম এই দুটি সরল শিশুর স্নেহসঙ্গে। সত্যি মনে হ'ত যেন দেবতা পাঠিয়ে দিলেন দু-দুটি দেবদূতকে আমার ক্লিষ্ট মনের ব্যথাভার লাঘব করতে। ঠিক এই আলোর লগ্নেই শুধু মেঘ ছাওয়া নয়, পড়ল বাজ। একদিন সে-শিশুদুটি ডেক-এ আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল। আমি ছুটে গিয়ে তাদের ধরতেই তারা চেঁচিয়ে ব'লে উঠল : "ছাড়্। নেটিভ কোথাকার !"

বুঝতে বাকি রইল না কার কাছে তারা এ-নবপাঠের দীক্ষা পেয়েছিল। ফলে ফের মন ভারি হ'য়ে উঠল বৈরাগ্যের চাপে। মনে পড়ত নানা বৈরাগ্যের গান,—যেমন :

এমনি মহামায়ার মায়া—রেখেছে কী কুহক ক'রে !
গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পলাতে নারে।

বা রামপ্রসাদের

মন তুমি কৃষিকাজ জানো না
এমন মানব জমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা!

বা রজনীকান্তের

কোলের ছেলে ধুলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে।
ফেলিস নে মা, ধুলো কাদা মেখেছি ব'লে।

জীবন যখন কথা দিয়েও কথা রাখে না তখন মানুষ আরো জীবনের নিয়ন্তার কাছে সান্ত্বনার জন্যে হাত পাতে, কে না জানে?

সাত

বিলেতে গিয়ে যা যা দেখলাম তাতে কী ভাবে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলাম স্মৃতিচারণে কিছু লিখেছি। এ শেষ অধ্যায় সে সবের পুনরুক্তিকে পাশ কাটিয়ে লক্ষ্যমুখী থাকতে হবে—অর্থাৎ লিখতে হবে আমার মন সেখানকার সাংঘাতিক চঞ্চলতার মধ্যেও থেকে থেকে কী ভাবে পারের পারানি জোটাত।

তাই বলি সাধু সুন্দর সিঙের কথা। তাঁর কথা যদিও আমার "ছায়াপথের পথিক"—রমন্যাসে কিছু লিখেছি তবু তাঁকে বাদ দেওয়া চলবে না কেন না সে-চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্তির দুর্লগনে এ-মহাজনটি আমার কাছে এসেছিলেন যেন আমাকে মনে করিয়ে দিতে আমার স্বধর্মের কথা। এর আগে কলকাতায় এসেছিলেন কুমারনাথ তান্ত্রিক, এবার কেম্ব্রিজে এলেন সুন্দর সিং খৃষ্টদুলাল। তার পরে তাঁর সম্বন্ধে দু-দুটি জীবনী পড়ি। তিনি মুখেও আমাকে বলেন অনেক কিছু—বিশেষ ক'রে, কীভাবে তিনি মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন খৃষ্টের কৃপায়—যার অস্তিত্ব তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন এক অঘটনের মাধ্যমে। বলি—কী ভাবে খৃষ্ট তাঁর কাছে এসে তাঁকে আপন ক'রে নিয়েছিলেন চক্ষের নিমিষে। অঘটন আজো ঘটে—বিশেষ ক'রে সাধকদের জীবনে, কিন্তু এরকম অভাবনীয় অঘটন ঘটে কালে ভদ্রে।

কেম্ব্রিজে আমার ঘরে এই দীর্ঘকায় আলখেল্লা-পরা সৌম্য মহাত্মা উদিত হয়েছিলেন কেন মনে পড়ছে না। সম্ভবতঃ আমার মুখে হিন্দি ভজন শুনবার আগ্রহ হয়েছিল। ভজন শুনে তিনি প্রসন্ন হ'য়ে আশীর্বাদ করেছিলেন এমন সহজিয়া ছন্দে যে তাঁকে নানা প্রশ্নবাণে উদ্ব্যস্ত করাও আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছিল —আরো এই জন্যে যে, তিনি নিজের সাধনার কথা গোপন রাখতে চাইতেন না—

অন্ততঃ আমার কাছে তো চান নি। আমি তাঁর কাছে যা শুনেছিলাম ও পরে তাঁর দুটি জীবন চরিতে পড়েছিলাম তার চুম্বকটি এখানে পেশ করি।*

সাধু সুন্দর সিং জন্মেছিলেন ১৮৮৯ সালে এক গোঁড়া শিখ পরিবারে। সেখানে "গুরুগ্রন্থ" ছিল একমাত্র গুরু—নিত্যপাঠ হ'তো এই মহাগ্রন্থের। সাধু সুন্দর সিং-কে পাঠানো হয়েছিল একটি খৃষ্টান মিশনারি স্কুলে। আশৈশব জিজ্ঞাসু এই মহাজন হিন্দুদের যোগসাধনায়ও দীক্ষা নিয়েছিলেন শান্তির গভীর তৃষ্ণায়। কিন্তু শান্তি পেলেন না কোনো প্রক্রিয়াতেই। ফলে স্কুলপাঠ্য বাইবেলে তাঁর ঘোর বিদ্বেষ জন্মাল। "আমরা শিখ, গুরুগ্রন্থই আমাদের উপাস্য, বাইবেল পড়ব কী দুঃখে?" দুঃখ—অশান্তির, কিন্তু বাইবেলে শান্তি মিলল কই? শেষে উত্যক্ত হ'য়ে বাইবেলকেই যত নষ্টের মূল সাব্যস্ত ক'রে তার উপরে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে ফেললেন তাঁর পিতৃদেবের চোখের সামনে। পিতা পুত্রকে রুখতে চেষ্টা ক'রে হার মানলেন সদুঃখে। অতঃপর—(তাঁর নিজের ভাষায়ই বলি, মিসেস পার্কারের জীবনী থেকে অনূদিত):

"বাইবেল পুড়িয়ে আমি আরো অশান্ত হ'য়ে স্থির করলাম আত্মহত্যা করাই পন্থা। তিন দিন বাদে ভোর তিনটায় ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে আমি প্রার্থনায় বসলাম: "যদি ভগবান সত্যি থাকেন তিনি আমাকে দিন মুক্তির দিশা; নৈলে আমি ট্রেনের সামনে প'ড়ে আত্মঘাতী হব। অকস্মাৎ সাড়ে চারটার সময় খৃষ্টদেবের আবির্ভাব। তিনি বললেন: 'কেন তুমি আমাকে দুঃখ দিচ্ছ? আমি ক্রুসে ঝুলেছিলাম তোমাদের জন্যেই তো যাতে ক'রে জগত মুক্তিস্বাদ পায়।' তাঁর এই তিরস্কার আমার অন্তরে ঝিকিয়ে উঠল বিদ্যুতের মতন। সঙ্গে সঙ্গে মনে আনন্দ নিটোল হয়ে উঠল—আমার রূপান্তর হ'ল চিরদিনের জন্যে। তিনি অন্তর্হিত হবার পর পরমা শান্তি আমার মধ্যে নামল—যার নাম চিরন্তনী। এ কল্পনা নয়। যদি বুদ্ধ বা কৃষ্ণ আসতেন তবে সে আবির্ভাব কল্পনা হ'লেও হ'তে পারত, কিন্তু খৃষ্ট —যাঁর বিদ্বেষ আমাকে উদ্দীপ্ত করেছিল তিনি এলেন এভাবে একে অঘটন—miracle—ছাড়া কী বলব। এ স্বপ্নও নয়—বিপর্যয় ঠাণ্ডায় ভোর রাতে বরফ শীতল জলে স্নানের পরে কেউ স্বপ্ন দেখতে পারে না—এমন স্বপ্ন যা আমার সমগ্র সত্তাকে যেন ঢেলে সাজালো। এর শুধু একটি মাত্র নাম দেওয়া যায়—মহনীয় বাস্তব সত্য—a Great Reality."

ইতিপূর্বে আমি আত্মিক শান্তি সম্বন্ধে পড়েছিলাম কত কী। শুধু পড়া নয়, নানা অশান্তি চিত্তবিক্ষেপের যন্ত্রণায় প্রার্থনা করেছি দিনের পর দিন শান্তির জন্যে।

* যাঁরা এ মহাত্মা খৃষ্টবাণীবাহের সম্বন্ধে জানতে চান তাঁরা পড়তে পারেন মিসেস আর্থার পার্কার-এর লেখা "SADHU SUNDAR SINGH (Christian literature Society)

কলকাতায় আমাদের "সুরধাম"-এর ছাদে একটি কাঠের ছোট্ট কুঠরি বানিয়ে সামনে পর্দা টেনে প্রার্থনা করতাম কৃষ্ণের বা জগন্মাতার কাছে। আমার ইষ্ট বরাবরই এই যুগল মূর্তি: কৃষ্ণ কালী। সময়ে সময়ে মনে পড়ে স্পষ্ট—নামত শান্তির ধারা—মূর্ধা থেকে। তার স্পর্শে সমস্ত দেহমন যেন জুড়িয়ে যেত। কিন্তু এ শান্তি স্থায়ী হ'ত না। সুন্দর সিং আমাকে বলেছিলেন: শান্তি তাঁর মনে নেমেছিল বরাবরের জন্যে—চিরসাথীর মতন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলত। এহেন আশ্চর্য অনুভূতি—যাকে বলা যায় চিরস্থায়ী—খুব কম সাধকেরই হয়। শ্রীঅরবিন্দের কাছে শুনেছি যোগের প্রধান (major) উপলব্ধিগুলি স্ফুট হ'য়ে ওঠে না বারো বৎসর সাধনার আগে। পরম ভাগবত শ্রীরামদাস সন্ন্যাস নেবার পরে পরিব্রাজক জীবনে পরমানন্দেই কাল কাটাতেন বটে। কিন্তু তাঁরও থেকে থেকে অশান্তি আসত। "এলে কী করতেন?" আমার এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "যেতাম চ'লে কোনোনির্জন গুহায় বা শিখরে—আরো একমনে জপ করতাম 'শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম'। শ্রীমৎ রামদাস ছিলেন ক্ষণজন্মা সাধু, জপসিদ্ধ। কিন্তু তিনিও একটানা শান্তির স্বাদ পান নি—বস্তুলাভের আগে। সুন্দর সিং-এর যুগপৎ দর্শন তথা শান্তির উপলব্ধিকে তাই অনন্য বলা চলে। তবে ভারতের আরো অনেক মহাজনের সাধনায় হয়ত এই চিরস্থায়ী শান্তি নেমে থাকবে দু'চার মাস সাধনার পরে। সাধনার নানা স্তরে নানা বিচিত্র উপলব্ধির কতটুকুই বা আমি জানি? নিজের সাধনা নিয়েই অস্থির—তা অপরের সাধনার মর্মজ্ঞ হব কেমন ক'রে?

মরুকগে। সাধু সুন্দর সিং-এর মুখে তাঁর নানা আশ্চর্য উপলব্ধির কথা শুনতে শুনতে মন আমার ফের বিবাগী হ'য়ে গিয়েছিল সুদূর সাগরপারে কর্মময় ধ্বনিময় সংবাদময় বিলেতে—এই-ই ছিল আমার পরম লাভ ও মূল বক্তব্য এ-সম্পর্কে।

না। আরো একটি লাভের কথা না বললেই নয়—বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, পরে যখন আমার জীবনেও অঘটনের শোভাযাত্রা সুরু হয় তখন সাধুজির দুটি অভাবনীয় অভিজ্ঞতার কথা বারবারই মনে হ'ত—যার বিলিতি নাম মিরাক্ল।

অঘটন যে সাধুর জীবনে ঘটে এ আমার অজানা ছিল না। বিলেত থেকে ফিরে শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের সান্নিধ্যে আমি প্রথম চাক্ষুষ করি অকাট্য অঘটন—যার কথা স্মৃতিচারণে পেশ করেছি। কিন্তু '৯২০ সালে যখন সাধু সুন্দর সিং প্রথম ইংলণ্ডে আসেন তখন আমি উৎসুক জিজ্ঞাসু হ'লেও অঘটন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতাম না ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়। তাই সাধুজির অঘটন দুটির কথা একটু বলি। এ-বর্তমান অবিশ্বাসের যুগে হয়ত অনেক স্বভাবসন্দেহী বিশ্বাস করবেন না। নাই করলেন—সত্যের আলো তো আর তাঁদের অবিশ্বাসের ছায়ায় কালো হ'য়ে যাবে না। এ-অঘটন

দুটির কাহিনী শ্রীমতী পার্কারের জীবনীতে বিশদ ক'রেই বর্ণিত হয়েছে—তাই আমি বলব যথাসম্ভব সংক্ষেপেই।

সাধু সুন্দর সিং আমায় বলেছিলেন যে তিনি খৃষ্টদেবের দর্শনের পরেই আদেশ পেয়েছিলেন তাঁর বাণীবাহ হবার। এমন শান্তি যে জীবনে পাওয়া যায় খৃষ্টদেবের কৃপায় এ-ঘোষণা না ক'রে তাঁর উপায় ছিল না। শ্রীমতী পার্কার লিখেছেন সাধুজির কণ্ঠে বেজে উঠেছিল বিখ্যাত খৃষ্টস্তব :

Jesus : I my cross have taken,
All to leave and follow thee ,
Destitute, despised, forsaken,
Thou from hence my all shalt be.

তোমার ক্রসের বাণীবাহ আজ হয়েছি আমি,
ছাড়ি ধনজন তোমাবেই করি অনুসরণ ,
দিবে ধিক্কার সর্বহারারে সকলে স্বামী,
তবু তোমারেই করিব কেবল প্রাণে বরণ।

খৃষ্টধর্মে দারিদ্র্য-রূপ ক্রস বহন করার দাম খুব বেশি। অর্থাৎ, কৃচ্ছ্রসাধন—দেহসুখস্পৃহাকে বাতিল ক'রে। আনন্দের পথে সমতার আলোয় যে পরা ভক্তি ও প্রজ্ঞা লাভ হতে পারে শ্রেষ্ঠ খৃষ্টানদের মধ্যে অনেকেই মানেন না। সাধু সুন্দর সিং হয়ত কৃচ্ছ্রব্রতী বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। স্বভাবে ছিলেন সহজিয়াই বলব। কিন্তু খৃষ্টের বাণীর দুর্গম তিব্বতেও প্রচার করার প্রেরণা পেয়েছিলেন ইষ্টদেবেরই প্রেরণায় এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ অন্তরে এ-প্রত্যাদেশ না পেলে কেউ কোনো ধর্মের উদ্গাতা হ'তে উন্মুখ হয়ে ওঠেন না যেমন উঠেছিলেন এ-পরমভাগবত। তাই যে-সব দেশে খৃষ্টের আলো পৌঁছয় নি সেসব দেশ দুর্গম, ও নিরাপদ নয় জেনেও তিনি গিয়েছিলেন হিমালয়ের দুর্গমতম উপত্যকায়—তিব্বতে। সেখানে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে তাঁকেও শুধু যে বেগ পেতে হয়েছিল তাই নয়, তিব্বতীদের উপহাস ধিক্কার ক্রোধ ও, সর্বোপরি, বিদ্বেষকেও তিনি বরণ করেছিলেন দৈবপ্রেরিত বাধা ব'লে যাকে অতিক্রম না করলেই নয়। এজন্যে তাঁকে বার বার মরণের দেহলিতে পৌঁছতে হয়েছিল—কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই তাঁর ক্ষতিপূরণ মিলেছিল ত্রাতা খৃষ্টের অভয় কর স্পর্শে—যার উপনাম অঘটন, মিরাকল। দুটি অঘটনের কথা এখানে সংক্ষেপে পেশ করব—তাঁর ধৈর্য সাহস ও আত্মনিবেদনের পরিচয় দিতে। (এ-দুটি কাহিনীর বিশদ বিবৃতি মিসেস পার্কারের জীবনীতে দ্রষ্টব্য)

সাধু সুন্দর সিং বললেন : "আমি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছি বলতে না বলতে সে কী কাণ্ড! মা-র কান্না, বাপের ক্রোধ, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের ধিক্কার···সে স

অনুমান করতে পারবে সহজেই। আমাকে পিতৃদেব তাড়িয়ে দিলেন ত্যাজ্যপুত্র ক'রে কিন্তু আমি ভয় পাই নি। স্বয়ং খৃষ্টদেব আমাকে ধারণ ক'রেছিলেন, ভয় আসবে কোন পথ দিয়ে?"

তারপর স্নুরু হ'ল তাঁর পদযাত্রা। পাঞ্জাব কাশ্মীর আফগানিস্তান বেলুচিস্থান হ'য়ে তিনি পৌঁছলেন তিব্বতে—পদযাত্রা ব'লে পদযাত্রা—খালি পায়ে তিব্বতের মতন বরফের দেশে। ভাগবতী কৃপাব শক্তি বিনা কে পারে অসাধ্য সাধন করতে?

কিন্তু তিব্বতীরা রেগে আগুন: খৃষ্টধর্ম বলে কী এ উন্মাদ। কিন্তু তিনি সমানে প্রচার ক'রে চললেন খৃষ্টবাণী। শেষে রসার-এর লামার সামনে তাঁর বিচারে লামা দিলেন তাঁকে প্রাণদণ্ড: তাঁকে ফেলে দেওয়া হল এক শুকন কুয়োয় যেখানে নানা পচা মৃতদেহের পূতিগন্ধে সাধুজি অস্থির হ'য়ে ডাকলেন (বাইবেলের ভাষায়): "ভগবান! আমাকে কেন তুমি ত্যাগ করলে? কী অপরাধে?"

কুয়োটির মুখে ছিল মস্ত তালা লাগানো ঢাকনি। উঠবেনই বা কেমন ক'রে? তৃতীয় দিনে যখন তিনি প্রার্থনা স্নুরু করেছেন তখন মনের কোণে এক টুকরোও আশার আলো নেই। এমন সময়ে হঠাৎ তিনি শুনলেন কুয়োর ঢাকনির তালা খোলার শব্দ। তার পরেই নেমে এল একটি দড়ি। তিনি দড়ি ধ'রে কুয়োর পাড়ে উঠে দেখেন—কী আশ্চর্য—কেউ কোথাও নেই। তিনি টলতে টলতে তিব্বতীদের নানা সংঘে ফের প্রচার স্নুরু করলেন। লোকে চমকে উঠল: এ কি ভূত নাকি? সে কুয়ো থেকে তো কেউ কোনোদিন বেঁচে ফেরে নি!

যথাকালে লামার কানে পৌঁছল দুঃসংবাদ যে, সে-খৃষ্টান পাদ্রীর ভূত ফিরে এসে ভাষণ দিচ্ছে সমানে! লামা ক্ষেপে উঠলেন—কেউ নিশ্চয় তাঁর চাবি চুরি ক'রে এ-দুর্দান্ত পাদ্রীকে মুক্তি দিয়েছে। খোঁজ খোঁজ—চাবি কোথায়? শেষে চমকে উঠলেন নিজের কোমরবন্ধে চাবিটি ঝুলছে দেখে সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ভয় তাঁকে পেয়ে বসল—খৃষ্টান পাদ্রীকে তিনি লোকলস্কর দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন শহরের বাইরে—নৈলে না জানি কী বিপদ ঘটবে—পাদ্রী তো ভূত হ'তেও পারে!

* * *

দ্বিতীয় অঘটনাটি আরো চমকপ্রদ। খৃষ্টদেব বলেছেন: "খৃষ্টদেবের জন্যে যে প্রাণ দেবে সে পাবে নতুন আয়ু।"* এ যে কথার কথা নয় সাধুজি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করতে চাইতেন সর্বত্র। ব্যাপারটা এই:

একদা তিনি তাঁর এক সহযাত্রীর সঙ্গে তিব্বতে সাংঘাতিক শীতে বাধ্য হয়ে কয়েক মাইল দূরে লোকালয়ের আশ্রয় নিতে চলেছিলেন। ঠাণ্ডায় অঙ্গ অবশ। তবু

* **He that loseth his life for my sake shall find it...St. Matthew, New Testament.**

না চললে নিশ্চিত মৃত্যু। মাঝপথে হঠাৎ এক নিঃসংজ্ঞ মুমূর্ষু! সাধুজি সঙ্গীকে বললেন: একে তো ফেলে যাওয়া চলে না, চলো দুজনে মিলে কোনোমতে নিয়ে তুলি কোনো কুটিরে। সঙ্গী প্রভু বিরক্ত হয়ে "না" ব'লে এগিয়ে চললেন নিজের প্রাণ বাঁচাতে। সাধুজি অগত্যা মুমূর্ষুকে পিঠে ক'রে কোনো মতে চললেন ইষ্টনাম জপতে জপতে। একটু বাদে—কী আশ্চর্য!—এই পরিশ্রমে তাঁর নিজের ঠাণ্ডায় অবশ অঙ্গে কিঞ্চিৎ তাপ এসে উপস্থিত হ'ল—মুমূর্ষুও হ'ল সে-তাপের শরিক। ফলে দুজনেই বেঁচে গেলেন। কেবল পথের মাঝে সাধুজির সহযাত্রীটির মৃতদেহ তাঁদের চোখে পড়ল। নিজের প্রাণ বাঁচাতে যে পরকে পাশ কাটিয়েছিল সে-ই মরল অপঘাতে, আর বাঁচল সেই যে পরকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণকে পণ করেছিল! নবীন আয়ু এল না কি নবীন পথে?—সাধুজি বলতেন হেসে নানা শ্রোতৃসংঘে। ইংরাজী একটি প্রবচনে আছে: "Truth is stranger than fiction." এ-সত্যটিকে আমিও আমার জীবনে উপলব্ধি করেছি বারবার—কেবল সেই সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই—এ-চমক জাগায় কোনো মানবিক শক্তি নয়. এখানে নাট্যকার—ভগবান আর তাঁর প্রতিনিধি—ভাগবতী কৃপা।

আট

সাধু সুন্দর সিং-কে আমার ভালো লেগেছিল তিনটি কারণে।

প্রথম, ঐকান্তিক খৃষ্টান প্রচারক হ'য়েও তিনি হাসতেন মন খুলেই। আমি সে যুগে বাইবেলের ভক্ত হ'তে পারি নি প্রধানতঃ এই জন্যে যে খৃষ্টদেবের বাণী ছিল বেদনাচারণী। আমাকে এক ইংরাজ বিদুষী একবার লেখেন: "আপনার Sri Aurobindo came to me বইটি আমার খুব ভালো লেগেছে। কেবল আমি ঘোর আপত্তি করছি আপনি এতে এক অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের হাসিঠাট্টার কথা লিখেছেন ব'লে। এতে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব'লেই আমি মনে করি। আমাদের খৃষ্টদেব বাইবেলে কি কোথাও ভুলেও হেসেছেন...?"

সাধু সুন্দর সিং এহেন গম্ভীরাননাদের সামনে হয়ত হাসতেন না. জানি না, কিন্তু আমার কাছে তিনি অনেক সহাস্য উক্তি করেছিলেন। প্রাণোচ্ছল অট্টহাস্য নয়—কিন্তু সুমধুর স্মিত হাস্য! তাঁর জীবনীতে শ্রীমতী পার্কার পাশাপাশি তাঁর দুটি রূপের ছবি এঁকেছেন: সদয় গম্ভীর প্রচারকের তথা হাসিভরা রসিকের। দুইটি দৃষ্টান্ত দিই।

একদা সাধুজি তিব্বতে ডাকাতদের হাতে পড়েন। তারা তাঁর যা কিছু ছিল সবই হরণ করে। কিন্তু সাধুজির সঙ্গে তারা পেরে উঠবে কেমন ক'রে? তারা

প্রস্থান করবার মুখে সাধুজি তাদের ডেকে বললেন: "শোনো, আমাদের সর্বস্ব তোমরা হরণ করলেও আমি আরো কিছু তোমাদের দিতে পারি।" সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টের নানা গল্প বলা শুরু করলেন। শুনতে শুনতে তারা মুগ্ধ হ'য়ে সাধুজির কাছে ক্ষমা চেয়ে যাহা কেড়ে নিয়েছিল ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে প্রস্থান।

এটিকে বলা চলে কান্না কাহিনী। এবার হাসির মহলে আসা যাক।

তিব্বতে একবার তিনি একদল যাযাবর জিপসিদের অতিথি হয়েছিলেন। তার জন্যে তারা তাদের একটি পেয়ালায় চা ঢালতে যেতেই সাধুজি বলেন—পিয়ালাটি আমাকে দাও, আমি ধুয়ে নিই। চা-পরিবেশক বলল: "সে কি হয়? আপনি অতিথি। পেয়ালা সাফ করবার ভার আমাদেরই। ব'লে এক ছ-ইঞ্চি লম্বা জিভ বের ক'রে পিয়ালায় তলা পর্যন্ত চেটে সাফ ক'রে তাঁকে চা ঢেলে দিল। তিনি সে-চাও ফেলে দিতে সে জিজ্ঞাসা করল কী ব্যাপার? তখন তাঁর তিব্বতী সহযাত্রী বলল: "ভারতীয়রা প্রতি ভোজের আগে তাদের হাত ও পাত্র সব ধোয়।" উত্তরে সে বলল অম্লানবদনে: "তোমরা তো দেখছি ভারি বোকা—যেহেতু সব পাত্রই যদি তোমরা ধোও তবে তো রোজ উদরপাত্রটিকে ধুয়ে নিতে হয়—এ-অসম্ভবকে সম্ভব করো কেমন ক'রে?"

সাধুজিকে আমার ভালোলাগার দ্বিতীয় কারণটি এই যে, তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরেও গেরুয়া রঙের আলখেল্লা পরতেন, বলতেন: "আমি ইণ্ডিয়ান—ভারত আমার দেশ, কিন্তু আমার ইষ্ট তো শুধু খৃষ্টান দেশগুলির জন্যে ক্রসে ঝোলেন নি, ঝুলেছিলেন সব দেশেরি জন্যে। সে সময়ে বিশ্বমানব অভিধাটি রবীন্দ্রনাথ চালু করেছিলেন। তাই সাধুজি জুড়ে দিতেন: "আমি বিশ্বমানব, জন্মেছি ভারতে, পর্যটন করি সর্বত্র, সবার কাছে গাই তাঁর নাম, যিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: "Heaven and earth shall pass away but my words shall not pass away—স্বর্গ মর্ত্য লুপ্ত হ'তে পারে কিন্তু আমার বাণী লুপ্ত হবার নয়।"

তাঁকে ভালো লাগার তৃতীয় কারণটি এই যে, তিনি আদর্শ খৃষ্টান হ'লেও নিজের বিবেকের নির্দেশেই বলতেন—গির্জাবাদীদের আদেশে নয়। খৃষ্টান মিশনারিরা তাঁর বেপরোয়া বিবেকবাদে ক্ষুন্ন হতেন, কিন্তু সাধু সুন্দর সিং ছিলেন অচল অটল, বলতেন—খৃষ্টবাদ আর গির্জাবাদ সমার্থক নয়। শ্রীঅরবিন্দ একদা একটি নিবন্ধে Churchianity শব্দটির প্রয়োগ করায় বিজ্ঞ মুদ্রাকর Christianity শব্দটি বসিয়ে দেন। শ্রীঅরবিন্দ তাকে তলব ক'রে সাদরে প্রশ্ন করেন: "বৎস! তুমি কী ভেবে আমার ইংরাজীকে শুদ্ধ করতে গেলে?" সুন্দর সিং-এর কথা ভাবতে প্রায়ই এ-মজার গল্পটি মনে পড়ে। শ্রীঅরবিন্দ যা বলতে চেয়েছিলেন তার জন্যে Churchianity শব্দটি তাঁকে উদ্ভাবন করতে হয়েছিল! পাণ্ডাপুরুত প্রাণহীণ মন্ত্রতন্ত্রবাদ, আচারের

ঘনঘটা যারা গর্জন করে কিন্তু বর্ষায় না—এই সব বোঝাতেই শ্রীঅরবিন্দ প্রয়োগ করেছিলেন চার্চিযানিটি বিশেষটি। সাধু সুন্দর সিং-ও এই প্রতিবাদের মূর্ত বিগ্রহ হয়েছিলেন non-conformist ভঙ্গিতে। সুফীদের মধ্যে অনেক মহাত্মাও এই দলে যাঁরা ধর্মের বাহ্য আচারপনাকে পাশ কাটিযে বহু দুঃখ পেযেছেন বিধিবাদীদের অত্যাচারে উৎপীড়নে—যেমন পেযেছিলেন সাধু সুন্দর সিং যিনি খৃষ্টান হ'যেও ভারতীয পোষাক বর্জন করেন নি—যত্র তত্র খালি পায়ে চ'লে অনেক সুশীল সুশীলার কাছেই অপ্রিয হযেছিলেন। কিন্তু তিনি বলতেন প্রাযই: "খৃষ্টকে মানি এ-অঙ্গীকারের মানে নয যে, আমি তাঁর পাণ্ডা পুরুতের বিধানও মানতে বাধ্য।" আমি সে সময়ে বিলেতের হালচাল তো ভালো বুঝতাম না—ওদের নানা আচারকেই মনে হ'ত বরণীয় নয—বিশেষ ক'রে অনেক গির্জায়ও নিগ্রোদের প্রবেশনিষেধের হুকুম। পরে কৃষ্ণপ্রেম আমাকে বলে: "জাতিভেদ নেই কোথায ভাই? মানুষ যতদিন অন্তরে অভিমান পুষে রাখবে ততদিন সৌভ্রাত্র্য থাকবেই কথার কথা—Slogan—জিগির।"

নয়

সৌভ্রাত্র্য—Fraternity—ঝাণ্ডাটি সে সময়ে (১৯২০ সালে) যুরোপে যত্র তত্র ওড়াতেন রাজনৈতিকেরা। "সব মানুষই সমান—কাজেই আমরা সবাই ভাই ভাই," এর সঙ্গে জুড়ে দেওযা হ'ত ফরাসী বিপ্লবের egalite' (সাম্যবাদ) ও libeite' (স্বাধীনতাবাদ)। ইংলণ্ডে পৌঁছে আমার মন প্রথমটায উজিয়ে উঠেছিল এ-ত্রয়ী-মন্ত্রঝঙ্কারে। এ-ও পড়তাম নানা প্রখ্যাত পত্রিকায যে, ১৯১৪—১৯১৮ এর যুদ্ধের নাম হ'ল a war to end all war—এর পরে আর বিশ্বযুদ্ধ বাধবে না, দু একটা টুকরো যুদ্ধ? ফুঃ! ওরা হ'ল ব্রণের মত—ক্যান্সার নয়. জাতিসংঘ—League of Nations—যে কোনো দিন থামিয়ে দেবে।

সুভাষ কিন্তু সমানে মাথা নাড়ত। বলত "এ-সব শান্তিপাঠ নয, ধর্মের নীতির ভড়ং। জার্মানিতে প্রেসিডেন্ট উইলসন যে-কথা দিয়েছিলেন সে-কথা তিনি রাখেন নি, তাই জার্মানি ফের "সাজো সাজো রণসাজে" ব'লে তৈরি হচ্ছে এর পরের বিশ্বযুদ্ধের জন্যে।" ওর মুখে কীনসের (John Meynard Keynes) "Economic Consequences of the Peace"-এর সুখ্যাতি শুনে বইটি প'ড়ে দমে গেলাম, কারণ কীনস-ও লিখেছিলেন এই কথাই যে, জর্মনির পরে সুবিচার হয় নি. আর অবিচার হ'ল ভবিষ্যৎ যুদ্ধের রক্তবীজ। রাসেল খোলাখুলিই লয়েড জর্জকে দুরাত্মাদের কোঠায় ফেলেছিলেন। পোয়াঁকারে তো ডাক সাইটে শঠ। না, তিনি আরো

সোচ্চার হয়েছিলেন রাজনৈতিকদেব দৌরাত্ম্য সম্পর্কে। লিখেছিলেন (যতদূর মনে পড়ে তাঁর Roads to Freedom-এ) যে, "শক্তিধররা স্বভাবে দুর্জন—holders of power are evil men." রাসেলের "প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্ অফ সোশ্যাল রিকন্‌স্ট্রাকশন" ও "রোডস্ টু ফ্রীডম্" বই দুটি আমি কেম্ব্রিজে প্রথম পড়ি, আর পড়াব সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় "ইনিই দ্রষ্টা পুরুষ"। সুভাষও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করত, কেবল বলত প্রায়ই সখেদে: "ওঁরা ভাবছেন মুখ্যতঃ পাশ্চাত্য জাতিদের ভবিষ্যতেব কথা। এশিয়ার চীন বা ভারতের দুঃখ কষ্ট নিয়ে মাথা বকাবার ওঁদের সময় নেই।"

আমি সুভাষের সঙ্গে এই ধরণের তর্ক করতাম:

দিলীপ: কিন্তু জাতির এঁরাই তো হর্তা কর্তা বিধাতা।

সুভাষ (হেসে): হর্তা বটেই তো—একশোবার, কিন্তু কর্তা বা বিধাতা হ'তে হ'লে যে দিব্যদৃষ্টি চাই এঁদের কারোব নেই—না, রাসেলেবও নেই।

দিলীপ: কিন্তু তুমি একটু অবিচার কবছ না কি সুভাষ? রাসেলের স্বধর্ম নয় রাজনীতিব কুরুক্ষেত্রে নামা। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্কটরোগের (cancer) নিদান (diagnosis) দিতে পারেন—চিকিৎসার দায়িত্ব কর্মীদেরই।

সুভাষ: কর্মী মানে? পোলিটিশিয়ান তো? কিন্তু তাঁরা কেউ কি সত্যি বিশ্বের মঙ্গল চান? চান শুধু নিজের জাতকে—নেশনকে—বড ক'রে তুলে ধরতে। তোমার আমার সমস্যা হ'ল ভারতের সমস্যা, এশিয়ার সমস্যা আমরা সত্যিই চাই এক নবযুগকে আবাহন কবতে। কিন্তু তার জন্যে চাই সব আগে—এক ভাবতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, দুই—চীনের বিদেশী শোষকদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া।

দিলীপ: কিন্তু রাজনৈতিকেরাও তো আজকাল চাইছেন ভারত ও চীনের নব অভ্যুত্থান।

সুভাষ (মৃদু হেসে): দিলীপ, তুমি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসো বলেই এ'দের কথাকে বরণ করো সরল বিশ্বাসে। য়ুরোপ বা আমেরিকার মাথাব্যথা মুখ্যতঃ শক্তি নিয়ে। আজ এ জাত শক্তিধর হ'লে ও-জাত মারমুখো হ'য়ে ব্যালান্স অব পাওয়ার-এব দিকে এগোয়, কাল ও-জাতের বেশি বাড বাডলে বাকি সবাই একজোট হয় তাকে দাবাতে। এ-পথে চিরশান্তি বা চিরসাম্যের লক্ষ্যভেদ হ'তে পারে না।

দিলীপ: আমিও একথা মানি। তাই তো বলি—তুমি কান না দিলেও—যে চাই ধর্মের ভিত্তি—

সুভাষ: ধর্ম বলো কাকে? ধার্মিকদের বিধানকে তো? কিন্তু সব যুগেই তাঁরা মুখ্যতঃ নিজেদের মুক্তি নিয়েই ব্যস্ত—ভাগবতের ভাষায় পরার্থনিষ্ঠা তাঁদে

মধ্যে কজনার ভাষণে পেয়েছ শুনি ? ভাগবতে প্রহ্লাদের এ-খেদের কথা আমি তো তোমার মুখেই শুনেছি।*

এ-নমুনাটি দিলাম—কীভাবে সে-যুগে আমি সুভাষের সঙ্গে তর্ক করতে করতেও তার ঐকান্তিক দেশাত্মবোধের উদ্দীপনায় মুগ্ধ হ'তাম। আমরা সবাই এ ও তা চাইতাম, এদিক ওদিক ঢুঁ মেরে। কিন্তু সুভাষ না। সে ছিল অন্য ছাঁচে গড়া মানুষ—যার পরম উপাধি—"দেশব্রত"। পরার্থনিষ্ঠা তার ছিল না বলব না, তবে আগে তো দেশ স্বাধীন হোক নৈলে কে কান দেবে আমাদের পরার্থনিষ্ঠার বা বা বিশ্বাত্মবোধের ঘোষণায় ?—এইই ছিল সুভাষের বাণী।

আর একটি কথা সে বলত প্রায়ই : "দিলীপ, ডিমক্রাসি গাছে ফলে না যে, যে কেউ পেড়ে খেতে পারে—তার জন্যে বহু প্রস্তুতি চাই। ইংলণ্ড আমেরিকা ফ্রান্স তিনটি দেশেরই ইতিহাস পড়ো মন দিয়ে—দেখবে কত ওঠপড়া ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে চ'লে তবে তারা পার্লামেণ্টারি ডিমক্রাসি গ'ড়ে তুলেছে। তাই আমার মনে হয় আমাদের দেশে ডিমক্রাসি রাতারাতি মুস্কিলাশান হ'য়ে অভ্যুদিত হ'তে পারে না। প্রথমদিকে চাই রাজতন্ত্র। রাজা ও প্রজার সম্বন্ধের মধ্যে যে-সহজ হৃদ্যতার আলো জেগে ওঠে, আমাদের হয়ত প্রথমদিকে সেই আলোরই আবাহন করতে হবে। তার পরে কী হবে, কী ভাবে আমাদের দেশে সংঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করার শক্তি ও নৈপুণ্য গ'ড়ে উঠবে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। তবে let first things come first—আগে আমাদের দেশ থেকে ধনলোলুপ বণিকদের তো তাড়াই। মহাভারতেও বলেছে—তোমার মুখেই শুনেছি—"কালেন সর্বং বিহিতং বিধাত্রা, পর্যায়যোগাৎ লভতে মনুষ্যঃ"। ঠিক কথা। সবুরেই মেওয়া ফলে ভাই, হাঁকু পাঁকু ক'রে ওদের রীতি নীতি ধার ক'রে মূলধন বাড়ানোর চেষ্টার নাম অপচেষ্টা…"।

আজকের দিনে ভারতীয় ডিমক্রাসির শোচনীয় দুরবস্থা দেখে সুভাষের এ-প্রায়োক্তিটি আমার প্রায়ই মনে পড়ে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথেরও একটি প্রায়োক্তি : "দিলীপ, কেউ কিছু দিলেই তা পাওয়া যায় না। মানুষ কোনো

* প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠা।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে।

অর্থাৎ

মুনিঋষিরা প্রায়ই ত্যজি' অনিত্য এ-দুঃখধাম রহে বিজনচারী
আপনমুক্তির মৌন ব্রতে, হ'তে চায় না ব্যথিতের বেদনহারী।
তাপিত পানে যদি না চায় ফিরে তারা কে দিবে তাহাদের শরণদান
না দিলে তুমি ? ছাড়ি তাপিতে আপনার চাহে না মোক্ষও আমার প্রাণ।

(ভাগবত—সপ্তম স্কন্ধ)

অধিকার পেয়ে যখন তার সুপ্রয়োগে সিদ্ধ হয় তখনই সে হয় অধিকারী। প্রতি সত্যি পাওয়ার জন্যে চাই সে-প্রাপ্তির যোগ্য হওয়া—প্রাণসাধনায়।" রবীন্দ্রনাথের এ-সুভাষিতটি তাঁর নানা লেখায়ই আমাদের সচকিত ক'রে তুলেছিল। কিন্তু রাজনৈতিকদের শোরগোলে আমরা ভুলে যেতাম এ স্মরণীয় নির্দেশটি, চাইতাম রাজনীতির কুরুক্ষেত্রে হাজারো সস্তা জিগিরের ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলতে। সময়ে সময়ে ভাবি—সুভাষ আজকের দিনে আমাদের মধ্যে ফিরে এলে কোন্ পথে সহযাত্রীদের চালাত? কিন্তু সে-জল্পনা কল্পনা রেখে ফিরে আসি কেম্ব্রিজের অধ্যায়ে—ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি সে-সময়ে আমাদের মন কেমন রঙে রঙিয়ে উঠত হাজারো "বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি"-র মাঝে।*

অধিকাংশ ছাত্রই দেখতাম বিশ্বাস করত যে দল বেঁধে শাসক জাতির সঙ্গে নৈষ্কর্ম্য—ননকোঅপারেশন ঘোষণা করবামাত্র সাহেবরা পালাবার পথ পাবেন না। আমাদের কেম্ব্রিজের মজলিশে ভাষণ দিতে আহূত হ'য়ে সকলৎওয়ালাও এ মতে সায় দিয়ে বলেছিলেন: "League of Nations যথার্থনাম—League of damnation," আর এক মেমসাহেব দেশনায়িকা (তাঁর নামটি কিছুতেই মনে করতে পারছি না) বললেন সগর্জেই যে, ভারতের সাহেব ও মেমরা দারুণ ভয় পেয়েছেন—আমরা নৈষ্কর্ম্য করলে তাঁদের লীলাখেলা সাঙ্গ হবে ব'লে।

কিন্তু সুভাষ কোনোদিনই এ-কথায় বিশ্বাস করে নি। শুধু সে নয়—আরো অনেক নেতার মনেই সংশয় ছিল—যে কথা পরে আবুলকলাম আজাদ তাঁর 'India Wins Freeom"-এ লিখেছিলেন: যে, আমরা অহিংস নৈষ্কর্ম্যবাদী হয়েছিলাম দায়ে প'ড়ে—এপথে রাতারাতি স্বাধীনতা মিলবে বা মিলতে পারে ব'লে নয়। এই সময়ে লণ্ডনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও অ্যানি বেসান্তেরও ভাষণ শুনি। কিন্তু সুভাষ তাঁদের শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও তাঁদের কথায় আদৌ কান দিল না। সে প্রকৃতিতে ছিল একরোখা—যাই ধরত ধরত আঁকড়ে। এই দুর্দম অনমনীয়তা তাকে কীভাবে বারবার ভুগিয়েছিল সে-ইতিহাস সবাই জানে। কিন্তু যৌবনে বিলেতে তার মধ্যে এই রোখ যে কীভাবে দীপ্তি হ'য়ে ফুটত সে-খবর অনেকেই রাখেন না। তার নানা অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা ও বিতর্ক শুনতে শুনতে অনেক তামসিক মনও চেতিয়ে উঠত, মেনে নিত তাকে স্বধর্মে নেতা—born leader—ব'লে, যার শিখর-পরিণতি হয়েছিল পঁচিশ বৎসর পরে যখন সে বিদেশে বিভূঁয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গ'ড়ে দেশের "নেতাজি" উপাধি পায় তেমনি সহজে যেমন সহজে শেষ রাতের আবছা অন্ধকারে উষা সোনার টিপ প'রে "স্বে মহিম্নি"—নিজের মহিমায় দীপ্তিময়ী হ'য়ে ওঠে।

* বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি অন্ধবুদ্ধি ফিরিছে আকুলি'
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে নাহি তার কোনো ত্রাস—(নৈবেদ্য, রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু রাজনৈতিক বাগ্‌বিতণ্ডা আমি বেশিক্ষণ সইতে পারতাম না, যদিও বাগাড়ম্বরে প্রথমটায় যোগ দিতাম সোৎসাহেই। কিন্তু "যার কর্ম তারে সাজে অন্য জনে লাঠি বাজে"—যা আমার স্বধর্ম নয় তাতে মশগুল হ'তে পারব কেন? কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি করার পরেই মনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ আঁধার অন্তরে মশালের মতন জ্ব'লে উঠত: "মানবজীবনের অন্তিম লক্ষ্য—ঈশ্বর লাভ।" সাধু সুন্দর সিং আমার কাছে এই ভাগবত বাণীর উদ্‌গাতা হ'য়ে এসেছিলেন ব'লেই তাঁর শান্তোজ্জ্বল সান্নিধ্যে এক গভীর তৃপ্তি পেয়েছিলাম, তাঁকে ভজন শুনিয়ে আনন্দে উচ্ছল হ'য়ে উঠেছিলাম। প্রতিদানে তিনি আমাকে খৃষ্টদেবের পুণ্য কাহিনী শুনিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন যে সাংসারিক সমৃদ্ধির জন্যে আলাদা ক'রে উৎসুক হবার দরকার নেই: "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you—ভাগবত রাজ্যের প্রজা হ'লে আরো যা যা কাম্য সবই হাতে আসবে।" একথায় ভাগবতেরও সায় আছে: "তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে?" অর্থাৎ

প্রসন্ন হ'লে জগতের ঈশ্বর
পারে কি থাকিতে অলভ্য কোনো বর?

দশ

এ একটি কাকতালীয় যোগাযোগ—coincidence—নয় যে কেম্ব্রিজে আমি যখন নানা মুখর সিংহনাদের মধ্যে প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত মত হ'য়ে পড়েছিলাম ঠিক সেই দুর্লগ্নেই এই সর্বত্যাগী সাধু আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজে ও অক্সফোর্ডে গিয়েছিলেন নানাদেশের ছাত্রদের কাছে খৃষ্ট বাণীর প্রচারকল্পে। আমার কাছে আরো এসেছিলন ভজন শুনতে—যেকথা ইতিপূর্বে বলেছি। কারণ সাধুজি গড়পড়তা মিশনরিদের শাসক সুরে "খৃষ্টকে না ভজলে নরকবাস হবে" ব'লে ভয় দেখাতেন না। বলেছি, তিনি হিন্দুধর্মের ও গুরুগ্রন্থের গুণগ্রাহী ছিলেন আশৈশব—হিন্দু যোগীদের কাছে আসন প্রাণায়মের দীক্ষাও নিয়েছিলেন। তবু কেন তিনি ধর্মান্তর বরণে আত্মবোধ চেয়েছিলেন ভাবতাম আমি থেকে থেকে। উত্তর পেয়েছিলাম পরে কৃষ্ণপ্রেমের কাছে—যে ইংরাজ হ'য়েও নিজেকে হিন্দু ব'লে পরিচয় দিত ও বৃন্দাবনের রজ-কে ছুঁয়ে বলত: "এ-ই আমার স্বদেশ।" ঠাকুর কাকে যে কোন পথে ঠেলে দিয়ে কোথায় উত্তীর্ণ করতে চান এ-রহস্যভেদ কেহই করতে পারে না—না জ্ঞানী, না দৈবজ্ঞ। অলডাস হাক্সলি বলেছেন একটি লাখ কথার এক কথা: যে, আমরা আমাদের কর্মের ফল দেখতে পাই মাত্র দু তিন পা—তার পরে আমাদের

কর্ম বা সাধনার ফল আমাদের নিয়তিকে কি ভাবে গ'ড়ে তুলবে—কোন ঢেউয়ের বৃত্ত কোন তটে ঘা দিয়ে পাড় ভাঙবে বা পতিত জমিতে সোনার ফসল ফলাবে কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। সাধু সুন্দর সিং নিজেও জানতেন না—যখন তিনি বাইবেল পুড়িয়েছিলেন—যে, সেই ধুমের (পাতঞ্জলের ভাষায়) "ধর্মমেঘে" খৃষ্টের মুখ ফুটে উঠবে, শুনবেন তিনি তাঁর ক্রসের ডাক যে-ডাক একবার শুনলে আর সাড়া না দিয়ে উপায় থাকে না। মহাভারতে বলেছে বটে 'ন জাতু কামান্ন ভয়াৎ ন লোভাৎ ধর্মং ত্যজেৎ জীবিতস্যপি হেতোঃ—কাম লোভ বা ভয়ের ফেরে প'ড়ে প্রাণ গেলেও ধর্ম ছেড়ো না।" কিন্তু এখানে ধর্ম শব্দটির টীকা নানারকম হ'তে পারে। নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে গুরুবরণ করেছিলেন যে দুর্নিরোধ্য তাগিদে সে-তাগিদের ভাষ্য তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতবর্ষে এসে নিজের জন্মযোগিনী ভাবরূপ উপলব্ধি ক'রে—দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর দেহ খৃষ্টানের রক্তমাংসে গ'ড়ে উঠলেও দেহবাসী আত্মা ছিল নিছক ভারতীয় হিন্দু আত্মা। সাধু সুন্দর সিংও তেমনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, তিনি দেহে শিখ পিতামাতার সন্তান হ'লেও আত্মায় কেবলমাত্র খৃষ্টশিষ্য নন, খৃষ্টের messenger—বাণীবাহ। এ-ও আর এক সমস্যা। খৃষ্টান হ'য়ে জন্মালেই কিছু খৃষ্টের বাণীবাহ হওয়া যায় না—কি দুর্নিবার তাগিদে বার বার প্রাণকে বিপন্ন ক'রে উধাও হওয়া যায় না তিব্বতের মতন নিষ্ঠুর গোঁড়া ধার্মিকদের দেশে যারা বিধর্মীকে অরুন্তুদ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করাকেও বৌদ্ধধর্মের আদেশ ব'লে ভাষ্য করে। সাধু সুন্দর সিং প্রথমবার যখন তিব্বতে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি জানতেন না কী ভয়াবহ বিপদ তাঁকে পাকে ফেলবে। কিন্তু শেষবার ১৯২৩ সালে যখন তিনি ফের তিব্বতে যান তখন সব জেনেও গিয়েছিলেন না গিয়ে তাঁর উপায় ছিল না ব'লেই। এরই নাম খৃষ্টের call of the cross, কৃষ্ণের বাঁশির ডাক। এই হয়েছিল তাঁর শেষ অগস্ত্যযাত্রা—তিব্বত থেকে এ-মহাপ্রাণ খৃষ্টদুলাল আর ফেরেন নি—যেমন স্বামী রামতীর্থ ফেরেন নি কাশ্মীরে গঙ্গাস্নান থেকে। শ্রীহর্ষ নৈষধচরিতে ঘোষণা করেছিলেন যে জীবন্মুক্ত মহামানবের চারটি কর্তব্য আছে: "অধীতিবোধাচরণপ্রচারণৈঃ" অর্থাৎ অধ্যয়ন, উপলব্ধি আচরণ, ও প্রচার—যা শিখেছি তার অকুণ্ঠ বিতরণ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়:

ছাড়ো বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেমই সম্বল…
দাও আর ফিরে নাহি চাও থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।

স্বামীজির এ-উদ্দীপনাময়ী বাণীটির কথা কেম্ব্রিজে প্রায়ই মনে হ'ত বিলেতের নানা মনীষীর সঙ্গে সংস্পর্শে এসে। তখনো রাসেলের দেখা পাই নি তাই বলতে পারি অকুণ্ঠেই যে, যাঁদের ওখানে নামডাক তাঁদের কাউকে দেখেই মনে হ'ত না

তাঁদের হৃদয়ে কিছু ভাগবত "সম্বল" আছে—আর পুঁজি যার নেই সে দেবে কোত্থেকে? সাধু সুন্দর সিং-এর মুখে অভী হাসি, চোখে পুণ্য দীপ্তি, প্রতি ভঙ্গিতে আত্মবোধের প্রভা ঝরত।

এগারো

এই সময়ে আমি আর একটি মহৎ প্রভাবের মধ্যে পড়ি যাকে নিছক শিল্পীর মনোলোকের প্রভাব বলা চলে না। তিনি রোমা রোলাঁ। তাঁর জন ক্রিস্টফার প'ড়ে আমার মনে হল—টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কির পরে এমন উদ্দীপনা আর কোথাও পাই নি। তাঁর লেখা পডতে পডতে সময়ে সময়ে অভিভূত হ'যে পডতাম—মনে হ'ত যেন ধর্মের বাণীই ঝরছে শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে। বিশেষ ক'রে জন ক্রিস্টফার, অলিভিয়ের ও গ্রাৎসিয়ার চরিত্রের দীপ্তি আমাকে অভিভূত করেছিল। মনে হ'ত —এরই তো নাম high seriousness! সৌন্দর্যের মাধ্যমে রসের নির্ঝরণ প্রতি শিল্পেরই স্বধর্ম। কিন্তু সে-রসের সঙ্গে যখন মহত্ত্বের ও ঐকান্তিকতার আলো নামে তখনই সে কৃতি উপাধি পায় high seriousness-এর। বাংলায় এ-মনোভাবটির তর্জমা করা সহজ নয়, তবে বোধ হয় "তপস্বী নিষ্ঠা" বললে কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। জীবন ও রূপশ্রী, প্রেম ও কর্তব্য, মহত্ত্ব ও ঔদার্য সার বেঁধে শোভাযাত্রা করেছে রোলাঁর এ-মর্মস্পর্শী উপন্যাসটিতে। সমগ্র য়ুরোপের আত্মিক অভীপ্সার ঝঙ্কার বেজে উঠেছে এর ছত্রে ছত্রে। অথচ সেই সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে গড়পড়তা মানুষের নানা হীন বৃত্তির ব্যাপকতা, শাসকদের দুরপনেয় তামসিকতা, কাপুরুষের আদর্শ বিমুখতা, বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টির শোচনীয়তা। রোলাঁ দেখিয়েছেন—গতানুগতিক স্থূলদৃষ্টি দিয়ে মহনীয় স্বপ্নচারণের সত্যতা নির্ণয় করা যায় না, ঘরোয়া চেতনা দিয়ে শিখর চেতনার নাগাল পাওয়া যায় না। পরে আমাকে তিনি একটি পত্রে লিখেছিলেন (Villeneuve, 29. 11. 22); "Toujours, une minorite' d'esprits seront de plusieurs sie'cles en avance sur la foule qui les entourent. Ils peuvent comprendre cette foule. Ils peuvent même (ils doivent) l'aimer, Mais cette foule ne les comprendra pour ce qu'ils sont. Ou bien elle les bafoue, et parfois les crucifie. Ou bien eile les acclame. et parfois les de ifie pour ce qu'ils ne sont pas."

(ভাবার্থ: চিরদিন কতিপয় মহাজন তাঁদের আশপাশের জনতাকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে যাবেন। তাঁরা এ-জনতাকে বুঝতে পারবেন, এমনকি তাদের ভালোবাসতেও পারবেন—বাসা উচিত। কিন্তু এ-জনতা পারবে না তাঁদের আসল সত্তার নাগাল

পেতে। তাই এ-জনতা হয় তাঁদের উপহাস করবে, নয়, শূলে চড়াবে—কখনো তাঁদের জয়ধ্বনি করবে, কখনো বা তাঁদের ভগবানের বেদীতে বসাবে তাঁরা যা নন তাঁরা তা-ই ভেবে।)

অন্যভাষায়, বাস্তববাদীরা বলেন—আদর্শবাদ আমাদের ভুল পথে চালায় দৈনন্দিন শ্রীহীনতাকে অস্বীকার ক'রে—চর্মচক্ষে যা দেখি তাকে পাশ কাটিয়ে চলার দীক্ষা দিয়ে "কতিপয় মহাজনের মহত্ত্ব ফোটাতে অগুন্তি দীনহীন দুর্বলের দুরবস্থাকে "নাস্তি" ব'লে ঘোষণা ক'রে। দুচারজন উচ্চাভিলাষী প্রতিভাধর শিখরের খবর পেলেও সাড়ে পনেরো আনা মানুষ যে বসবাস করে নিচু জমিতে ধ্বনি ধূম পঙ্কের আবহে এ-অনস্বীকার্য শোকাবহ সত্যটিকে ভুললে জীবনকে বোঝা যাবে না। তাই—বলেন বাস্তববাদীরা সঘনে—মানুষের হীনতম প্রবৃত্তির খবর নিতে হবে, শুধু 'কতিপয় মহাজনের' ছবি এঁকে ইন্দ্রধনুবিলাসী হ'লে চলবে না। জঘন্যদেরও চিত্রায়ণ আবশ্যিক। রোলাঁ তাঁর নানা উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটকে এই সস্তা Art-for-art's-sake জিগিরের বিরুদ্ধে ঝাণ্ডা ওড়ালেন অকুতোভয়ে, লিখলেন তাঁর "জঁ্যা ক্রিস্তফ"-এ (Jean Christophe):

"Art for Art's sake !···O wretched men ! Art is life tamed. Art is the Emperor of life···Like those artists who turn to profit by their deformities, you manufacture literature out of your deformities and those of your public. Lovingly do you cultivate the diseases of your people, their fear of effort, their love of pleasure, their sensual minds, their chimerical humanitarianism."*

শোপেনহরের সঙ্গে তিনি মতৈক্য ঘোষণা করেছিলেন তাঁর এ মহনীয় উপন্যাসে যে, "Von Schlechten kann man nie zu wenig and das Guete nie zu oft lesen."†

ঝোঁকের মাথায় রোলাঁকে লিখলাম চিঠি (তাঁর প্রকাশকের ঠিকানায়) যে, আমি তাঁর জন ক্রিস্টফার প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছি, একবার তাঁর দর্শন চাই।

উত্তরের আদৌ আশা করি নি। এক অজ্ঞাতকুলশীল তার উপরে ভারতীয় যুবকের সঙ্গে দেখা করবার সময় তাঁর তো না থাকারই কথা। কিন্তু মনে আছে—কী আনন্দ! তাঁর স্বহস্তে লেখা চিঠি এল—তিনি সুইজর্লণ্ডে শূনেক নামে গ্রামে

* শিল্প শিল্পের জন্যে? হায় দুর্ভাগা। শিল্প জীবনকে সংযত করে, শোভন করে। শিল্প জীবনের সম্রাট। যে-সব শিল্পী তাদের সহজাত কুশ্রীতাকে ভাঙিয়ে খায় তোমরাও তাদেরই দলে নাম লেখাচ্ছ, সাদরে আমল দিচ্ছ গণমনে নানা দুষ্ট ব্যাধিকে, তামসিকতাকে, ভোগেচ্ছাকে, ইন্দ্রিয়দাস মনকে, কল্পনাবিলাসী মানবপ্রেমকে।

† মন্দ বই যত কম পড়া যায় আর ভালো বই যত বেশি পড়া যায় ততই ভালো।

একটি হোটেলে আছেন, সেখানে গেলে তিনি আমার সঙ্গে প্রসন্ন হয়েই দেখা করবেন। দেখা হয়েছিল ১৯২০ সালে জুলাই মাসে।

আমি তখন ফরাসী ভাষায় একটু আধটু কথা বলতে পারি, অভিধানের সাহায্যে সহজ বই বুঝতেও পারি। কিন্তু ফরাসী ভাষায় সুভদ্র সম্ভাষণ করা এক, আলাপ আলোচনা করা আর। তাই সুইজলণ্ডে গিয়ে মহা বিপন্ন হ'য়ে পড়লাম যখন রোঁলা কাছে ডেকে সাদরে বসিয়ে বললেন তিনি ইংরাজী জানেন না। শেষরক্ষা হ'ল তাঁর বিদুষী বোন মাদলীন রোঁলা-র দোভাষী দাক্ষিণ্যে। শ্রীমতী মাদলীন ইংরাজী ভাষা বেশ ভালোই জানতেন। কিন্তু দোভাষীর মাধ্যমে আর কতটুকু কাজ হাসিল করা যায়? তাই পরদিনই বিদায় নিতে হ'ল রোলাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে—যে পরের বার তাঁর সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথালাপ করবই করব। শুনে তিনি প্রীত হ'য়ে বলেছিলেন: "খুব ভালো কথা, কেবল ঐ সঙ্গে জর্মন ভাষাও শিখো—তুমি যখন গায়ক তখন য়ুরোপে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া দরকার—অর্থাৎ জর্মন সঙ্গীত।"

বারো

রোলাঁর স্নিগ্ধ স্নেহশীলতায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম—আর এই জন্যে যে, শূনেক গ্রামে আমি গান করে তাঁর আন্তরিক তারিফ পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন এ-শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকোবিদ (musicologue)। তাই আমার ফরাসী ভাষা শেখার উৎসাহ ঝোড়ো হাওয়ায় আগুনের মতন দীপ্ত হ'য়ে উঠল: আমি স্থির করলাম রোলাঁকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছি পরেরবার তাঁর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপ করব ফরাসী ভাষায় সে-প্রতিশ্রুতি না রাখতে পারলে মান থাকবে না।

অথ, আমি প্রথম পারিসের উপকণ্ঠে সেভ্‌র্‌-এ (Sevres) মসিয়ে জুল ব্লকের অতিথি হলাম। তিনি ছিলেন অতি সদাশয়, আমার কাছ থেকে এক ফ্রাঁ-ও দক্ষিণা নিলেন না। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে, তিনি ও শ্রীমতী ব্লক দুজনেই চমৎকার ইংরাজি বলতে পারতেন। তাই সেখানে দুসপ্তাহ থেকে ফরাসী বোলচালে বিশেষ উন্নতি না ক'রেই বিদায় নিলাম। হরিষে বিষাদ।

হর্ষ এই জন্যে যে, তাঁর কাছে থেকে বিশেষ লাভ করেছিলাম তাঁর পাণ্ডিত্যে। তিনি ছিলেন ইণ্ডলজিষ্ট। তাঁর কাছে নানা প্রাচ্যকোবিদ পণ্ডিত আসতেন যাদের মধ্যে কেবল লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর কথা মনে আছে। তিনি অনর্গল ফরাসী ভাষায় কথালাপ করতেন মসিয়ে ব্লকের সঙ্গে। শুনতে শুনতে কান একটু তৈরি হ'ল বিশেষ ফরাসী সন্ধির গ্রন্থিমোচনে সক্ষম হ'য়ে যাকে বলে liaison; বিদেশীর কাছে liaison হ'য়ে

দাঁড়ায় এক দুস্তর বাধা। তবে শনৈঃ পর্বতলংঘনম—এক লাফে তো শিখরে ওঠা যায় না।

মসিয়ে ব্লকের সঙ্গে ইংরাজীতেই কথাবার্তা ক'য়ে আনন্দ পেয়েছিলাম বৈকি—তাঁকে আমাদের নানা গান শুনিয়ে হয়ত কিছু আনন্দও দিয়ে থাকব, কিন্তু আমি যে তাঁর আতিথ্যে ইংরাজীতে কথাবর্তা কয়ে ফরাসী কথালাপে বিশেষ পোক্ত হ'তে পেরেছিলাম একথা বললে তাহা মিথ্যা কথা হবে। বিষাদের মূল এই-ই। তবে এই বিষাদের ফলেই রুখে উঠে পণ নিলাম যে, ভবিষ্যতে এমন ফরাসী পরিবারে ছাড়পত্র পেতে হবে যেখানে কেউ ইংরাজি জানে না।

এ-রোখকে বলা চলে মহৎ রোখ। কারণ এর পরে দু দুটি ফরাসী পরিবারে পর পর প্রবেশ করলাম সেখানে পারি বা না পারি ফরাসী না ব'লে উপায় ছিল না—যেহেতু গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী আদৌ ইংরাজি জানতেন না। এদের মধ্যে একজন ছিলেন প্যারিসের বিশিষ্ট ফরাসী রাজপুরুষ fonetionnaire—যেমন সদাশয় তেমনি আলাপী। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—বেশ একটু উন্নতি হ'ল ফরাসী কথালাপের। আমার হোস্ট-এর নাম মনে নেই কিন্তু আশ্চর্য, মনে আছে তাঁর একটি চাকরাণীর এক বৎসরের নয়নমোহন শিশুকে। আমার বন্ধু কর্তা বললেন "চাকরাণীটিকে তার নাগর ভুলিযে এনে তার গর্ভাধান ক'রে গায়েব হয়েছে আর এক প্রেয়সীর তল্লাসে।" আমার তাই আরো মায়া করত। আহা, এই জারজ শিশু—ফুলের মত শিশু—ভবিষ্যতে সমাজে পাসপোর্ট পেতে না জানি কী বিষম বেগ পাবে। কিন্তু যে ছবিটি অবিস্মরণীয় সেটি এই যে, আমাকে দেখলেই সে অপরূপ হেসে দুহাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকত, আর আমি তাকে সাদরে কোলে তুলে নিতাম। মনে পড়ত' পিতৃদেবের "জীবন পথের নবীন পান্থ" কবিতার দুটি চরণ :

> এ-বিশ্ব সৌন্দর্য যেই দিকে চাই—রাশি রাশি হয়েছে সৃষ্ট,
> তেমন সৌন্দর্য কিন্তু দেখি নাই—শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট!

অতঃপর একটা লম্বা ছুটিতে লণ্ডনে এসে বিজ্ঞাপন দিযে আমন্ত্রণ পেলাম এক ফরাসী পরিবারে—হ্যামারস্মিথে। গরীব পল্লী কিন্তু আমার গৃহকর্ত্রীর অনবদ্য গৃহিণীপনায় গৃহটি হ'য়ে উঠেছিল সত্যিই আরামনিলয়। সেখানে একদিন সুভাষ এসে আমাকে ফরাসী বলতে দেখে কী যে খুশী! কিন্তু বলল: "এই সঙ্গে জর্মন ভাষাটাও শেখা চাই। ওদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে, ওরা উঠছে, ফরাসীরা পড়ছে—"ডেকাডেন্ট।" আমি বললাম: "কিন্তু ফরাসীদের জাতিগত অবক্ষয়—হয় হোক না সুভাষ, ওদের ভাষা যে মধুময়।" সুভাষ তখন জেরা শুরু করল: "কিন্তু ফরাসীদের এক মহাশিল্পীও তোমায় বলেন নি কি জর্মন ভাষা শিখতে?"

"সে তো জর্মনদের গানের জন্যে।"

"গান ছাড়া কি জর্মনির আর কিছুই নেই বলতে চাও?

এই ধরণের তর্কাতর্কি। সুভাষ জর্মন জাতির তেজস্বিতা, গঠন নৈপুণ্য, নিয়মানুবর্তিতা, ডিসিপ্লিন প্রভৃতি গুণের বিষম অনুরাগী হ'য়ে উঠেছিল-একদা ফন হিণ্ডেনবার্গ এর সঙ্গে দেখাও করেছিল। পরে জর্মনভাষায় সে অনর্গল বক্তৃতাও দিতে পারত। কিন্তু ফরাসী ও ইতালিয়ান ভাষা সে জানত না তো! জিৎ কার? বলা কঠিন বৈকি।

এবার আমার ফরাসী ভাষা চর্চার তৃতীয় অধ্যায়ে আসি—হামারস্মিথে এর্ন্ন্-পরিবার পর্বে!

আমি আসার পরে আমার দেখতে দেখতে এ-পরিবারটির সঙ্গে ভাব হ'য়ে গেল—যেকথা আমি আমার প্রথম উপন্যাস "মনের পরশ" এ লিখেছিলাম ১৯২৪ সালে। চল্লিশ বৎসর পরে এর দ্বিতীয় সংস্করণ "ভাবি এক হয় আর"—এ এ-স্নেহশীল পরিবারটির কথা বাদ দেই। এতে ক'রে উপন্যাসটির গতি নিটোল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যাদের কাছে অচেল প্রীতি ও সেবা পেয়েছিলাম এবং যাদের সঙ্গে নিরন্তর কথালাপে আমার ফরাসী ভাষায় আলাপ করার শক্তি দ্রুতবেগে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল তাদের প্রসঙ্গ বাদ দেওয়ার জন্য মন আমার থেকে থেকে ক্ষুব্ধ হ'ত। তাই মনে হ'ল—আমার "স্মৃতির শেষ পাতা"-য় এর্ন্ন্ পরিবারের কাছে আমি কী পেয়েছিলাম তার স্বাক্ষর রেখে যাই সকৃতজ্ঞে।

গৃহকর্তা মসিয়ে এর্ন্ন্ আমাকে নানা ফরাসী বই পড়ার নির্দেশ দিতেন সানন্দেই। মাদাম এর্ন্ন্ আমাকে দিদির মতনই স্নেহ করতেন ও রকমারি ফরাসী রান্না ক'রে জোর ক'রে খাওয়াতেন হরদম—ঠিক যেমন বাংলা দেশের স্নেহময়ীরা করেন। শরৎচন্দ্রের একটি উক্তি মনে পড়ে (পুনরুক্তি হয় হোক)—"সংসার ছেড়ে বৈরাগী হব কেমন ক'রে?—যেখানেই যাই মা যে জুটে যায় যে!"

কিন্তু সবচেয়ে অবিস্মরণীয়া মাদাম এর্ন্ন্'র অষ্টবর্ষা ফুটফুটে মেয়ে—জ্হান (Jane)—যে হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার ফরাসী আলাপের নিয়ন্ত্রী। ফরাসী ভাষা যে এত শ্রুতিমধুর হ'তে পারে হয়ত আমি জ্হানকে ভালো না বাসলে জানতে পারতাম না। আমার ফরাসী উচ্চারণে বা পদগঠনে কোথাও ভুল হ'লে সে কী খিল খিল ক'রে হাসি তার—মনে হ'ত ইংরাজী উপমা—tinkling bell! আমি এমন মধুর আনন্দময়ীকে ভালোবাসব এতে বিচিত্র কিছু নেই—স্নেহ নিম্নগামী নজিরও তো চাক্ষিব। বিচিত্র—তার আমাকে ভালোবাসা। আমি দু'দিনে সত্যিই হ'য়ে উঠেছিলাম তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, খেলার সাথী তথা "chevalier errant" (বলতেন মসিয়ে এর্ন্ন্)। যখন তখন গুটি গুটি এসে পিছন থেকে আমার চোখ টিপে ধরবে, গলা জড়িয়ে টানবে, আমার কোলে এসে গদিয়ান হ'য়ে অনর্গল ব'লে চলবে কত

কী—তার স্কুলের কথা, সখীদের কথা, পুতুলের কথা, সিনেমার কথা—কিসের নয়? আমাকে ওরা ডাকত মশিয়ে রোওয়া (Roi-এর উচ্চারণ ফরাসীতে রোওয়া)—মাদাম এর্ম্ থেকে থেকে আমাকে বাঁচাতে দুমদুম ক'রে এসে তাকে ধমকাতেন: "Va t'en (যাঃ পালাঃ)! মশিয়ে রোওয়াকে দিক করিস নি, তাঁর তোর অফুরন্ত গালগল্প শোনা ছাড়াও কাজ আছে।" জ্হান বিষম অভিমানিনী—থরথর ক'রে তার ঠোঁট ফুলে উঠত। অমনি তাকে আমি কোলে টেনে নিয়ে বলতাম (ফরাসী ভাষায়): "Mon ma cherie, je suis a ta service toujours" (না মণি আমি তোমার সেবাই করতে চাই চিরদিন) অমনি তার চোখের জলে ফুটে উঠত হাসির ইন্দ্রধনু। মা স্নেহে গদ্‌গদ হ'য়ে বলতেন: "মেয়ে আমার সোজা মেয়ে নয়, জানে কী ক'রে মা-র ওপরেও এককাঠি যেতে হয়..." ইত্যাদি। এইভাবে আমার ফরাসী আলাপে দেখতে দেখতে উন্নতি হয়—নিরন্তর জ্হানের সঙ্গে কথালাপ ক'রে। এমন মধুর শিক্ষয়িত্রী, তার উপর মধুর ভাষা—হবে না উন্নতি? পরে বার্লিনে আমাকে বিখ্যাত বহুভাষী কবি ৺শহীদ সুরবর্দি বলত প্রায়ই। "প্রসিদ্ধি আছে—ইতালিয়ানই সব চেয়ে শ্রুতিমধুর। কিন্তু আমার মনে হয় সবচেয়ে মধুর ভাষা রুষ, তার পরেই ফরাসী।" রুষ ভাষা আমি জানি না—তবে আমার রুষ বন্ধুবান্ধবীর তথা শহীদের মুখে এ ভাষায় কথালাপ শুনতে সত্যিই খুব ভালো লাগত। ইতালিয়ান আমি পরে শিখেছিলাম—(বেশিদূর এগোতে পারি নি, তবে কথাবার্তা অল্প স্বল্প চালাতে পারতাম সহজ বই পড়তেও পারতাম, ইতালিয়ান গান গাইতেও পারতাম নিখুঁৎ)—তাই শহীদের একথায় সায় দিয়ে বলতাম: "ভাই, তোমার একথায় আমার পূর্ণ সায় আছে তবে ফরাসী ভাষা যে এত শ্রুতিমধুর জ্হানকে ভালো না বাসলে বোধহয় পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারতাম না। শহীদের মুখে আগল ছিল না (তার কথা বলব যথাকালে) সে বলত পিঠ পিঠ চোখ ঠেরে: "ফরাসী ভাষার মধুরত্ব আরো বেশি উপলব্ধি করতে পারতে ভাই যদি কার্তিয়ে লাতাঁয় (Quartier Latin) প্রণয়িণীর সঙ্গে গৃহস্থালি করতে করতে তোমার এ-ভাষায় হাতে খড়ি হ'ত।"*

অত্র শহীদের চটুল পরিহাস সম্বন্ধে বলতে চাই—মীরা যে গেয়েছিলেন: "প্রেম বিনা নহি মিলে নন্দলালা"—এ সারকোক্তিটি শুধু নন্দলালা নয় সব লালা-র সম্বন্ধেই খাটে। তাই ভাষা-লালাকেও ভালো না বাসলে পাওয়ার মতন পাওয়া যায় না। আমি ফরাসী ভাষাকে ভালোবেসেছিলাম ব'লেই প্রথম জ্হানের কাছে ও পরে জর্মনিতে আমার চার পাঁচটি রুষ বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গে আলাপ ক'রে ফরাসী ভাষায় পারঙ্গম হ'য়ে উঠেছিলাম - সেকথা বলব যথাকালে।

* কার্তিয়ে লাতাঁ-য় ফরাসী ছাত্ররা অকুতোভয়ে প্রণয়িনীর সঙ্গে থাকে—যাঁরা ছাত্রসমাজে স্ত্রীর স্থান পেয়ে থাকেন। আমার "দোলা" উপন্যাস দ্রষ্টব্য।

যাকে ভালোবাসা যায় তার প্রতি মনের স্বতঃই পক্ষপাত হয় এ একটি সর্বস্বীকৃত সত্য। কিন্তু পক্ষান্তরে কোনো কিছুকে ভালো না বাসলে যে তার রূপগুণমহিমার যথার্থ মূল্যায়ন হ'তে পারে না এ-ও সমান সত্য। ভালো না বাসলে যেমন মহাজনের মধ্যেও নানা খুঁৎ চোখে পড়ে, তেমনি ভালোবাসলে মলিনের মধ্যেও নির্মলিনের সন্ধান মেলে। আমি একথার একটি চমৎকার প্রমাণ পেয়েছিলাম ১৯২১-২২ সালে জর্মানিতে জর্মন ভাষায় ও গানে তালিম নেওয়ার সময়। জর্মন ভাষা আমি যতদিন সত্যি ভালোবাসতে পারি নি ততদিন এ-ভাষায় আমার তেমন প্রগতি হয় নি—ওর শুধু কঠোর ধ্বনিই কানে ঠেকত। কিন্তু যেই ওর কাব্যরসমহিমা ও সাঙ্গীতিক ওজস্বিতা আমাকে মুগ্ধ করল সেই আমি জর্মন ভাষার মধ্যে নানা ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম যা আগে পারি নি। বিশেষ ক'রে জর্মন গানকে (শুর্বার্ট, শোর্প্যা, ব্রাহ্‌ম্) আমি প্রেমের বরণমালা দেবার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলাম কেন রোলাঁ আমাকে জর্মন ভাষা শিখতে বলেছিলেন। ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে একথা আরো বেশি খাটে। তাই এবার লণ্ডনের হারানো খেই ধরি ফের।

মসিয়ে এর্ম্ব্র্ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন ব'লে ছাত্রদের পড়াতে একটা সহজ পটুতা অর্জন করেছিলেন। আমি এ-সুবিধা ছাড়ি নি—তাঁকে যখন তখন ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে যেখানে বুঝতে পারছি না বুঝে নিতাম। আমার বিশেষ ভালো লেগেছিল মলিয়ের-এর বিখ্যাত Bourgeois Gentilhomme ও Malade Imaginaire! এই সময়ে Jean Christophe-র একটি খণ্ড পড়ি মূল ফরাসীতেও—আরো কয়েকটি বই। কিন্তু বইয়ের ফিরিস্তি দেওয়ার সার্থকতা দেখি না। শুধু ব'লে রাখি—মসিয়ে এর্ম্ব্র্ যে যে বই পড়বার নির্দেশ দিতেন পড়তাম সাধ্যমত। এবার মাদাম এর্ম্ব্র্‌র কথা বলার পালা।

জ্‌হানকে ভালোবাসবার পরে মাদাম আমাকে ভাই [fre´ve) সম্বোধন করতেন ব'লে আমিও তাঁকে ডাকতাম দিদি (sœur) ব'লে। তিনি আমার চেয়ে আট দশ বৎসর বড় ছিলেন। জ্‌হান ছিল তাঁর নয়নতারা। তাই ভাই বোন জ্‌হানের প্রভাবেই পরস্পরের এত কাছে এসেছিল। কত কাছে—বলি।

একদা আমি তাঁকে একটি পতিব্রতা মেয়ের প্রসঙ্গে বলি—"আমাদের দেশে পতিব্রতা স্ত্রী-কে সবাই গভীর শ্রদ্ধা করে।" বলতে তিনি হেসে বলেন: "তাহ'লে ভাই, তোমাদের দেশে আমাকে সবাই দূর ছাই করবে নিশ্চয়—যেহেতু আমি মশিয়ে এর্ম্ব্র্‌র স্ত্রী নই—প্রণয়িনী মাত্র!" ব'লে বলেন তাঁর কাহিনী যা মেয়েরা সহজে অনাত্মীয়কে—বিশেষ ক'রে বিদেশীকে—বলতে চায় না। তাঁর কাহিনী ছিল দীর্ঘ, সব মনে নেই, তবে অবিস্মরণীয় অংশই জীবনে সব চেয়ে বেশি পাথেয় জোগায়, তাই বলি তাঁর কাছে কী পেয়েছিলাম তাঁর সত্যনিষ্ঠ আত্মকথন থেকে। আমার

কাছে তাঁর কনফেশন করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। পরে শুনেছিলাম মসিয়ে এর্ন্‌ও চাইতেন না যে, গৃহিণী স্বেচ্ছায় স্ত্রীর মর্যাদা হারায় সত্যবাদী হ'তে চেয়ে। কিন্তু মাদাম এর্ন্‌ কোনোদিনই রাজী হন নি তিনি যা নন তাই ব'লে নিজের পরিচয় দিতে! ফলে মসিয়ে এর্ন্‌র নানা অসুবিধা হ'য়েছিল, বলাই বেশি। কারণ ফরাসী দেশে না হ'লেও সেযুগে ইংলণ্ডে প্রকাশ্যে কেউ কোনো প্রণয়িনীর সঙ্গে ঘর করলে তার নাম দেওয়া হ'ত living in sin (আজও হয় তবে এ-পঞ্চাশ বৎসরে জগতের সর্বত্রই নীতিবাদের ভিৎ শিথিল হ'য়ে গেছে—এমন কি আমাদের দেশেও খুব কম পুরুষই প্রণয়িনীকে প্রকাশ্যে স্ত্রীর মান মর্যাদা দিতে সাহস পান।) রক্ষিতা রাখা আর সমাজে থেকে তার সঙ্গে ঘর করা এ-দুয়ের মধ্যে এখনো তফাত আছে। আমি কেবল একজনকে জানি যিনি ধনী হ'য়েও বিবাহ না ক'রে প্রণয়িনীকে প্রকাশ্যে গৃহিণী পদে বরণ করেছিলেন। সে আজ বিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা—এখন তাঁদের দাম্পত্য সম্বন্ধের কী ধরণের পরিণতি হয়েছে খবর রাখি না।

কিন্তু মাদাম এর্ন্‌ ছিলেন শুধু সত্যবাদিনী নন, তেজস্বিনী। ধনীর কন্যা। বিবাহ করেন বোর্দো-র এক সুরা বণিককে। জ্‌হানের জন্ম হবার পরেই—বৎসর দুইয়ের মধ্যেই—বণিক স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে গায়েব হন আর একটি মেয়ের পিছু নিয়ে। মাদাম এর্ন্‌ স্বামীকে ডাইভোর্স করার পরে মসিয়ে এর্ন্‌ তাঁর সঙ্গে প্রেমে পড়ে তাঁকে বিবাহ করতে চান। মাদাম বলেন—বিবাহে তাঁর আর বিশ্বাস নেই। তাই মসিয়ে যদি বিবাহ না ক'রে তাঁকে ঘরণী করতে রাজী হন কেবল তাহলেই তিনি তাঁর সঙ্গে সহবাস করবেন, নৈলে নয়। মসিয়ে এর্ন্‌ অনেক চেষ্টা ক'রেও সুন্দরী তেজস্বিনীর পণ ভাঙতে না পেরে রাজী হন ও লণ্ডনে অধ্যাপক হয়ে আসেন। কিন্তু মাদাম সর্ত করেন বন্ধুবান্ধবদের কাছে মশিয়ে এর্ন্‌ বলতে পারবেন না যে, গৃহিণী তার পরিণীতা স্ত্রী। মসিয়ে এর্ন্‌ তাঁকে সত্যি ভালোবেসেছিলেন ব'লেই রাজী হয়েছিলেন এ-সর্তে—লণ্ডন এক কলেজে অধ্যাপনা শেষ ক'রে ঘরে ফিরে আসতেন—কখনো গৃহে পার্টি দিতেন না। নিশ্চয়ই তাঁর এমন বন্ধু ছিল যারা মাদামকে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী নয় জেনেও পার্টিতে আসতে রাজী হ'ত, জানি না, তবে যেটা জানি সেটা এই যে, মাদাম ছিলেন সত্য কথনে অনমনীয়। মসিয়ে কিছুটা বিব্রত।

আমার এ-বিদেশিনী দিদিটির স্নেহ আমি ভুলি নি। দেশে ফিরেও তাঁকে লিখতাম, তিনিও তাই "রোওয়া"কে লিখতেন দীর্ঘ পত্র তাঁর নয়নতারা জ্‌হানের খবর দিয়ে। প্রতি-পত্রেই লিখতেন জ্‌হান আমাকে তেমনিই ভালোবাসে—আমার চিঠি পেলে আহ্লাদে আটখানা হয়।

একটি ঘটনা মনে পড়ে, বলবার মত—কত স্নেহ করতেন আমাকে এ-তেজস্বিনী—সমাজে যাঁর নাম "ভ্রষ্টা"। আমার হঠাৎ একদিন দাঁতে ব্যথা হ'য়ে মুখ ফুলে ওঠে। তিনি সারারাত আমার গালে ফোমেণ্ট করে গালফোলা সারিয়ে দিয়েছিলেন। পরদিন দাঁতটি তুলে ঘরে ফিরে তাঁকে ধন্যবাদ দিতেই তিনি হেসে বললেন: "ধন্যবাদ তো আমারই তোমাকে দেওয়ার কথা ভাই, তোমার ও-গালফোলা মুখ দেখার যন্ত্রণা থেকে আমাকে অব্যাহতি দিলে ব'লে।"

ফরাসী রসিকতার নমুনা হিসাবেও উক্তিটি উল্লেখযোগ্য—তথা অবিস্মরণীয়—অন্তত: তাঁর নির্মল স্নেহ পেয়ে যে ধন্য হয়েছিল তার কাছে!

কিন্তু আমি সুভাষকে তাঁর কথা খোলাখুলি বলতে সাহস পাই নি।

তেরো

১৯২১ সালের মাঝামাঝি আমি বার্লিনে গিয়ে জর্মন ভাষা ও গান শিখতে শুরু করি। সেখানে নানা রুষ বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে ফরাসী ভাষায় আলাপ ক'রে যখন সুইটজর্লণ্ডে ভিলনুভ শহরে রোঁলার সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন আমি তাঁর সঙ্গে অনায়াসেই ফরাসী ভাষায় কথালাপ করতে পেরেছিলাম—যার অনুলিপি আমার দুটি বইয়ে প্রকাশ করেছি—"তীর্থঙ্কর" ও "Among the Great"; শুধু তাঁর সঙ্গে আলাপ নয়, তাঁর ফরাসী ভাষায় লেখা বহু পত্রই আমি পেয়েছিলাম দেশে ফি'রে যাদের মধ্যে কয়েকটির বাংলা অনুবাদ তীর্থঙ্করে ও ইংরাজী অনুবাদ Among the Great-এ ছাপা হয়েছে। আমার ভাগ্য ভালো যে এ বই দুটি এখনো বাজারে মেলে। কিন্তু ভাগ্যের সেরা ভাগ্য এই যে, রোঁলা আমার মতন অচিন বিদেশীকেও তাঁর গভীর স্নেহদানে ধন্য ক'রে আমার নানা প্রশ্নের খুঁটিয়ে উত্তর দিতেন। দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে আমার ভাবের লেন-দেন কী ভাবে হ'ত তার কিছুটা বর্ণনা বাংলায় ও ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়েছে ব'লে রোঁলা সম্বন্ধে শুধু আর একটি উক্তি করি শ্রদ্ধার তর্পণে। কথাটি এই যে, এ যুগে রোঁলা এসেছিলেন একটি বিশিষ্ট ভাবধারাকে পুষ্ট করতে—যার নাম আন্তর্জাতিকতা। দুঃখের বিষয়, জাতীয়তা—nationalism—এখনো সারা বিশ্বে হুহুঙ্কারী। এ হুঙ্কার কমবেই কমবে তবে কবে সে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব—বিশেষ যখন চাক্ষুষ করা দু-দুটো মহাযুদ্ধের ধ্বংস তাণ্ডবের পরেও জাতীয়তার সিংহনাদ স্তিমিত হয় নি।

চোদ্দ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সালে। আমি মাত্র সমুদ্র পার হ'য়ে কেম্ব্রিজে আসীন হই ১৯১৯ সালে। পৌঁছিয়ে প্রথম সে কী উল্লাস'—এসেছি এমন স্বাধীন দেশে যার আকাশে বাতাসে ব্যক্তিরূপের প্রতি সমীহ—respect for individuality—ওতপ্রোত! শুধু পুরুষের ব্যক্তিরূপ নয় মেয়েরাও কী আশ্চর্য বেপরোয়া! এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, সে-সময়েও আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়েরা পর্দানশীনা। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মতন দুচারটি খ্যাতনাম্নী সোচ্চার হ'য়ে উঠলেও সাড়ে পনেরো আনা মহিলা চিকের বাইরে এসে পুরুষের সহযাত্রিণী হন নি। কেম্ব্রিজে ও লণ্ডনে প্রথম মিশবার সুযোগ পাই দুচারটি অন্য প্রদেশের ভারতীয় ললনার সঙ্গে। মনে আছে—কী উল্লাস আমার মনকে চেতিয়ে তুলত এ সংস্পর্শে বাংলা দেশে তখন কেবল ব্রাহ্ম সমাজের ও ঠাকুর বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন পর্দা সরিয়ে বাইরে কর্মী হ'তে সুরু করেছেন- বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব "ঘরে বাইরে" উপন্যাসের প্রভাবে, যার বাণী ছিল—মেয়েরা শুধু রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর, ও সূতিকা গৃহের নেত্রী নয়, বাইরেও তাদের উপস্থিতির প্রভাব আকাশে বাতাসে চারিয়ে যাওয়া যায়। ১৯১৭-১৮ সালে যখন "সবুজ পত্রে" "ঘরে বাইরে" ধারাবাহিক ভাবে বেরুত তখন পরের সংখ্যার জন্যে আমরা—তরুণরা—সত্যিই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকতাম। বেশ মনে আছে রবীন্দ্রনাথ যে নব নির্দেশ দেন নারীর নব কর্তব্যের—তার বাণী সুর এই যে, বাইরের ডাকেও মেয়েদের সাড়া দিতে হবে, অর্থাৎ শুধু গৃহকর্মে নয়, সর্বকর্মে। "ঘরে বাইরের" ছত্রে ছত্রে ফুটেছে এই বাইরের ডাক। যথা সন্দীপের নিখিলেশকে: "মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল, তার উপরে সত্য রূপ ধ'রে বিরাজ করে, আমাদের (পুরুষদের) তর্কের মতো তা বস্তুহীন নয়। তাই আমি তোমাকে ব'লে রাখছি আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই আমাদের দেশকে বাঁচাবে।" বিমলা ওরফে মক্ষীরাণীকে: "না না, আপনি লজ্জা করবেন না—মিথ্যা লজ্জা সংকোচ বিনয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনি আমাদের মউচাকের মক্ষীরাণী। আমরা আপনাকে চারদিকে ঘিরে কাজ করব। কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই—তাই আপনার থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট, আনন্দহীন হবে" ইত্যাদি।

কথাটা কিছু নতুন নয়। বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে নারীর নাম পাই। তন্ত্রের একটি মূল বাণীই এই যে নারী পুরুষের শক্তি। শিব পার্বতীকে বলছেন: "শক্তি জ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তি হাস্যায় কল্পতে"—শক্তির জ্ঞান না থাকলে মুক্তি হ'য়ে দাঁড়ায় কথার কথা, হাসির কথা। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর নানা লেখায় ও ভাষণে

জীমূতমন্দ্রে ঘোষণা করেছিলেন যে, শক্তিস্বরূপিণী মেয়েরা স্বাধীন না হ'লে আমাদের জাতীয় অভ্যুত্থান হ'তেই পারে না :

"শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অক্ষম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে।...শক্তির কৃপা না হ'লে কী হবে? ঘোড়ার ডিম হবে? য়ুরোপে আমেরিকায় কী দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা।

"দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম প্রচার করিলে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি এক মহা তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এ-মৈত্রেয়ী-খনা-লীলাবতী-সাবিত্রী উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনো নারীর এ-সাহস হইবে না?"*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে খবর পাই—রুষদেশেই মেয়েরা সবচেয়ে বেপরোয়া—এমন কি জারজ সন্তানও সেখানে সমাজে স্বাগত, মেয়েরা ভ্রষ্টা হ'লেও সমাজে ফিরে আসতে চাইলে দোর খোলা পান আবার স্ত্রী হবার, মা হবার। এ-ধরণের কথায় একটু চমকে উঠলেও নারী স্বাবলম্বিনী হোক এ আমরা সবাই চাইতাম। স্বাধীনতা পেলে প্রথম প্রথম তার সুপ্রয়োগে কেউই সিদ্ধ হ'তে পারে না, তাই পাশ্চাত্যে মেয়েরা অনেকে ভুল পথে চ'লে উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে দেখা যায়। "কিন্তু তাতে কী?" বলতাম আমরা সঘনে, "য়ুরোপে আকাশে বাতাসে মেয়েদের আনন্দময়ী মূর্তি কি চোখে পড়ে না?" সুভাষ তো নিবেদিতার নজির দিত উঠতে বসতে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার একটি খেদের কথাও মনে আসছে—সে বলত: "কিন্তু ভেবে দেখ, দিলীপ, স্বামীজির শ্রেষ্ঠ সহকর্মী ও জীবনীকার ছিলেন কে? না, নিবেদিতা—যাঁকে আমদানি করতে হয়েছিল এদেশ থেকে। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে এমন মহীয়সীর দেখা পাব কবে?" আমি হেসে টুকতাম: "নিবেদিতার মতন মহীয়সী এদেশেও ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে না ভাই—যেমন শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাযোগীও আশ্রম মন্দির তপোবনে এক আধটির বেশি দেখা যায় না। চাই বললেই কি হাতে চাঁদ আসে দাদা?" এ ধরণের কথায় সুভাষ উদ্দীপ্ত হ'য়ে বলত: "এ তুমি কী বলছ দিলীপ? মহীয়সী বা মহীয়ান্ দুর্লভ ব'লে কি আমরা চিরদিন সুলভাকে নিয়েই ঘর করব? না না, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি নিবেদিতার মতন অসামান্যাদের দর কমাতে চাইছি না। আমি চাইছি—আমাদের দেশের মেয়েরা এদেশের মেয়েদের মতন বীরবালা হোক—যারা গত যুদ্ধে অভয়া হ'য়ে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল নার্স ডাক্তার ধাত্রী হ'য়ে—যাদের ট্রাম বাস চালাতেও বাধে নি,

*"স্বামীজীর আহ্বান" (উদ্বোধন কার্যালয়) ৫৯, ৬০ পৃষ্ঠা।

যারা এমন কি, কল-কারখানায়ও পুরুষের সঙ্গী হয়েছিল চার বৎসর ধ'রে : অর্থাৎ, শুধু গৃহকর্মের নিরাপদ গণ্ডীর মধ্যে থেকে গৃহলক্ষ্মী হ'য়ে যাদের সাধ মেটে নি—রণসজ্জার গহন পথেও যারা হয়েছিল বাপ ভাই স্বামী ছেলের সহযাত্রী।"

স্বভাবের এ-খেদ সত্যভিত্তি। তাই গান্ধিজি নৈযুজ্যের যুগে মেয়েদের ডাক দিয়েছিলেন—মেয়েরাও বেরিয়ে এসেছিল দলে দলে ঘরের গণ্ডি ছেড়ে পুরুষের সহকর্মিনী হ'তে—শুধু হাটে বাজারে নয়, ফ্যাক্টরি-কারখানায়ও তারা কাজ নিয়েছিল—শুধু বন্দুক ধ'রে ফৌজ হওয়া বাকি ছিল—যার পত্তন হয় বোধহয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (ঠিক মনে পড়ছে না) বিশেষ ক'রে রুষদেশে। (পরে মালয়ে সুভাষও গ'ড়ে তুলেছিল ঝাঁসীর রাণী রেজিমেন্ট ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামিনাথমকে নেত্রীর পদে বসিয়ে।)

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে ঠিক পুরুষের সঙ্গে নারীর এভাবে পাল্লা দেওয়া বুঝতেন না—যেকথা স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় খণ্ডে আমি ফলিয়েই লিখেছি—১৭৬—১৭৪ পৃষ্ঠায়। কবিগুরুর মূল বক্তব্যটি ছিল এই যে, নারী "প্রাণকে পূর্ণতা দেয়" (বাঁশরি) কেননা।

> "লভিলে হে নারী, তনুর অতীত তনু
> পরশ-এড়ানো সে যেন ইন্দ্রধনু
> নানারশ্মিতে রাঙা ;
> পেলে রসধারা অমর বাণীর অমৃতপাত্র ভাঙা।"
>
> (বীথিকা, প্রত্যর্পণ)

আমাকে তিনি এ-সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার মূল বাণীটি ছিল এই যে, নারী, পুরুষের পরিপূরক, প্রতিযোগী নয়, উভয়ের এলাকা আলাদা। এককথায়, তার সমগ্র সত্তা ও শক্তি দিয়ে (বিশেষ ক'রে সুষমায় হার্মনিতে) পুরুষের চিত্তকে উদ্বোধিত ও প্রাণকে উচ্চকিত করাই তার স্বধর্ম, মঞ্চে চ'ড়ে বক্তৃতা, বা রাজনীতির আখড়ায় মল্লযুদ্ধের কাজ তার পরধর্ম। এ সম্পর্কে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তার অনুলিপি থেকে কিছু উদ্ধৃত করি (স্মৃতিচারণ ২য় খণ্ড, ১৮২ পৃঃ) :

"পুরুষ ও নারীর স্বভাব ও ছন্দ আলাদা, আর আলাদা ব'লেই সৃষ্টির লীলায় বৈচিত্র্য আজো ফুরালো না। যদি মেয়েরা স্বভাবে স্বতন্ত্র না হ'ত তাহ'লে বিশ্বলীলায় প্রকাশের ও লাবণ্যের প্রাণস্পন্দন থেমে যেত কবে! বস্তুতঃ, সৃষ্টির প্রেরণা নিজেকে নিত্যনতুন ক'রে রচনা করতে চায় ব'লেই প্রকৃতি একজনকে অপরের প্রতিরূপ ক'রে গড়তে চান নি। এককথায়, নারী ও পুরুষকে স্বভাবে ভিন্নধর্মী ক'রে তৈরি করা হয়েছে ব'লেই উভয়কে একলক্ষ্য হ'য়েও আলাদা ছন্দে চলতে হয়—যদি তারা কৃতকৃত্য হ'তে চায়।"

এ-সম্পর্কে একটি উপভোগ্য রসিকতা মনে প'ড়ে গেল—আমার "ধর্ম বিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ" গ্রন্থে লিখেছি শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী-র তর্পণে। উপভোগ্য তথা প্রাসঙ্গিক ব'লে উদ্ধৃত করতে কুণ্ঠিত বোধ করছি না।

"সুরবর্দি সেদিন কথায় কথায় একটি ফরাসী রসিকতা পেশ করে তুলসীর বাড়ীতে আমার গানের শেষে। ব্যাপারটা এই: ফরাসী লোকসভায় (Chambre des Deputés তর্কাঙ্গনে) মহাতর্ক—মেয়েদের ভোট দেবার অধিকার দেওয়া উচিত কিনা। উগ্র পুরুষপন্থীরা হাঁকলেন। 'না। অসম্ভব।' উগ্রতর নারীপন্থীরা চ'টে বললেন: 'না? Sacrebleu! কেন শুনি?' প্রতিপক্ষ বললেন: 'Parce que il ya de la difference entre l'homme et la femme (পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে তফাৎ আছে।' সঙ্গে সঙ্গে সব সভ্য একজোটে উঠে দাঁড়িয়ে করলেন জয়ধ্বনি: 'Vive la difference (বেঁচে থাক এ-তফাৎ)!'

তুলসী পিঠ পিঠ বলল হেসে: 'এ-তফাৎ লুপ্ত হ'লে ব্যাপারটা কেমন ঘোরালো দাঁড়ায় সে সম্বন্ধে আমিও বলি এর জুড়ি গল্প। এক নিরীহ ব্রাহ্ম ভদ্রলোক প্যারিসে এক কাফেতে ব'সে সন্ধ্যাবেলায় সামনের এক আলাপী অতিথির সঙ্গে গল্প জমিয়ে তুলেছেন—এমন সময় দোরের কাছে আর এক অতিথির অভ্যুদয়। ব্রাহ্মটি শুধালেন: 'এ কী বেশ। উনি কে বলতে পারেন? পুরুষ না মেয়েছেলে?" অতিথি আতপ্ত স্বরে বললেন: 'Tonnerre de Dieu' 'পুরুষ কেন হ'তে যাবে? ও যে আমার মেয়ে।' ব্রাহ্ম ভদ্রলোক সকুণ্ঠে বললেন: 'Je vous demande pardon, Monsieur—মাপ করবেন আমি জানতাম না আপনি ওর বাবা।' তিনি এবার রেগে আগুন হ'য়ে বললেন: 'Mille tonnerres! বাবা হব কী দুঃখে? আমি যে ওর মা'!"

কিন্তু বিলেতে মাঠে বাটে ঘাটে হাটে সর্বত্র বিদেশী ও বিদেশিনীকে হাত ধরাধরি ক'রে চলতে বা সমতালে অকুণ্ঠে নাচতে দেখে মনে খেদ হ'ত প্রায়ই যে, আমাদের দেশের মেয়েরা এমন স্বাধীন হ'তে পারে নি। আজ হয়েছে যদিও তার ফল শুভ হয়েছে কি না সে নিয়ে অশ্রান্ত তর্ক করা চলে—যার নিষ্পত্তি হবার নয়। যুক্তির সঙ্গে যুক্তির সংঘাতে কে কোথায় জিতেছে? শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর একটি উপমা মনে পড়ে (Savitri 2.10)

> An inconclusive play in Reason's toil.
> Each strong idea can use her as its tool ;
> Accepting every brief she pleads her case.
> Open to every thought she cannot know.
> The eternal Advocate, seated as judge,
> Armours in logic's invulnerable mail

A thousand combatants for Truth's veiled throne
And sets on a high horseback of argument
To tilt for ever with a wordy lance
In a mock tournament where none can win.

অর্থাৎ

বিচিত্র বুদ্ধির লীলাখেলা! তার বাঙ্ময় যুক্তির
বহু প্রয়াসেরো অন্তে পায় না সে নিশ্চিন্তির দিশা।
প্রতি দীপ্ত ভাবধারা কবে তাকে নিত্য আজ্ঞাবাহী।
বরণ করে সে প্রতি চিন্তা—তবু লভে না তো জ্ঞান।
একাধারে চিরন্তন ব্যবহারাজীব বিচারক
সত্যের-প্রচ্ছন্ন-সিংহাসন লুব্ধ লক্ষ যুধামানে
ন্যায়ের দুর্ভেদ্য বর্মে সুরক্ষিয়া—কারিয়া আসীন
তুঙ্গ-তর্ক-তুরঙ্গমপৃষ্ঠে করে উদ্দীপিত শুধু
তাদের অসাঙ্গ কথা কথাসার মল্লযুদ্ধে—এক
মায়ারণাঙ্গনে—যেথা পারে না কেহই হ'তে জয়ী।

এ মৃদু ব্যঙ্গের নিশানা মানুষের মগজী বুদ্ধির অনপনেয় অভিমান। মগজী বুদ্ধি বলছি এইজন্যে যে, আমাদের উপনিষদে ইন্দ্রিয়কে ঘোড়া, দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি ও আত্মাকে রথী বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে, তিনি বুদ্ধিরও ওপারে। হোক, তবু বুদ্ধিই যে আমাদের চালায় মগজী চিন্তার লাগাম ক'ষে এ-সত্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পদে পদে নিজেকে জানান দেয়। কিন্তু যে-বুদ্ধি দিয়ে ভগবানকে জানা যায় সে মগজী বুদ্ধি নয়, তাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন "শুদ্ধ বুদ্ধি"। অর্থাৎ যখন মানুষ কামনা বাসনার পিছুটান কাটিয়ে উঠেছে জ্ঞানের ভূমিকায় তখন যে-নির্মল বুদ্ধি ফুটে ওঠে কেবল সে-ই পথ দেখাতে পারে পরম পদের— বোধির।

কিন্তু সাধারণত: আমরা যে বুদ্ধির তাঁবেদার হ'য়ে সংসারকে বুঝতে ও জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাই সে-বুদ্ধি মুখ্যতঃ মগজী বুদ্ধি—ইংরাজিতে যাকে বলে Cerebral: শ্রীঅরবিন্দ Reason বলতে এই আটপৌরে বুদ্ধিকে নিশানা করেই তাঁর বিদ্রূপের তীরন্দাজি করেছেন কেন না এ বুদ্ধি আত্মিক উপলব্ধির রসকষের খবরদারি করতে পারে না, পারে শুধু বস্তুজগত ও বাহ্য প্রকৃতির (Nature-এর) নানা শক্তিকে হাতিয়ে আমাদের বাহ্য জীবন ও মনোলোককেও (কতকটা) সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে। যে-বুদ্ধিযোগের কথা গীতায় পাই সে এ-বুদ্ধি নয়—যাঁরা ভগবানকে ভালোবেসে তাঁর সঙ্গে নিত্যযোগ কামনা করেন কেবল তাদেরই তিনি এই শুদ্ধ বুদ্ধি

দেন "যেন মাম্ উপযান্তি তে"—যার সাহায্যে তারা ভগবানকে পায়। উপনিষদেও যে বুদ্ধিকে মান দেওয়া হয়েছে সে এই নিষ্কামনা নির্মলা বুদ্ধি—যাকে শ্রীঅরবিন্দ Psychic উপাধি দিয়েছেন তাঁর যোগ পরিভাষায়। কৃষ্ণপ্রেমও আমাকে বলত এই কথাই : যে, উপনিষদে যাকে বুদ্ধি বলা হয়েছে শ্রীঅরবিন্দ তাকেই Psychic being নাম দিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধি শব্দটির উঠতে বসতে ঘরোয়া প্রয়োগে সে এ-উচ্চ পদবী খুইয়ে বসেছে ব'লে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিভাষায় "শুদ্ধ বুদ্ধি" বলাই ভালো, নৈলে চিন্তার স্বচ্ছতা আবিল হ'য়ে আসে। বিকশিত পরিভাষায় প্রতি শব্দের তাৎপর্য স্পষ্ট রাখাই চাই। উপস্থিত আমি বুদ্ধির চলতি ঘরোয়া প্রয়োগকেই বরণ ক'রে বলতে চাই দু একটি কথা।

আমরা যৌবনে—বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডে—মগজী বুদ্ধিকেই আমাদের সন্ধানের শ্রেষ্ঠ সহায় ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছিলাম। না নিয়ে উপায় ছিল না, কারণ মগজী বুদ্ধিই বৈজ্ঞানিক টেকনলজির একাধারে প্রসূতি ও ধাত্রী। মানুষের বহির্জীবনে যে ব্যাপক বিপ্লব ঘটেছে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পরে তার সারথি তো মগজী বুদ্ধিই বটে। হাল আমলে বৈজ্ঞানিকরা সবেমাত্র আভাষ পেয়েছেন যে, তাঁরা মহত্তম আবিষ্কারের দিশা পান মগজী বুদ্ধির প্রসাদে নয়—ইনটুইশনের মাধ্যমে যার বাংলা প্রতিশব্দ স্বজ্ঞা। মগজী বুদ্ধি ঠিক আবিষ্কার করে না, স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞানকে খাটিয়ে চমকে দেয়—বিশেষ ক'রে টেকনলজির সাহায্যে। কিন্তু এ-চমক নিত্যনব রূপছটায় আজকের মানুষকে মাতিয়ে তুলেছে তাই সে মগজী বুদ্ধিকেই বরণ ক'রে নিল জীবনের আদিনিয়ন্তা ব'লে। শ্রীঅরবিন্দের মুখে আমি প্রথম শুনি যে এ-মগজী বুদ্ধির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য ও আশ্চর্য হ'লেও সে কোনো তত্ত্বেরই তল পায় না, শুধু বিচার করে, তর্ক করে, আভাষ পায় সত্যের—কিন্তু পৌঁছতে পারে না কেন্দ্রীয় তত্ত্বজ্ঞানের আলোকলোকে। তাছাড়া—আমাকে লিখেছিলেন তিনি একটি পত্রে যে, "যদুবাবু যদি বলেন তিনি তাঁর নিজের বুদ্ধি যুক্তির নির্দেশে চলছেন। তাহ'লে তাঁর প্রতিপক্ষ মধুবাবুও বলতে পারেন সমান জোরালো স্বরে যে, তিনিও তাঁর বুদ্ধি যুক্তির নির্দেশে চলছেন। কোন্ বুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবে তুমি যে যদুবাবু বা মধুবাবুর যুক্তিই ঠিক? দুই যুধ্যমান দল আপ্রাণ চিৎকার করলেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে না। শেষমেশ সে-ই জেতে যে বেশী বলীয়ান্। আসলে এমন কোনো অভ্রান্ত বিশ্বজনীন যুক্তি নেই যে যুধ্যমান মতামতের সালিশ হ'তে সক্ষম। আছে শুধু তোমার যুক্তি, আমার যুক্তি অগুন্তি ক খ গ ঘ-র যুক্তি। প্রতি মানুষই তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যুক্তি জোগায়, অর্থাৎ তার মানসিক গড়ন বা পক্ষপাতই তাকে চালায়।"*

---

*"His opinion is according to *his* reason. So are the opinions of his political opponents according to *their* reason, yet they affirm the very opposite idea to his.

কিন্তু এ-চিঠিটি শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লেখেন বিশ পঁচিশ বৎসর পরে। ইংলণ্ডে যখন আমি প্রথম যাই কেম্ব্রিজে ট্রাইপস পরীক্ষা দিতে তখন (১৯১৯—২১) আমি বলিষ্ঠ নওজোয়ান, যুক্তির জয়গানে মুখর, মনে নিঃসংশয় যে, "বিশ্বজনীন যুক্তিকে" খুঁজলে পাওয়া যাবে এবং মানুষ স্বভাবে যুক্তিপন্থী। এককথায় যুক্তির নির্দেশে চললেই জগতের ও জীবনের সব সমস্যার চমৎকার সুরাহা হতেই হবে। এ-বিশ্বাস সে-যুগে রাসেলেরও ছিল যিনি ছিলেন বুদ্ধিপূজারী যুক্তিবাদীদের অবিসংবাদিত সম্রাট্—যাঁর নামডাক এ-যুগের বুদ্ধিমন্তদের মধ্যে আজও অচলপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু তাঁর শেষ জীবনে তিনিও দেখতে পেয়েছিলেন যে, মানুষ শুধু যে যুক্তির পথে চলে না তাই নয়, জীবনের লক্ষ্য কী বা বাঞ্ছিত সম্পদ কাকে বলে সে সম্বন্ধেও যুক্তির কিছুই বলবার নেই। বক্তব্যটি পরিস্ফুট করতে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ভারি মজার: "যদি আমি উড়ে নিউয়র্কে যেতে চাই তাহ'লে যুক্তি আমাকে বলে ইস্তাম্বুলের বিমান না নিয়ে নিউয়র্কমুখী বিমানে চড়াই ভালো,—এর বেশি যুক্তি পারে না।" (Human society in Ethics and Politicsএ ভূমিকা) অপিচ, তিনি শেষ জীবনে দারুণ মাথাবকানো সুরু ক'রে দিয়েছিলেন বুদ্ধি দিয়ে আমরা কোনো নৈশ্চিত্যে পৌঁছতে পারি কি না, যাকে জ্ঞান ব'লে বরণ করি সে সত্যি জ্ঞান না আমাদের গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয়। তাঁর একটি নিবন্ধে লিখছেন: 'জ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয় কঠিন, আমাদের কোনো জ্ঞান আছে কি না বলা কঠিন এমনকি আমাদের যে জ্ঞান আছে সেটা জানাও কঠিন।"* তিনি আরো বলতেন শেষের দিকে যে, এ-উদ্‌ভ্রান্ত জগতে এমন কোনো নীতি বা যুক্তির পাঠ দেওয়া যায় না যাতে জগতের সব জাতের মনই

How is reasoning to show which is right? The opposite parties can argue till they are blue in the face—they won't be anywhere nearer a decision. In the end he prevails who has the greater force or whom the trend of things favours. But who can look at the world as it is and say that the trend of things is always (or ever) according to right reason—whatever this thing called right reason may be? As a matter of fact there is no universal infallible reason which can decide and be the umpire between conflicting opinions, there is only my reason, your reason, X's reason, Y's reason multiplied up to the discordant innumerable. Each reasons according to his view of things, his opinion, that is, his mental constitution." (Letters on Yoga—To me 1, pp. 158-59).

* "Many difficult questions arise in connection with knowledge. It is difficult to define knowledge, difficult to decide whether we have any knowledge, and difficult, even if it is conceded that we sometimes have knowledge, to discover whether we can ever know that we have knowledge in this or that particular case."

(TRUTH & FALSEHOOD...BASIC WRITINGS OF BERTRAND RUSSELL)

একজোটে সায় দিতে বাধ্য। যদুবাবুর কাছে যা ভালো মনে হয় মধুবাবুর তাতে ঘোর আপত্তি, বিধু বাবুর কাছে যা সুন্দর সিধুবাবুর কাছে তা কুৎসিত, রাধুবাবুর কাছে যা দুষ্য মাধুবাবুর কাছে তা পোষ্য ··ইত্যাদি।

কিন্তু আমাদের যৌবনে—যখন তাঁকে আমরা বুদ্ধিমত্তম দিশারি ব'লে বরণ করেছিলাম সে-সময়ে—তাঁর সন্দেহ এত বলীয়ান্ ছিল না। তিনি একটি প্রবন্ধে একবার লিখেছিলেন যে যত বয়স বাড়ে ততই জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ বেড়েই চলে, ফলে আগে যেসব বিষয় সম্বন্ধে বলতেন—"জানি বৈকি", পরে ক্রমশই বলতে বাধ্য হন—"কে জানে?" তাই শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন: "So what is the use of running down faith which after all gives something to hold on to amidst the contradictions of an enigmatic universe? If one can get at knowledge that knows, it is another matter; but so long as we have only an ignorance that argues,—well there is a place still left for faith—even faith may be a glint from the knowledge that knows, however far off, and meanwhile there is not the slightest doubt that it helps to get things done, There's a bit of reasoning for you!—just like all other reasoning too, convincing to the convinced, but not to the unconvincible, that is, to those who don't accept the ground upon which the reasoning dances. Logic, after all, is only a measured dance of the mind, nothing else."

(ভাবানুবাদ: "তাই বিশ্বাসকে অনর্থক নিন্দা ক'রে লাভ কী—যখন দেখা যাচ্ছে এ-দুর্বোধ্য জগতের নানা স্ববিরোধী জটলার মাঝে বিশ্বাস অন্ততঃ ধ'রে দাঁড়াবার একটা খুঁটি জোগাতে পারে। যদি এমন জ্ঞানে পৌঁছনো যায় যে সত্য জেনেছে তাহলে অবশ্য আলাদা কথা; কিন্তু যতদিন শুধু অজ্ঞানই উড়ো তর্ক করতে কোমর বাঁধবে ততদিন বিশ্বাসের মর্যাদা থাকবেই থাকবে—এমন কি, বিশ্বাস হ'তে পারে যথার্থ প্রজ্ঞার একটি রশ্মি—সে-প্রজ্ঞা যতই সুদূর হোক না কেন। শুধু তাই নয়, হাজার গণ্ডগোলের মধ্যেও বিশ্বাসের জোরে অনেক কিছু যে সুসম্পন্ন করা যায় একথার মার নেই। এই দেখ, তোমার কাছে এক পশলা যুক্তি বর্ষণ করলাম—হুবহু অন্য নানা যুক্তির মতনই—অর্থাৎ বরণীয় কেবল তাদের কাছে যারা মানে, তাদের কাছে নয় যাদের কোনোমতে বিশ্বাস করানো যায় না—এক কথায় যারা যুক্তির নাচদুয়ারকেই বরণ করতে নারাজ। খতিয়ে, ন্যায়শাস্ত্র মনের গোনাগুন্তি নাচের বোল ছাড়া আর কী?"

অপিচ—লিখছেন শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীতে—যুক্তি কিছুতেই সন্ধানী মানুষকে নিত্যদিশা দিতে পারে না, কেন না

A million faces wears her knowledge here
And every face is turbaned with a doubt.
All is now questioned, all reduced to nought.

অর্থাৎ

যুক্তি পায় যে জ্ঞানের আভাস অর্বুদ মুখ তার
প্রতি শিরে রাজে যার সংশয়ের ছায়াভ মুকুট ;
সবই তাই অনিশ্চিত—শূন্যবাদ যার পরিণাম

রাসেলের Truth and Falsehood নিবন্ধ থেকে যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছি তা থেকে শ্রীঅরবিন্দের এ-সিদ্ধান্ত ষোলো আনা মঞ্জুর হয় না ?

ষোলো

বুদ্ধি যুক্তি তর্ক দিয়ে ভগবানের নাগাল পাওয়া যায় না একথা আমি যে আদৌ জানতাম না তা নয়। মহাভারতে পড়েছিলাম : "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তাং ন তর্কেন সাধয়েৎ"—অর্থাৎ অচিন্ত্য ভাবরূপ তর্কের চৌহদ্দির বাইরে। কিন্তু বিলেতের আবহাওয়ায় সে-সময়ে হারিয়ে ছিল বুদ্ধি তর্ক যুক্তির কৌলীন্যে গভীর শ্রদ্ধা। বুদ্ধিবাদীরা তখন মনে করতেন না যে, বুদ্ধির উদূখল দিয়ে সত্যের বহরকে মেপে পাওয়া যায় না, যেমন যশোদা পান নি কৃষ্ণকে বাঁধতে গিয়ে—যতই উদূখল জোড়া দেন একটু কম পড়ে যায়। ভগবানের এ-উপমাসমৃদ্ধ কথিকাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম বৈ কি। কিন্তু তবু এসব নিষেধকে মনে হ'ত সেকেলে। দেশকালের প্রভাব কাটানো কঠিন। বুদ্ধি তর্ক যুক্তিরই এখনো সবচেয়ে বেশি আদর। আমরা হ'লাম (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়) 'Sons of an intellectual age" : তাই কেমন করে সত্যি মনে ঠাঁই দেব যে, বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর ?

কেম্ব্রিজের আবহাওয়ায় ঘটিত আরো যেন বিশ্বাসে অবিশ্বাস এসে গেল। তাই সময়ে সময়ে বিমর্ষ হ'য়ে পড়তাম যখন দেখতাম বুদ্ধি বিচারের মার্ফৎ মনে শান্তি ছিটে ফোঁটাও আসে না। তাই তো সাধু সুন্দর সিং খৃষ্টের ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে চিরস্থায়ী শান্তি পেয়েছিলেন শুনে মন আমার ফের বিবাগী হ'য়ে গিয়েছিল। মীরার একটি গান মনে আসছে : "রাম সিমর সব পায়ো রী মৈ, রাম বিসর সব খোঈ"—অর্থাৎ ঠাকুরকে মনে রাখলে সবই পাওয়া যায়—ভুলে থাকলেই সব হারাতে হয়।

শ্রীমা সারদামণিও বলেছিলেন : "শুধু ঠাকুরকে সদাসর্বদা মনে রাখলেই সব হবে, সব পাবে বাবা।"

কিন্তু ঐ-ই মুস্কিল—বিশেষ ক'রে ওদেশের প্রাণচঞ্চল ধ্বনিলোকে ঠাকুরকে সদাসর্বদা মনে রাখা কি চারটিখানি কথা ? ওদেশে সবচেয়ে বেশি প্রকট হ'য়ে ওঠে চিত্তবিক্ষেপের অন্তহীন হাতছানি—বন্ধুবান্ধব, গানবাজনা, খেলাধুলো, অজস্র সংবাদপত্র, থিয়েটার, সিনেমা সর্বোপরি মোহিনীদের মোহ। এ-মোহ কেমন ক'রে মানুষকে ধীরে ধীরে পেয়ে বসে একটা দৃষ্টান্ত দেই।

সুভাষের সঙ্গে থাকলে কোনো কিছুই আমাকে পাকে ফেলতে পারত না। কিন্তু সে তো নানা ছুটিতে যেত আয়র্লণ্ডে বা জর্মনিতে শিনফেন ও ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে সংস্পর্শে আসতে। সেবারও কোথায় গিয়েছিল—আয়র্লণ্ডেই হবে—শিনফেন চক্রের নিমন্ত্রণে। আমাকে বলল লণ্ডনে রাসেল স্কোয়ারে কোনো বোর্ডিং হাউসে থাকতে—কেন না রাসেল স্কোয়ার বৃটিশ ম্যুসিয়মের খুব কাছে। বলল : "ক'ষে জর্মন পড়ো দিলীপ। ভাষায় তোমার একটা সহজপটুতা আছে, বৃটিশ মুসিয়মও একাগ্রপাঠের অনুকূল" ··ইত্যাদি।

বৃটিশ মুসিয়মে গিয়ে আমি মাঝে মাঝে সানন্দেই পড়তাম কিন্তু জর্মন ব্যাকরণ নয়—পড়তাম ডস্টয়েভস্কি, টুর্গেনিভ, টলস্টয়, রোলাঁ, মপাসাঁ (ফরাসীতে)··· ইত্যাদি যতদূর মনে পড়ে এই সময়েই রোলাঁর নানা আদর্শবাদী নাটকও পড়েছিলাম এবং টলস্টয়ের নানা চমৎকার ধর্মীয় গল্প।

কিন্তু বৃটিশ ম্যুসিয়মে কতক্ষণ মানস সংস্কৃতির উন্নয়নের সাধনা করা যায়—বিশেষ লণ্ডনে যেখানে আমি নানা সংসদে গান গেয়ে "পপুলার" হয়ে উঠেছিলাম ? তাছাড়া হ্যাম্পস্টেড হীথ, কিউ গার্ডেন, টেমসে জলবিহার ··আরও কত কী মনোরম পরিবেশে আনন্দ পেতাম—কত নতুন বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গে আলাপ হ'ত—বলার জো কি বৈরাগ্যের সুরে : "আমার সাধ না মিটিল আশা না পূরিল, সকলই ফুরায়ে যায় মা।"

এবার হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে আমার গৃহকর্ত্রীর এক "তন্বী গৌরী শিখরদশনা পক্‌বিম্বাধরোষ্ঠী" আমার দিকে নেকনজর দিচ্ছেন। আমি রাসেল স্কোয়ারের বৈঠকখানায় মাঝে মাঝে পিয়ানোয় গাইতাম তো—হঠাৎ এ সুন্দরী তন্বী আমার গানের অনুরাগিণী হ'য়ে উঠলেন। ক্রমশঃ তিনি আমার সঙ্গিনী হ'য়ে যেতেন এখানে ওখানে আমার গান শুনতে। অতি সুভদ্রা—আচরণে পান থেকে চুনটি পর্যন্ত খসে না—তাঁর সঙ্গও স্বাদুও মনে হ'ত বৈকি।

কিন্তু ক্রমশঃ আবিষ্কার করলাম যে, শুধু তিনিই আমার দিকে ঝুঁকছেন না, আমার মনেও বেশ একটা আবেশ জেগে উঠছে শনৈঃ শনৈঃ।

সেখানে ছিলেন আমাদের কেম্ব্রিজের একটি প্রবীণ মুসলমান ছাত্র। তিনি

আমার হাত থেকে তন্বী গৌরীকে কেড়ে নিয়ে যেতেন থিয়েটারে সিনেমায় অপেরায়। আমি তাঁকে নিয়ে যেতাম শুধু গানের আসরে।

দিন সাত আট পরে আমার মন বেশ একটু জ্বলে উঠতে শুরু করল যখন আমার মুসলমান বন্ধুটি তাঁকে হাতিয়ে নিয়ে উধাও হ'ত।

আমাদের মধ্যে ধরা-ছোঁওয়া যায় এমন দুষ্ট কিছু ঘটে নি। কিন্তু তন্বীর হাসি ঠাট্টা খোঁচা কটাক্ষ সবই আমাকে উস্কে দিত। ফলে আমিও তাঁকে থিয়েটার ও অপেরায় নিয়ে যাওয়া সুরু করলাম। সুভাষের ধমক উপেক্ষা ক'রে যে "আগুন নিয়ে খেলা কোরো না।" রাসেল স্কোয়ারে আরো অতিথিরা (paying guest) বলাবলি করত—আমার কানে আসত। কিন্তু আমি গ্রাহ্যও করলাম না।

এমন সময় একদিন তন্বী এসে বললেন আমাকে যে মুসলমান ভদ্রলোকটি তাঁকে বিবাহ করতে চান। আমি চম্‌কে উঠলাম কারণ আমি শুনেছিলাম তিনি বিবাহিত। কিন্তু তন্বীকে কিছু বললাম না, মনে জপতে লাগলাম সুভাষ যেন এসে পড়ে—ঈর্ষা আমার মনকে কালো ক'রে দিয়েছে—ভাবের ঘরে চুরি করি কী ক'রে? প্রাণপণে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলাম।

ঠাকুর প্রার্থনা শোনেন—এ আমি বহুবার দেখেছি। ঠিক এই সময়েই কি সুভাষ ফিরে এল লণ্ডনে! আমাকে টেলিফোন করতেই আমি ছুটে গিয়ে তাকে বললাম সব কথা। তার উজ্জ্বল মুখ মেঘলা হ'য়ে এল, সে বলল: "এ-পরিবেশে তোমার থাকা চলবে না। চলো আমার সঙ্গে কেম্ব্রিজে ফিরে। বলি নি তোমাকে—আগুন নিয়ে খেলা নয়?"

আমার মন একটু ঘা খেলেও রাজী হলাম তৎক্ষণাৎ। সুভাষ ডাকছে, রাজী না হ'য়ে উপায় আছে?

কিন্তু কেম্ব্রিজে ফিরতে হ'ল না। গোল্‌ডার্স গ্রীণে আমার পিতৃবন্ধু লোকেন কাকার বিধবা মেম স্ত্রী মেবেল পালিত ছিলেন স্বামীর রম্য নিলয়ে। তিনি আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি বললাম তাঁকে সুভাষের কথা। তিনি সাগ্রহে বললেন: "সুভাষ লণ্ডনে? বেশ হয়েছে—সে থাকবে মিস্টার ভাট্ট-এর অতিথি, তুমি আমার।"

শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত যুদ্ধের সময় জর্মনিতে পাঁচবৎসর কাটিয়ে ১৯১৯ সালে ইংলণ্ডে ফিরে আন্টির রম্য নিলয়ের নিচের তলায় ছিলেন সপরিবারে—স্ত্রী একটি মেয়ে (বয়স ছয় বৎসর) ও একটি ছেলে (বয়স চার বৎসর)। সুভাষ শরৎবাবুকে গভীর শ্রদ্ধা করত আরো এই জন্যে যে, তাঁর কাছ থেকে সে জর্মনদের নানা গুণের পরিচয় পেয়ে বিশেষ লাভ করেছিল। আমি তাঁকে আন্টির ব্যবস্থার খবর জানাতেই তাঁর সে কী উৎসাহ!—"সুভাষ আমার অতিথি হবে, তার ওপর রসিক গায়ক দিলীপ উপর তলায়?

গাও দিলীপ, শুধু গেয়ে চলো তোমার পিতৃদেবের গান: 'আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে'।" এ-গানটি আমি সে যুগে বিলেতে প্রায় গাইতাম।

মন থেকে হ'টে গেল তন্বী গৌরী-র স্মৃতি। রশির টানের সঙ্গে সুতোর টান পেরে উঠবে কেমন ক'রে? কিন্তু মুস্কিল বাধল প্রথমটায় সুভাষকে নিয়ে। সে বলল: "শরৎবাবুর চাকরাণী নেই তাঁর স্ত্রী একাই সংসার চালান দুটি সন্তানকে নিয়ে ··" ইত্যাদি। কিন্তু আণ্টিও নাছোড়বান্দা, বললেন: আমরা থাকব একান্নবর্তী পরিবারের মতন—উপর নিচে একাকার—খাওয়া দাওয়া হবে কখনো নিচের তলায় দত্তগৃহিণীর টেবিলে, কখনো উপর তলায়—আণ্টির তদারকে। তার উপর আমিও ধরলাম: "খুব ক'ষে গান শোনাব সকাল সন্ধ্যা।" সুভাষ হেসে বলল: "ব্যস, আমার হার, তোমাদের জিৎ।"

সত্যিই সে আনন্দ ফলিয়ে বলবার ভাষা পাই না। সুভাষ প্রথম প্রথম একটু গম্ভীর হ'য়ে থাকত। কিন্তু ক্রমশঃ আণ্টির গল্পে, আমার গানে—সর্বোপরি শরৎবাবুর রসিকতায় তার কুণ্ঠা কেটে গেল। তখন কেবল অনাবিল আনন্দ আর আনন্দ। কেবল দুঃখ এই যে, সে পরমানন্দের মাত্র তিন চার সপ্তাহের মেয়াদ—শেলির খেদ মনে পড়ত: "How rarely comest thou, O spirit of delight!"

বিলেতে এসে এই প্রথম (এক বৎসর পরে) সুভাষ থিয়েটার দেখল। একদিন আমি তাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেলাম (আণ্টি ও দত্ত দম্পতীরও টিকিট কিনে) গল্সবর্দির SKIN GAME দেখতে। সুভাষের খুব ভালো লেগেছিল নাটকটি। আর একদিন আণ্টি আমাদের সকলের টিকিট কিনে (শরৎবাবুর দুই ছেলেমেয়েরও) নিয়ে গেলেন সবাইকে বিখ্যাত প্রহসন Charlie's Aunt দেখতে। আজো মনে পড়ে প্রহসনটি দেখে সুভাষের সে কী প্রাণখোলা হাসি! আমি অন্যত্র লিখেছি—সুভাষের মুখ সচরাচর দেখাত "মেঘগম্ভীর"—বলতেন শরৎবাবু সহাস্যে। কিন্তু শরৎবাবুর নানা রসিকতায় সে যখন হেসে গড়িয়ে পড়ত—তখন তাকে মনে হ'ত যেন ঠিক একটি শিশু! হাসলে কী সে সুন্দর দেখাত তাকে—আজও মনে দুঃখ জাগে যে অমন হাসি আর দেখতে পাব না! বিশেষ ক'রেই CHARLY'S AUNT-এ ছিল সুভাষের হাসি পুরুষের মেয়ে সাজা দেখে অবিস্মরণীয়। তার হাসির ছোঁয়াচে আমাদেরও হাসি হ'যে উঠত আরো বাঁধভাঙা।

কিন্তু শুধু হাসিই নয়। সবচেয়ে দীপ্যমান্ ছিল তার ব্যক্তিরূপ—radiant personality; আমাদের যুগপুরুষে (generation) এমন ব্যক্তিরূপ আমি দেখি নি। তার সহজাত পবিত্রতা ও ঐকান্তিকতার কবচকুণ্ডল তাকে বিবস্বান্ ক'রে তুলত। এ শুধু আমার মতন সুভাষভক্তের কথা নয়, লণ্ডনে নানা সাহেব মেমও তাকে দেখে বলত: "There is a light on his face!"

আমাদের বুকের মধ্যে যেন একটা উল্লাসের জ্যোতি জেগে উঠত চোখেও যার আভা ফুটে বেরুত। তাই সুভাষ যখন খাওয়ার পরে আমার ও দত্তজায়ার সঙ্গে বাসন কোশন ধুতে প্রস্তুত—আমরা বলতাম "না না তুমি বাসন ধোবে এ কি একটা কথা হ'ল।" শরৎবাবু হেসে বলতেন: "না সুভাষ, এরা সবাই চায় তুমি ঠুঁটো জগন্নাথটি হ'য়ে শুধু আলো ছড়াও, আর আমরা গদ্‌গদ হ'য়ে উঠি।" আন্টিও হাসতেন মন খুলে, তবু বলতেন: "আমার মেড-কে পাঠিয়ে দিচ্ছি সুভাষ।" সুভাষ বলত: "আপনার সবাই মিলে আমাকে এমন বিব্রত করলে আমাকে পাত্তাড়ি গুটোতে হবে কিন্তু।" তখন সবাই রাজী হ'তে বাধ্য হ'ত। এমনি ছিল তার স্বভাব। যেখানে সে থাকত সেখানেই তার চারদিকে একটা সহজ গাম্ভীর্যের সঙ্গে তৃপ্তি ও দীপ্তির ভাব ফুটে উঠত—যে-আবহে নির্মল রসিকতার স্থান থাকলেও প্রগল্‌ভতাকে দূর থেকে দণ্ডবৎ ক'রেই বিদায় নিতে হ'ত। সকলের সঙ্গে দহরম মহরম করতে সে পারত না আমার বা সুরাবর্দির মতন, কিন্তু তাব'লে তার প্রীতির পরিধি সঙ্কীর্ণ ছিল না। তবে তাব প্রীতি পেতে হ'লে একটু উচ্চতর স্তরে উঠতে হ'ত। সুভাষের উপস্থিতিতে আমরা অনেকেই অনুভব করতাম এই উচ্চতর স্তরের টান—কিন্তু ডিকটেটরের টান নয়, মহৎ বন্ধুর, পথিকৃৎ-এর টান—যে টান আমাদের নিচু টান তথা পিছু টান থেকে মুক্ত করতে চাইত। তাই বেশ মনে আছে অনেকেই সুভাষের সামনে একটা বাধামতন অনুভব করত যার সাহেবি নাম constraint—যে-বাধা অপসৃত হ'ত সে প্রস্থান করলেই, তখন আমরা নিম্নতর স্তরে নেমে যেন বলতাম "আঃ!" মন: উঁচু স্বরে বাঁধা তত কঠিন নয় যত কঠিন সে-সুরকে বজায় রাখা। তার এই সহজাত শক্তি শিখরচারী হয়েছিল চব্বিশ পঁচিশ বৎসর পরে, যখন সে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী ("ঝাঁসির রাণী" চমূর নিয়ন্ত্রী) মান্দ্রাজে আমায় বলেছিলেন তার এই দীপ্ত ব্যক্তিরূপের কথা যার সামনে জর্মনি ও জাপানের সেনানীরাও মাথা নোয়াত। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম সুভাষের জর্মনভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দেওয়ার কথা।

কিন্তু লণ্ডনেই তার এ-মহিমশক্তির প্রথম স্ফুরণ হয়েছিল ব্যাপকভাবে। ফলে তার দীপ্তির পরিমণ্ডলে যে কী আনন্দে আমাদের দিন কাটত বর্ণনা করবার ভাষা খুঁজে পাই না—কথাবার্তা তর্কাতর্কি হাসি গল্পের মাঝেও সুভাষ আসীন থাকত তার তুঙ্গ স্বরূপের প্রভালোকে—"স্বে মহিম্নি"—জ্বলত যেন অন্ধকারে স্বয়ংপ্রভ মণির ম'ত ঝিকমিক ঝিকমিক ক'রে।

নানা ভারতীয় ছাত্রই আসত সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে—কেম্ব্রিজের অক্সফোর্ডের, গ্লাসগোর, ম্যাঞ্চেস্টারের...। একদা শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত এসে হাজির। সুভাষকে বললেন তিনি: "দিলীপ চ'লে আসার পরে রাসেল স্কোয়ারে সেই

বোর্ডিংটিতে যাই। গিয়ে শুনি—সেই মুসলমান প্রবীণটি গায়েব হয়েছেন গৃহকর্ত্রীর সুন্দরী মেয়েটিকে নিয়ে। মা-র সে কী কান্না……"

শুনবামাত্র বুকে আমার উচ্ছ্বাসের বান ডেকে গেল, মনে পড়ল স্বামী ব্রহ্মানন্দ কী বলেছিলেন আমার মাতামহকে—যে, তিনি সমাধিতে দেখেছেন "ঠাকুরের কৃপা দিলীপকে ঘিরে আছে। ভয় নেই প্রতাপবাবু ও ছেলে মেম বিয়ে করবে না।" সেদিন রাতে আমি কথামৃত খুলে ঠাকুরের ছবির সামনে ধ্যানে বসলাম—মনে বল, চোখে জল, প্রাণে ভক্তি। অন্তরে কৃতজ্ঞতার বান ডেকে গেল। ঠাকুরকে প্রণাম করলাম বারবার যে তাঁর কৃপা আমাকে এ-সাংঘাতিক তন্বীটির ছিপ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। সুভাষের স্নেহের প্রভা ও পবিত্রতার রক্ষাকবচ ভাগবতী কৃপা ছাড়া আর কী!

(প্রথম উল্লাস সমাপ্ত)

সতেরো

অতীতে যা ঘটেছে তার ছাপ একটা থাকেই থাকে। মনস্তত্ত্ববিদেরাও এ-বিষয়ে একমত যে, মানুষ কিছুই ভোলে না—চেতন মন যাকে ধরতে পারে না পুঁজি হয় অবচেতনে। কিন্তু কালের স্থূলহস্তাবলেপ অনেক দাগ মুছে দেয়—যার ফলে ছাপটা থাকলেও নানা রেখা ঝাপসা হ'য়ে আসেই আসে। আসুক না। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন—সেই সব সুন্দর স্মৃতিই আমাদের বিকশমান ব্যক্তিরূপকে সামনের দিকে ঠেলে দেয় যাদের অবদান আমাদেব জীবনকে সমৃদ্ধ করে, শ্রীমন্ত করে। আমি এই জাতের স্মৃতিরই বেসাতি করতে চাই। দিনের পর দিন তারা শনৈঃ শনৈঃ আবছা হয়ে আসে? বেশ তো। রবীন্দ্রনাথ আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—চলা মানেই ভোলা—চলি ব'লেই ভুলি আর ভুলি ব'লেই চলি। আমার স্মৃতিমন্দিরে সেই সব ঘটনার (বা অঘটনের) নথিপত্রই মজুদ থাকুক যারা আমাকে অতীতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে এগিয়ে চলার প্রেরণা দিয়েছে। বাউল বলেন: এই সব নথিপত্র দলিল দস্তাবেজ কালাতিপাতে ম'রেও মরে না, ঝ'রেও ঝরে না।

বাউল আমাদের মন টানে আর একটি কারণে: আমাদের জীবনকে সে রওনা করিয়ে দিতে চায় "গ্রামছাডা ঐ রাঙামাটিব পথে"—সেই সব আসক্তি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যারা আমাদেব মনকে বাঁধে ভ্রান্তির নাগপাশে। তাই মহাকবি গেটে বলতেন: "You must do without—you must do without." বিখ্যাত কবি এ-ই-ও শেষ জীবনে এই কথাই বলতেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গানে অস্থায়ীর মতন: "বোঝা হালকা করো, বোঝা হালকা করো।" শেষ জীবনে তিনি গৃহ স্বজন জন্মভূমিও ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলেন কবিতা "বৈরাগীর একতারা" হাতে। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় নিয়তি আমাকে প্রতিপদেই এই পরম পরিণতির দিকে ঠেলে এসেছেন—ছাড়িয়ে নিয়েছেন সব কিছু থেকে যা আমি আদৌ ছাড়তে চাই নি। তাই মধ্য যৌবন থেকে আমার জীবন কেটেছে প্রবাসেই বলব। বাংলা দেশের জন্যে আজো প্রাণ কাঁদে। মুজিবর রহমানের "বাংলাদেশ" ধুয়া সংবাদ পত্রে পড়বামাত্র বুকের তারে বেজে ওঠে "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি।" কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে? সেই দেশ থেকেই আমাকে দূরে দূরে কাটাতে হ'ল। যোগসূত্র বজায় রাখতে চেয়ে বছর বছর ছুটে যাই, কিন্তু নিয়তি যে চান না আমি বাংলাদেশের গণ্ডীতে বাঁধা পড়ি। তাই ফের ফিরে আসি প্রবাসী জীবনে—পণ্ডিচেরিতে, পুনাতে।

আজ মনে হয় নিয়তি অকারণ ঘটান নি এ-অঘটন। বাংলা দেশকে বেশি কাছে থেকে দেখলে হয়ত আমি অশান্ত হ'য়ে উঠতাম, হয়ত ভুলে যেতাম (কে বলতে পারে) যে জননী জন্মভূমির চেয়েও গরীয়সী জগন্মাতা—the Mother of mothers, বন্ধুর চেয়েও প্রিয় গুরু, বান্ধবীর চেয়েও আদরণীয়া শিষ্যা যে নিজেকে গ'ড়ে তুলতে চায় গুরুর আদর্শে। কিন্তু এ-উদাসী সুরে আলাপ বেশিক্ষণ করলে স্মৃতি কথার পর্বে পৌঁছতে শুধু যে দেরি হ'য়ে যাবে তাই নয়—পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি হবারও সম্ভাবনা। হ'লে তাঁদের দোষ দেওয়াও চলবে না, কারণ নেতি নেতি-ই ঠাকুরের শেষ বাণী নয়, ইতি ইতিই হ'ল প্রজ্ঞার চরম এজাহার :

নয় এ-জীবন মায়াকানন, আনন্দ নয় ভ্রান্তি
তুমি আছ, তাই ব্যাথায়ো বিছায় গভীর শান্তি
অশ্রুমেঘও তোমায় চিনি'
হয় ঝলকে সৌদামিনী,
তোমার উষায় নিশার বুকেই জাগে সোনার কান্তি।
বাধাই জয়ের দেয় ভরসা, দুঃখে নামে শান্তি।

এই আনন্দবাণীকে (উপনিষদের ভাষায় "আনন্দী" হওয়ার প্রতিশ্রুতিকেই শ্রীঅরবিন্দ জীবনবিধাতার "Everlasting Yes"* বলে বর্ণনা করতেন। বৈরাগ্য যখন আমাদের আসক্তির কবল থেকে টেনে তোলে তখন সে হয় গীতার ভাষায় "সমুদ্ধর্তা"। কোথা থেকে? না "মৃত্যু সংসার সাগর" থেকে। কামনা বাসনা লোভ—এরাই তো আমাদের ঘুরিয়ে মারে চোখ বাঁধা বলদের ম'ত। যেম্‌নি পাই নিষ্কামনার আলো মন গান গেয়ে, ওঠে :

"অনিন্দ্যসুন্দর ! অন্তর চায় তোমাকে কান্ত !"
এই গান যার গায় প্রাণ—হয় তোমার পথের পান্থ।
দাও মন্ত্র এই সাধনার—
ভক্তি সরল আরাধনার,
"আমার আমার" ক'রেই ঘুরে মরে পথ ভ্রান্ত ;
"তোমার তোমার" গেয়ে হব তোমার পথের পান্থ !

---

*Only the everlasting No has neared.
But where is the lover's everlasting Yes ?
The smile that saves, the golden peak of things ? (Savitri III ; 2)
চিরন্তন নাস্তিবাদ ঘনায় অকালে চারিদিকে।
শুধু কোথা প্রেমিকের সর্বাস্তিবাদের অঙ্গীকার ?...
তারিণী-করুণাহাসি, স্বর্ণোজ্জ্বল শিখরবিহার ?

আঠারো

আজ যখন সুভাষের কথা মনে পড়ে তখন মন সায় দেয় জোবালো সুরে: "আনন্দ নয় ভ্রান্তি।"

আমার জীবনে নির্মল আনন্দের শিখরবাণী প্রথম ঝলকে উঠেছিল সুভাষের স্নেহে তার ব্যক্তিরূপের মাধ্যমে। দিনে দিনে কত কিছুই তো ঝাপসা হ'যে এসেছে স্মৃতিলোকে, কিন্তু আজও যেন প্রত্যক্ষের মতন অনুভব করি তার দৃষ্টি, হাসি, সর্বোপবি স্নেহসম্ভাষণ যাব পরশমণির স্পর্শে তার তিরস্কার ও শাসনও হয়ে উঠত আমার কাছে আদরণীয়। কালিয়দমনে নাগপত্নীরা কৃষ্ণকে বলেছিল: "ক্রোধোহি তে অনুগ্রহ এব সম্মতঃ—প্রভু তোমাব ক্রোধও যে তোমার প্রসাদ।" সুভাষের শাসনকে আমার সত্যিই মনে হ'ত প্রসাদ। সে কাছে এসে বসলে সমস্ত মন সজাগ হ'যে উঠত। এককথায ভালোবাসা যে মানুষের সমস্ত চিত্তকে কী ভাবে জাগিযে তুলতে পারে, কেমন করে প্রেমাস্পদের তুচ্ছতম ছোঁওয়াও আমাদের গ্রহিষ্ণুতাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে—এককথায়, ঘরোয়া চেতনার একঘেয়েমি কাটিযে মানুষ কোন্ পথ দিযে নিমেষে পুলকশিহরণের রংমহলে পৌঁছতে পারে—আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম এক, তাকে ভালোবেসে, দুই তার ভালোবাসা পেয়ে। না, ভুল হ'ল: তাব ভালোবাসা আমাকে উল্লসিত করলেও আমি সত্যিই সে-উল্লাসকে গৌণ মনে করতাম—এ একটুও বাড়িয়ে বলা নয়। মুখ্য ছিল চিরদিনই তাকে এমন ভালোবাসতে পারা যার বরে বুকে জাগে বল, প্রাণে শিহরণ, চোখে আলো। তাই ডাক ছেড়ে বলতে ইচ্ছা হয় যে, এমন প্রেম জগতে সত্যিই আছে যার ছোঁওয়ায় চোখের ঠুলি খ'সে পড়ে, মনে হয় যা পেয়েছি তা আমার প্রাপ্যের চেযে অনেক বেশি। পাছে আমার দরদী ক্রিটিকরা বাঁকা হেসে বলেন: "জানি জানি, উচ্ছ্বাসী হিরো-ওর্যশিপের কথা—to be taken with a grain of salt," তাই একটি ঘটনার কথা বলি—যদিও মনে হয় এ কথা বলেছি কোথায় যেন। তবু ঘটনাটি এতই স্মরণীয় যে পুনরুক্তি হলে ভাগবত অশুদ্ধ হবে না—আরো এই জন্যে যে, এটির উল্লেখ করছি এক নব পটভূমিকায়—context-এ।

ঘটনাটি এই: আমি সুভাষকে বরাবরই বলতাম: "সুভাষ, তুমি জাতি-সংগঠকের—nation-builder—আধার হ'য়ে এসেছ, তুমি বাজনীতি ছাড়ো—ও তোমার স্বধর্ম নয়। তুমি তোমার পবিত্র চরিত্র ও তেজস্বী প্রতিভা নিয়ে জাতিকে গড়ে তোলো—আমাদের মনপ্রাণকে তামসিকতা থেকে মুক্ত ক'রে।"

সুভাষ বলত: "তুমি বড় মাটি ছাড়া, দিলীপ। জাতি-সংগঠন করবে কী ক'রে যদি পদে পদে বিদেশী দস্যুরা তোমার সর্বস্ব হরণ করে? আমাদের সব আগে হ'তে হবে স্বাধীন—জাতি-সংগঠন করতে পারে শুধু স্বাধীন মানুষ।"

আমি একথায় কোনোদিনই পুরোপুরি সায় দিতে পারি নি। কারণ রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাজনেরা পরাধীন অবস্থায়ও জাতিকে গড়ে তুলেছেন কমবেশি—যদিও আমি মানি স্বাধীন পরিবেশে এঁদের সংগঠনশক্তি চতুর্গুণ শক্তিশালী হ'ত। কিন্তু তবু যখন রাজনীতির আখড়ায় মানুষের ঈর্ষা দ্বেষ স্বার্থের ডামাডোল আমাদের কানকে বধির করত তখন মন পালাই পালাই করত।

এহেন আমাকে সুভাষ একদিন বলল: "দেশবন্ধু স্বরাজপার্টি গঠন করছেন। তিনি চান নদীয়া থেকে তুমি দাঁড়াও ইলেকশনে নদীয়ার মহারাজ ক্ষৌনীশচন্দ্রের বিরুদ্ধে।"

শুনে আমি দ'মে গেলাম, কিন্তু গো ছাড়লাম না। বললাম: "সুভাষ, মাপ করো ভাই, এ আমি পারব না—না, দেশবন্ধু বললেও নয়। তবে তুমি যদি বলো, আমি রাজী হব অনিচ্ছায়। কারণ তোমার নির্দেশকে আমি না করতে পারি না তুমি জানো।"

সুভাষ বলল: "না, তোমার যখন এত অনিচ্ছা তখন আমি তোমাকে বলব না ইলেকশনে দাঁড়াতে—আরো এই জন্যে যে, আমি মনে করি তুমি বাইরে থেকেও আমাদের সহায় হ'তে পারবে গান গেয়ে—নানা আসরে স্বরাজ্য পার্টির জন্যে চাঁদা তুলে।

আমি বললাম: "এতে আমি রাজী সুভাষ—একশোবার। গান গাইব দেশের জন্যে এ তো আমার প্রিভিলেজ—যদিও ভাই" বলেছিলাম আমি করুণ হেসে, "জেলে যেতে আমার একটুও ইচ্ছা করে না। তবে তুমি যখন বলছ তখন স্বদেশী গান গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে দিতে চেষ্টা করব।"

হয়ত এ সংলাপের কথা আগে লিখেছি, যদিও—কোথায় লিখেছি খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে বোধহয় আগে যা লিখেছি তার সঙ্গে আজকের অনুলিপির বেশি গরমিল হবে না। অতীতের অনেক কিছু নানা সময়ে নানা আলোয় ফুটে ওঠে—তাই গরমিল কিছু হয়ত থাকতেও পারে। কিন্তু আমার মূল বক্তব্য এই যে, সুভাষের নির্দেশ আমার মন অনিচ্ছায়ও বরণ করত—খানিকটা "তোমার ইচ্ছা হোক পূর্ণ" ছন্দে। একেই আমি বলছি প্রেমের একটি শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। আমি যা চাই তা নয়—তুমি যা চাও আমি তাই করব তোমার মনের মতন হ'তে—এ-সাধনায় আমি সিদ্ধিলাভ যদি নাও করি তবু সেই সাধনাই হবে আমার পরম পুরস্কার। প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেম—তার কি দোসর আছে?

উনিশ

পরের কথা আগে বলা হ'ল। হোক। স্মৃতিচারণের ঐ তো মস্ত সুবিধে: খুশখেয়ালে চলা তার স্বধর্ম। কেবল একটা কথা এখানো বলার মতন ক'রে বলা হয় নি—যদিও যৌবনের প্রথম প্রেম এই বর্ণনার মধ্যে রয়েছে আমার বলবার বক্তব্যটি আত্মগোপন ক'রে।

ভাষ্য এই যে যৌবনের প্রথম প্রেমের মধ্যে এমন একটা গরিমা আছে যার তুলনা সত্যিই নেই। কেন নেই বলি খুলে।

মানুষ পদে পদে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার ইন্দ্রিয় ও মন দিয়ে। বুদ্ধি দিয়ে পরে সে অভিজ্ঞতাকে পরিপাক করার সঙ্গে সঙ্গে এ-অভিজ্ঞতা তার বিকাশের সহায় হয়। যৌবন বিকাশ-উন্মুখ, কিন্তু বিকশিত নয়। তাই তার অনেক সময়েই ঠিকে ভুল হয়। হবেই—কারণ এই ভ্রান্তির মধ্যে দিয়েই আসে অভ্রান্তির দিশা, যেমন বেদনার মধ্যে দিয়েই আসে নবচেতনার আলো। কিন্তু যৌবনের মধ্যে এই নাবালকত্ব Immaturity—থাকলেও (যার ফলে সে বার বার ছায়াকে কায়া ব'লে বরণ করে) তার মধ্যে একটি আশ্চর্য শক্তির উন্মেষ হয়—দিতে চাওয়া। পরিণত বয়সে বন্ধুলাভের সঙ্গে যখন যৌবনের বন্ধুপ্রীতির তুলনা করি তখন দেখি—যৌবন স্বভাবে দিলদরিয়া, যেখানে প্রবীণ হ'য়ে ওঠে সাবধানী—ঘা খেয়ে। শরৎচন্দ্র একটি কথা আমাকে বলতেন প্রায়ই আমার মনে গেঁথে গেছে: "দিলীপ, বিশ্বাসঘাতকতা শুধু কৃতঘ্নকেই ছোটো করে না, যাকে বঞ্চনা করে তাকেও একটু না একটু খাটো ক'রে রেখে যায়।"

স্বভাবে যে উদার দানশীল মহৎ সে অবশ্যই বার বার ঘা খেলেও উদারই থাকে মোটের উপর। কিন্তু তবু তার মনের মধ্যে একটা পিছুহটার ভাব থেকেই যায়। ফলে আগে যে-দান করতে সে এগিয়ে আসত অকুণ্ঠে, পরে সে-দান করে ঈষৎ সকুণ্ঠে। যৌবনে—যখন স্বপ্নভঙ্গ disillusionment—হয় নি তখন তরুণ মন চলে বেপরোয়া চালে—কারণ এইই যে তার স্বভাব তথা স্বধর্ম। স্বভাবের পরেও আমার ভাগ্যবশে আমি মহৎ বন্ধু পেয়েছিলাম স্বদেশে তথা বিদেশে। কিন্তু সে বন্ধুত্বের মণিমহলে শুধু মণিই জমে নি—সাবধানী মন হাত খাটো করেছিল বৈকি—সব সময়ে নয়, কিন্তু অনেক সময়েই। কিন্তু যৌবন বদান্য ও অনভিজ্ঞ ব'লে আরো বেপরোয়া তাই দেবার সময় হাত খাটো করবার কথা তার মনেও আসে না। তাই সে রবীন্দ্রনাথের সুরে গায় তরুণকে সামনের দিকে ঠেলে:

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।

বিশেষ করেই সুভাষের সম্পর্কে কবিগুরুর এ-বাণীটির আমি মর্মজ্ঞ হয়েছিলাম, তাই উপলব্ধি করেছিলাম—একবার না বারবার—যে, খৃষ্টদেব মিথ্যা বলেন নি যখন তিনি গেয়েছিলেন : "It is more blessed to give than to receive".

ভাগ্যেরবশে যা পেয়েছ তুমি দান
তারো চেয়ে সৌভাগ্য তাহার দান করে যার প্রাণ।

সুভাষের সঙ্গে মধুর প্রেমের মাধ্যমে আমি সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করি ঈশা-র এ-মহাবাক্যের অপরূপ দীপ্তিকে।

ক্ষোভ

কন্টিনেন্টের পর্ব স্থরু করবার আগে মনে প'ড়ে গেল একটি ঘটনা যাকে বলা যেতে পারে শরৎচন্দ্রের প্রবীণোক্তির একটি চমৎকার ভাষ্য।

বলছিলাম, মানুষ যখন বিশ্বাস ক'রে ঘা খায় তখন তার মন কিছুটা পিছিয়ে আসে, ফলে আগে সে যে-দান করতে এগিয়ে আসত সহজ আনন্দে পরে সে-দান করবার আগে সাত পাঁচ ভাবে যার বাদী স্থর—ফের ঠকব না তো?

আমার একটি প্রিয় মান্দ্রাজী বন্ধু বিলেতে আমার কাছে মাঝে মাঝেই টাকা ধার করতেন—এক পাউণ্ড দু পাউণ্ড তিন পাউণ্ড পর্যন্ত···করতে করতে একুনে পনেরো ষোলো পাউণ্ড দাঁড়িয়ে গেল। বন্ধু মানুষ—ধার চাইলে না করাও যায় না, বিশেষ যখন হাতে টাকা রয়েছে। কিন্তু তবু দেখতাম সে থিয়েটার ভ্রমণ হৈচৈ সব তাতেই যথেচ্ছ অর্থব্যয় করছে তখন মন একটু ক্ষুণ্ণ হ'তই। সংস্কৃতে কোথায় পড়েছিলাম কৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে: "দরিদ্রান্ ভব কৌন্তেয়! মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্। কিন্তু এ-বন্ধুটি তো দরিদ্র নন, তার উপর তীক্ষ্ণধী। কেন টাকা শোধ দেব দেব দেবই ব'লে তিনি সত্য ক'রেও কথা রাখতে চান না? অথচ তাগাদা করতে ভালো লাগে না—বিশেষ করে সতীর্থকে।

কিন্তু অতঃপর ঘটল এক অভাবনীয় কাণ্ড। বন্ধুটি আমাকে একদা বললেন: "দিলীপ, চলো হ্যারডে আমি একটি ওভারকোট কিনব—তুমি দেখবে মাপসৈ হয়েছে কি না।"

গেলাম তাঁর সঙ্গে। অবাক্! আঠারো গিনির ওভারকোট!! স্থভাষ বা আমি কেউই ১২।১৩ গিনির বেশি খরচ করি নি ওভারকোটের জন্যে। এ যে একেবারে swell ওভারকোট রে বাবা! অথচ আমার কাছে যা ধার করেছেন তার অর্ধেক বা সিকিও শোধ করতে চান না।

তারপর হ'ল আর এক কাণ্ড! একদিন বন্ধুর সঙ্গে আমি গিয়েছি (লণ্ডনে) শেক্সপীয়র হাটে। আমার গাইবার কথা। বন্ধুটি আমার গান সত্যিই ভালোবাসতেন।

গানের পর ক্লোকরুমে তিনি ওভারকোট আর খুঁজে পেলেন না। চকচকে, দামী নতুন ওভারকোট—কে হাতিয়ে নিয়ে উধাও হয়েছে। ফলে আরো মুস্কিল—বন্ধুকে তাগাদা দিই কেমন ক'রে? কেবল মনে আছে মনে অনুদার ভাব এসেছিল: "বেশ হয়েছে খুব হয়েছে!" বলল ক্ষুব্ধ মন। পরে এজন্যে অনুতাপ

হ'ল—কিন্তু সেটা দ্বিতীয় 'রিয়াকশন'—প্রথম 'রিয়াকশন' হ'ল নিছক উল্লাসই বটে। সুতরাং দেখলাম স্পষ্ট—মন ক্ষোভবশে খানিকটা ছোট হ'য়ে গেছে বৈকি।

তারপর সাত বৎসর কেটে গেছে। দ্বিতীয়বার য়ুরোপযাত্রা ১৯২৭ সালে। প্রথমে নীস, তারপর প্যারিস তারপর লণ্ডন হ'য়ে বার্মিংহাম। সেখানে আমার বন্ধু সার্জন ডাক্তার পার্ডি আমার হার্নিয়ার অপারেশন করবেন—কম টাকা লাগবে তাই বার্মিংহাম প্রয়াণ। পার্ডির ওখানেই উঠলাম। বিকেলে সেখানকার এক মনোরম নার্সিং হোমে তিনি আমাকে পেশ করলেন। তাঁর ফী চল্লিশ পাউণ্ড, তবে আমার কাছ থেকে নেবেন মাত্র পঁচিশ। আমি বালিশের নীচে ছ-সাতটি পাঁচ পাউণ্ডের নোট মজুদ রাখলাম—তিনি চাইলেই দেব।

সন্ধ্যায় কি একটা বই নিয়ে পড়ছি এমন সময়ে এক ভারতীয় যুবকের প্রবেশ—কোন্ প্রদেশের মনে নেই। সম্পূর্ণ অপরিচিত।

যুবকটি দুদিন আগে ডাক্তার পার্ডির ওখানে আমার গান শুনে মুগ্ধ হ'য়ে অনেক আগুপাছু ক'রে খোঁজ নিয়ে এসেছেন নার্সিং হোম-এ।

বললেন: "আমার শেষ ডাক্তারি পরীক্ষা সামনের সপ্তাহে। তার আগে আমাকে একটা মোটা ফী জমা দিতে হবে পঁচিশ পাউণ্ড। বাড়ী থেকে আমার টাকা আসবেই তবে দেরিতে। কিন্তু কালই ফী জমা না দিলে আমি পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাব না। আমার বাবা গরিব—আমাকে আর একবৎসর এখানে রাখতে পারবেন না। কাজেই এ-পঁচিশ পাউণ্ড আজই জোগাড় করতে না পারলে আমার বিলেতে আসাই বিফল হবে—ডাক্তারিতে ফাইনাল পাশ না ক'রেই দেশে ফিরতে হবে। এককথায়—সর্বনাশ।"

আমার বালিশের নিচে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড মজুদ। তাকে তৎক্ষণাৎ দিতে পারি। কিন্তু একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল যে! আর ধক ক'রে মনে পড়ল আমার সেই তামিল বন্ধুটির কথা যে আমার কাছ থেকে পনের পাউণ্ড ধার ক'রে শোধ না দিয়ে আঠারো গিনির ওভারকোট কিনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে প'ড়ে গেল শরৎচন্দ্রের কথা: যে, মানুষ বিশ্বাস ক'রে ঘা খেলে শুধু-যে আঘাত দেয় সে-ই ছোট হ'য়ে যায় তাই নয়, যে আহত হয় তার মনের প্রসারও কিছুটা ক'মে যায়ই যায়। তাই যখন এ-যুবকটি এসে আমার কাছে সাহায্য চাইল তখন কেমন যেন এক অস্বস্তি পেয়ে বসল আমাকে। আগে হ'লে তাকে চাইবামাত্র দিতাম পঁচিশ পাউণ্ড, কিন্তু তামিল বন্ধুটির নির্লজ্জ আচরণের কথা মনে হ'তেই এক সাবধানী সুর আমাকে যেন ধমকে বলল: "ওকে জানো না যখন, কেমন ক'রে এত টাকা দেবে এককথায়?"...

যুবকটি বুদ্ধিমান্, আমার কুণ্ঠায় দুঃখ পেলেও বুঝল। বলল: "আমি জানি—পঁচিশ পাউণ্ড দিতে আপনার কেন বাধছে। বাধবার কথাও বটে। কিন্তু আমি

একান্ত অসহায় হ'য়েই আপনার কাছে হাত পেতেছি—বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, আপনি সুভাষ বোসের বন্ধু। আমি বহু চেষ্টা ক'রেও পরীক্ষার ফী জোগাড় করতে পারি নি। তাছাড়া ভারতীয় যুবকদের হাতে এত টাকা প্রায় কখনই থাকে না বললেও চলে। তবে আপনি ধনী, উদার ও দেশের দশের একজন, আপনি আমাকে না করবেন না ভেবে বড় আশা ক'রে এসেছি—এ-ফী জোগাড করতে না পারলে আমাকে অকূলপাথারে পডতে হবে। তাই আমার মিনতি—আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি ঠক কি মিথ্যুক নই। আমার পিতৃদেব আমাকে তার করেছেন ৫।৭ দিনের মধ্যেই আমাকে টেলিগ্রামে টাকা পাঠাবেন।" বলতে বলতে তার চোখ থেকে দুফোঁটা জল গডিয়ে পডল গাল বেয়ে।

তার অশ্রুকণ্ঠী প্রার্থনায় আমার মন ভিজে উঠল। আমি বললাম: "আপনি কাঁদবেন না। ভাগ্যক্রমে টাকা আমার বালিশের নিচেই আছে—আমার সার্জনের ফী। তবে তিনি বন্ধু লোক—সবুর সইবে।" ব'লে তাকে দিলাম পাঁচটি পাঁচ পাউণ্ডের নোট। সে চোখ মুছে চ'লে গেল।

কিন্তু সে প্রস্থান করার পরেই আমার মধ্যেকার ছোট-আমি আমাকে ধিক ধিক ক'রে উঠল: "কী ব'লে এক অজ্ঞাতকুলশীলকে এত টাকা দিলে শুনি? জানো না কি—টাকার জন্যে মানুষ কত নিচে নামে? অন্ততঃ টেলিফোনে ডাক্তার পার্ডিকে জিজ্ঞাসা করতেও তো পারতে যে ও সত্যিই ডাক্তারি পাশ দিতে যাচ্ছে কি না?—তবে কথায় বলে না a fool and his money are soon parted!…" ইত্যাদি।

কিন্তু তার পরেই আমার মধ্যেকার বড-আমি জেগে উঠল, বলল: "কিন্তু যদি ও সত্যি কথা ব'লে থাকে তাহ'লে তো ওর তিন বৎসর এদেশে পডা বিফল হ'ত।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মন আনন্দে ভ'রে গেল।

* * * *

অপারেশন হ'য়ে গেল। আমি তখনো শয্যাশায়ী, কষ্টে পাশ ফিরি। সাত আটদিন কেটে যাবার পরেও সে এল না দেখে আমি ডাক্তার পার্ডিকে সব কথা খুলে বললাম। শুনে তিনি মেঘলা মুখে বললেন: "আমাকে আপনি কন্সাল্ট করলে আমি খোঁজ নিতে পারতাম খুব সহজেই।"

ফের দ'মে গেলাম। আনন্দকে ছাপিয়ে সংশয়ের ফণা দেখা দিল।…

আট দশদিন বাদে সে-ছাত্রটি নার্সিং হোমে এসে আমাকে প্রণাম ক'রে পঁচিশ পাউণ্ড শোধ দিয়ে বলল: "আপনি আমাকে ত্রাণ করেছেন বড দুঃসময়ে। আমি আপনার কাছে কী যে কৃতজ্ঞ!" বলতে বলতে চোখ মুছল।

আমি অর্ধশয়ান অবস্থায় তার মাথা আমার বুকে টেনে নিলাম। শিশুর ম'ত তার

চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম গাঢ় কণ্ঠে: "আমাকে বাঁচালে ভাই, আমার মধ্যেকার বড়-আমিকে জাগিয়ে দিয়ে। তোমাকে দিতে পারা সত্ত্বেও না দিলে আমার নিজের চোখে আমি ছোট হ'য়ে যেতাম। তাই আমিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ জানবে।"

আমিও চোখ মুছলাম।

একুশ

অথ, কন্টিনেণ্ট পর্ব। কন্টিনেণ্ট শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত যে স্মৃতি। তবে বলব শুধু সেই সব স্মৃতির কথা যা পাঠকের মনে ঔৎসুক্য জাগাবে।

পঞ্চাশ বৎসর আগে কেম্ব্রিজে আমরা প্রায়ই আলোচনা করতাম কন্টিনেণ্টের নানা অবদান সম্বন্ধে। প্রথম অবদান—ইংলণ্ডের সংস্কৃতির চেয়ে কন্টিনেণ্টের সংস্কৃতি বেশি উদার। এর কারণ—ইংলণ্ডের অধিবাসীরা দ্বীপাবদ্ধ থেকে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে "ইনস্থলার"। ডীন ইঞ্জের OUTSPOKEN ESSAYS-এ একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম ইনস্থলার বলতে কী বোঝায়। বোঝায় মনের সংকীর্ণতা। ইংলণ্ডের বাসিন্দারা বিদেশী "ফরেনার" বলতে নাসিকা কুঞ্চিত করে—যেন ইংরাজই বিধাতার আদুরে ছেলে, বাকি সব জাত—হ্যাঁ আছে, তবে থেকেও নেই, না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। রূল বৃটানিয়া! টমসন সাহেবের গর্বোক্তি শুনতাম যত্র তত্র:

Rule, Britannia, rule the waves,
Britons never shall be slaves.

স্থভাষ উঠতে বসতে বলত: আমাদেরও গাইতে হবে এই গান—"Indians never shall be slaves."

কিন্তু বৃটিশ সিংহের গর্বগর্জনে আপত্তি করলেও বৃটিশ জাত যে একটা মস্ত জাত এ সম্বন্ধে কারুর মনেই সন্দেহ ছিল না। আমরা যা বলাবলি করতাম তাকে ছড়ায় রূপ দেওয়া মন্দ কি:

ছোট্ট একটি দ্বীপের মানুষ হ'ল কেমন ক'রে
বিশ্বব্যাপী—নয় তো শুধু হাঁকডাকেরি জোরে!
যায় যেখানেই গ'ড়ে তোলে রাজ্যপাট নতুন!
চিরে ঢেউয়ের বুক কোথায় না ছড়ায় ভাই আগুন?

ইংরাজেরা গর্ব করতে পারে বৈকি। মানুষ গৌরবী হয় তো সংখ্যার দৌলতে নয়—কীর্তির মহিমায়। ইংরাজ জাতের সর্বতোমুখী কীর্তিকে অস্বীকার করবে কে? রণপোতসজ্জা, শাসনদক্ষতা, উপনিবেশ গড়ার অসামান্য নৈপুণ্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিয়মানুবর্তিতা, সংঘ গড়ার প্রতিভা, স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উড়োনো, মহাজনদের সৃষ্টি—একমাত্র সঙ্গীতে ওরা পেছিয়ে। বার্নার্ড শ অবশ্য তাঁর অতুলনীয় শেভিয়ান হাসি হেসে বলতেন: অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের মাটির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ এই যে সেখানে চমৎকার কবর গড়া যায়—কিন্তু আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছিলাম এ-দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনস্বীকার্য বিদ্যাবত্তায়।

প্রথম ধাক্কা খেলাম শ্রীশরৎ দত্তর কাছে। তিনি বললেন: ইংরাজ বড় নেশন কিন্তু আরো বড় জর্মন। ব'লে আমাদের কাছে জর্মন মহিমার গুণগান শুরু করলেন উচ্ছ্বসিত। বললেন: "ওরা ধরতে গেলে একলাই লড়েছে মিত্রশক্তির চারটি নেশনের সঙ্গে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ইতালি, জাপান। যদি শুধু আমেরিকা লুসিটানিয়া ডোবানোর জন্যে রেগে না যোগ দিত তাহ'লে আজ য়ুরোপে ছত্রপতি হ'ত জর্মনিই—আর কেউ নয়।" ব'লে বলতেন প্রায়ই: কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে আমরা কন্টিনেণ্টে যাই না—ছুটি কেবল ইংলণ্ডে বড় চাকরে হ'তে।"

আমি কন্টিনেণ্টের ভক্ত হয়েছিলাম প্রথম থেকেই রোঁলার লেখা প'ড়ে। যতদূর মনে হয় সুভাষ ও আরো অনেক বাঙালী ছাত্রকে শ্রীশরৎ দত্তই বেশি ক'রে উস্কে দেন জর্মনির কাছে শক্তির শিক্ষানবিশি করতে।

কিন্তু আমার প্রিয়তম জাতি ছিল—ফরাসী। জর্মন ভাষা শিখে ও জর্মনিতে এক বৎসর কাটিয়ে আমি জর্মনির গুণগ্রাহী হয়েছিলাম বটে। কিন্তু আমি ফরাসী জাতিকেই কন্টিনেণ্টের মধ্যমণি মনে করতাম। রোঁলাই আমাকে প্রথম জর্মনিতে গিয়ে গানের তালিম নিতে বলেন—নৈলে হয়ত আমি গান শিখতে পারিসেই যেতাম—আরো এই জন্যে যে, ফরাসী ভাষাকে আমার মনপ্রাণ বরণ করেছিল বরণমালা দিয়ে, জর্মন ভাষা আমার কাছে বরণীয় মনে হয় পরে—জর্মন গান শিখে জর্মনির নানা সিমফনি সঙ্গীতে রস পাওয়ার পরে ও গেটে প'ড়ে।

অনেকের ধারণা, আমি ওদেশের সঙ্গীতে অভিজ্ঞ। ভুল। আমি ওদের নানা জাতের গানের রসজ্ঞ হ'য়ে উঠতে পেরেছিলাম মাত্র—তা-ও বহু কষ্টে—ওদের গান-বাজনা ক্রমাগত শুনে শুনে। যাকে বলে অনুশীলন। কিন্তু ওদের কান হার্মনিকে যেভাবে শোনে আমি বহু চেষ্টা ক'রেও সেভাবে শুনতে পারি নি। একথার ব্যাখ্যা করতে হ'লে অনেক দৃষ্টান্ত দিতে হবে যা নীরস—বৈয়াকরণিক কচকচি। তাই শুধু এইটুকু ব'লেই থামি যে, আমি জর্মন ও ইতালিয়ান ভাষায় গাইতে শিখে এসব গানের অন্তর্নিহিত রসের কিছুটা খবর পেয়েছিলাম ব'লে ও-দুই ভাষার নানা গানের সুরের হাওয়ায় বাংলা গানের বাগানে ফুল ফুটিয়েছিলাম। একটি দৃষ্টান্ত দিই, সরস দৃষ্টান্ত তাই পেশ করা চলে।

আমি একটি রুষ জিপসি-সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়ে রুষ ভাষা না জেনেও আপ্রাণ চেষ্টায় উচ্চারণ মাত্র শিখে গানটিকে আয়ত্ত ক'রে তার বাংলা রূপ দিই আমার একটি জনপ্রিয় গানে যেটি আমি আমার গীতিকিন্নরী শিষ্যা উমা বসুর সঙ্গে গ্রামোফোনে গেয়ে বাইরনের মতন আবিষ্কার করি এক সুপ্রভাতে যে আমি যশস্বী হয়ে পড়েছি। ("I woke one morning and found myself famous") গানটির প্রথম চরণ ইয়াৎসেগাইন ··বাংলা প্রতিরূপটি এই (অবিকল ঐ একই সুরে গেয়):

অকূলে সদাই চলো ভাই, ছুটে যাই।
ভালোবেসে বাঁশিরেশে ডাকে যে সে : "ভয় নাই।"
ধাও প্রাণ, গাও গান বরদান এই চাই ;
কূল ছাড়ি' যেন তারি অভিসারী তরী যাই।"
রঙিন মেলায় বাসনায় উছলি
শুনি হায়, আলেয়ায়—ধ্রুবতারা মুরলী।
"ধাও প্রাণ...... তরী বাই।"
অপারবিজয় বরাভয় স্বনিল !
হৃদিতারে ঝঙ্কারে সে-রাগিনী রঙিল।
"ধাও প্রাণ......তরী বাই।"

এ-গানটি এ-বৎসর বিখ্যাত রুষ দাবাড়ু (Grandmaster) আলেক্সিস স্বত্রটিন ও তাঁর এক রুষ সঙ্গিনীকে আমাদের মন্দিরে শুনিয়েছিলাম—আগে মূল রুষ গানটি গাইবার পর আমার গানটি গেয়ে। শুনে তাঁরা কী যে খুশী। রুষ মহিলাটি বললেন : "আমার উচ্চারণ নিভুর্ল হয়েছে।" জানি না এ সত্যি প্রশংসা না সুভদ্র কমপ্লিমেণ্ট। (মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্রলালের মন্দ্র কাব্যে "শীলতার অন্য নাম শুভ্র মিথ্যা কথা।")

যখন প্রসঙ্গটা এসে গেল তখন বলি—গ্র্যাণ্ডমাস্টার আমার দাবাখেলার সুখ্যাতি করলেন অকুণ্ঠেই—মনে হয় শুধু শীলতার প্রেরণায়ই নয়, কারণ বিশেষ ক'রে শেষ বাজিটা তাঁর সঙ্গে প্রায় ড্র হ'তে হ'তে একটা ছোট্ট ভুলের জন্যে হেরে গেলাম। কেম্ব্রিজে আমার সুনাম হয়েছিল দাবাড়ু ব'লে। অতগুলি কলেজের প্রতি কলেজে পাঁচটি ক'রে দাবাড়ু খেলেছিল পরস্পরের সঙ্গে। আমাদের কলেজে আমি হ'লাম ফার্স্ট বোর্ড অর্থাৎ নেতা, ও ফাইন্যালে এক কলেজের সঙ্গে খেলায় জিতে গেলাম। আমাকে ওদের "হাফ ব্লু" দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তখন সাহেবেরা আমাদের প্রতি বিমুখ তাই আমি "হাফ-ব্লু" হ'তে পারি নি।

মরুক গে, অবান্তর কথা। তবে পুরোপুরি অবান্তর নয়—স্মৃতিচারণে এ-সব মনোজ্ঞ স্মৃতি পাংক্তেয় হবার দাবি করতে পারে।

গানের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সঙ্গীত সম্বন্ধে রোলাঁই ছিলেন আমার শিক্ষাগুরু। আমাকে কত যে চিঠি লিখতেন—কিন্তু সেকথা পরে বলব—যথাস্থানে। এখানে এ-প্রসঙ্গে শুধু ব'লে রাখি যে, আমি য়ুরোপীয় সঙ্গীতে পারঙ্গম না হ'য়েও যে রসজ্ঞ হ'তে পেরেছিলাম তার জন্যে ধন্যবাদার্হ নিশ্চয়ই রোলাঁ। কিন্তু তিনি ওদেশের অপেরার মর্মজ্ঞ হ'য়ে আমাকে অপেরার রসজ্ঞ করতে চেষ্টা করলেও অপেরা আমি ভালোবাসতে পারি নি। অপেরার যন্ত্রসঙ্গত—অর্কেস্ট্রা—আমার ভালো লাগলেও

কণ্ঠসঙ্গীতে আমার সুবেলা কান প্রায় বধির হ'য়ে আসত, মনে পড়ত প্রবচন—কান ঝালাপালা প্রাণ পালাপালা। তবে কয়েক বৎসর ক'ষে ওদের গানে আরো তালিম নিলে হয়ত অপেরারও রসজ্ঞ হ'তে পারতাম—কে বলতে পারে? কত কী-ই তো আমাদের প্রথমে প্রতিহত করে যা পরে আমাদের মন টানে। রোলাঁ নিজেও একসময়ে হ্বাগনারের একটি অপেরার বজ্রনিনাদ শুনে তিতিবিরক্ত হ'য়ে উঠে চ'লে এসেছিলেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন—সঙ্গীতের রসজ্ঞ হ'তে হ'লে প্রথম চাই সুরের কান, দ্বিতীয়—ধৈর্য। একথা কে না মানবে।' আমার নিজের বেলায়ই তো দেখেছি—জর্মন ভাষা আমার প্রথম আদৌ ভালো লাগে নি। পরে জর্মন গান গাইতে শিখে আবিষ্কার করি তার ওজঃশক্তি তথা মাধুর্য। ওদের দেশে গীতিকারদের মধ্যে গৌরবের শীর্ষে আসীন জর্মন গীতিকার। তারপর কে সে নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে—রুষ, কেউ বলে ফরাসী, কেউ বলে পোল, কেউ বলে চেক, কিন্তু জর্মন গানই যে সঙ্গীতে কোহিনূর এ সম্বন্ধে মতভেদ নেই। ম্যাথিউ আর্নলড তাঁর প্রখ্যাত সনেটে শেক্সপীয়রের সম্বন্ধে লিখেছিলেন।

Others abide our question, Thou art free ··

আমরা বিচার করি অন্য যত কবিপ্রতিভার :

শুধু তুমি একা সব বিচারের সমূর্ধ্বে আসীন।

জর্মন সঙ্গীতকারদের সঙ্গীত প্রতিভার সম্বন্ধেও একথা খাটে।

বাইশ

সুভাষ ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে ফিরে কয়েক মাসের মধ্যেই জেলে যায়। ও প্রস্তুত ছিল জেলে যেতে। বলত প্রায়ই: "স্বাধীনতা গাছের ফল নয় যে পেড়ে খেলেই চলবে—স্বাধীনতার জন্যে চাই দেশমাতৃকাকে ভালোবেসে তাঁর জন্যে দুঃখবরণ।" আজ পূর্ববঙ্গের মুক্তিবীরদের দৃষ্টান্ত দেখে একথা আরো মনে পড়ে।

ওর জেলে যাওয়ার খবর কোথায় পেয়েছিলাম মনে নাই—প্যারিসে না বার্লিনে। তবে মনে আছে—শুনে প্রবল "হোমসিকনেস" আমাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু ও আমাকে লিখেছিল জর্মনিতে গানে যথাসাধ্য তালিম নিযে তবে দেশে ফিরে দেশসেবায় লাগতে। ও প্রায়ই বলত: "যে বড হ'তে চায় আত্মপ্রসাদের বখশিস পেতে সে দুর্ভাগা। কিন্তু বড হওয়া চাই কারণ বড হ'লে দেশের সেবায় কৃতী হওয়া সহজ হয়।" তাই দেশবন্ধুকে নেতৃপদে বরণ ক'রে ও আমায় যে-চিঠি লেখে তাতে পই পই ক'রে আমাকে মানা করেছিল ঝোঁকের মাথায় কিছু না করতে। যে-সাধনার জন্যে জর্মনি-প্রয়াণ সে-সাধনায় যেন সিদ্ধিলাভ ক'রে তবে ফিরি।

যতদূর মনে পড়ে—আমি প্যারিসে এক ওমরাও (fonctionnaire) মহোদয়ের ঘরে প্রথম আতিথ্য গ্রহণ ক'রে ফরাসী ভাষায় আরো পাকা হ'য়ে যাই বার্লিন। শ্রীশরৎ দত্ত আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন এক ফ্রাউ কির্সিঙ্গার-এর কাছে। আমি সোজা গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হই। তিনি সানন্দে আমাকে জর্মন ভাষায় তালিম দিতে সুরু করলেন। এ-মহিলাটির কাছে আমার ঋণ অগুন্তি। কত যে লাভ করেছিলাম তাঁর অহেতুক স্নেহের অবদানে! আমাকে তিনি বলতেন তাঁর Enkel—নাতি। আমি বাধ্য হ'যে তাঁকে ডাকতাম Grossmutter—দিদিমা। এঁর সম্বন্ধে আমি আমার "ভাবি এক হয়" আর—এ অনেক কিছুই বলেছি যার ষোল আনা না হোক অনেক কিছুই সত্য। তাই সেসব কথার পুনরুক্তি করব না। তবে তাঁর সাঁল-পার্টিতে পাসপোর্ট পেয়ে আমি এত লাভবান হয়েছিলাম যে সে সম্বন্ধে কিছু বলি যথাসম্ভব সংক্ষেপে।

যুদ্ধের আগে তিনি ছিলেন নিযুতপতি—মিলিয়নেয়ার। যুদ্ধের পরে জর্মন মার্ক প'ড়ে যেতে মিলিয়ন মার্ক হ'য়ে দাঁড়াল—তুচ্ছ, গ্রাসাচ্ছাদনও চলে না তার দৌলতে। আমি যখন বার্লিনে যাই তখন পাউণ্ডে চার পাঁচ হাজার মার্ক পেতাম। কাজেই থাকতাম রাজার হালে। দিদিমাকে নিয়ে যেতাম সেরা সিম্‌ফনি-কন্সার্টে—জগদ্বিখ্যাত নিকিশের পরিচালনায়। কখনো কখনো অপেরাতেও নিয়ে যেতাম

দামী সীট-এ—৫০০।৬০০ মার্ক খরচ ক'রে। দুঃখ হ'ত ভাবতে যে তিনি প্রতিদানে আমাকে কোনো কন্সার্টে বা অপেরায় নিয়ে যেতে পারতেন না ভালো সীটে। কিন্তু বেদনার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছিল তাঁর আশ্চর্য তেজস্বিতা। তাঁর এক মেয়ে প্যারিসে ধনীর গৃহিণী। আর এক মেয়ে মস্কোয় এক সঙ্গতিপন্ন স্বামীর আদরিণী। দুজনেই অপরূপ সুন্দরী (তাঁদের আমি পরে দেখেছিলাম)—শুধু সুন্দরী নয় বিদুষী তথা স্নেহশীলা। তাঁরা বারবার বলতেন মাকে তাঁদের কাছে গিয়ে থাকতে। কিন্তু বৃদ্ধা ছিলেন অনমনীয়া। আমাকে বলেছিলেন: "আমি তেরোটি ভাষা জানি, ছাত্রীও পাই, কাজেই কেন পরের গলগ্রহ হব?" ইংরাজী, ফরাসী, জর্মন, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, পোলিশ এমন কি রুশ ভাষায়ও তিনি স্বচ্ছন্দে আলাপ করতে পারতেন। সুইডিশ নরওয়েজিয়ান ডেনিশ ভাষাও জানতেন। আমি তাঁর কাছে প্রথমে জর্মন ভাষায় তালিম নিই, তারপর ইতালিয়ান ভাষায়। ইতালিয়ান ভাষায় বেশিদূর এগুতে পারি নি সময়াভাবে, কিন্তু জর্মনে স্বচ্ছন্দে আলাপ করতে পারতাম—যদিও আমার সবচেয়ে ভালো লাগত ফরাসী ভাষা। দিদিমা আমাকে তাঁর লাইব্রেরি থেকে নানা ভালো ভালো বই দিতেন পড়তে। কিন্তু পড়বার আমি বেশি সময় পেতাম না। ওখানে Sternes Conservatorium-এর অধ্যক্ষের কাছে দিদিমা আমাকে পেশ ক'রে দিতে তিনি এক রুশ বেহালা বাদক ও এক হাঙ্গেরিয়ান সুগায়কের কাছে গান বাজনা শিখতে উপদেশ দেন। বেহালা আমি তিন চারমাস পরে ছেড়ে দিই, কারণ দিদিমা বললেন: "তোমার প্রতিভা গানের, বেহালা শিখে কী হবে? সমস্ত শক্তি একমুখী করো—গানই শেখো।"

কথাবৎ কার্য। আমি উঠে প'ড়ে লাগলাম কণ্ঠসাধনা করতে—আর অল্পদিনের চাষেই প্রচুর ফসল ফলল। শিক্ষক য়েকেলুস (Jekelius) আমাকে বললেন আমি যদি মাত্র পাঁচটি বৎসর গান শিখি তবে অপেরা গায়ক হ'য়ে নাম কিনতে পারব। আমি তাঁকে সাফ ব'লে দিলাম অপেরা-গায়ক হবার কোনো উচ্চাশাই আমার নেই—আরো এই জন্যে যে, অপেরা গায়কদের গায়কী আমার কর্ণপটহকে দুঃখ দেয়! তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন: "Jammerschade!" (ওথেলোর ভাষায় এর অনুবাদ: "The pity of it!")

কিন্তু আমার তিনি মস্ত উপকার করেছিলেন (১) ইতালিয়ান পদ্ধতিতে গলা সাধতে শিখিয়ে; (২) জর্মন গানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে; (৩) তাঁর উৎসাহে আমার কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য উন্নতি ঘটিয়ে, যেন জাদুবলে। তাঁর কাছে কণ্ঠসাধনার যে-পদ্ধতি শিখেছিলাম দেশে ফিরেও শুধু যে নিজে সে-সাধনাকে বরণ করেছিলাম তাই নয়, একাধিক শিষ্য-শিষ্যাকেও তালিম দিয়েছিলাম যার মধ্যে দুজন পরে নাম করেন—শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উমা বসু। গোবিন্দগোপাল

আমার নির্দেশে কণ্ঠসাধনা ক'রে যে লাভবান হয়েছিলেন একথা তিনি আজও স্বীকার করেন। দুঃখ এই যে, গীতিরাণী উমার কণ্ঠ অকালে নীরব হ'য়ে গেল। ১৯৪১ সালে তাকে মৃত্যু আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সে আজ থাকলে আমার শ্রেষ্ঠ গানের এমন রূপ দিত যার ফলে সকলকে স্বীকার করতে হ'ত গানগুলির সুরকৃতি। কিন্তু হারানো খেই ধরি ফের। ফিরে আসি জর্মনিতে।

বার্লিনে ও প্যারিসেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় কন্টিনেন্টের সংস্কৃতির সঙ্গে, আমি দেখতে পাই য়ুরোপকে তার বিশাল পটভূমিকায়। ইংলণ্ডে থেকেও জর্মন গান শেখা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ইংলণ্ডে এত জাতের বন্ধুবান্ধবী লাভ হ'ত না। জর্মনিতে আমার যে কত বন্ধু লাভ হয়েছিল যারা আমাকে তাদের প্রীতির বরণমালা দিয়ে ধন্য করেছিল, কত পবিত্রহৃদয়া বান্ধবী তাদের আনন্দমেলায় যোগ দিতে ডেকে আমাকে উল্লসিত করত, কত গায়ক আমাব গান শুনে আমাকে উৎসাহিত করত তার যথাযথ বর্ণনা কী ক'রে করব ? কিন্তু একটি কথা না বললেই নয় : জর্মনজাতির নিষ্ঠা ও পৌরুষ আমাকে অভিভূত করলেও আমি তাদের সঙ্গে মিশে প্রথম জানতে পারি কেন তারা ইংরাজবিদ্বেষী হয়েছে। শুনতাম স্পষ্ট তাদের অন্তরে ইংরাজদ্বেষের গুরু গুরু গর্জন। টের পেয়েছিলাম ওরা ভিতরে ভিতরে তৈরি হচ্ছে আর এক বিশ্বযুদ্ধের জন্যে। ওরা বিশ্বাস করত সত্যিই যে ওরা প্রভুজাতি—হিটলারের ভাষায় Herrenvolk. জর্মন দেশভক্তিও ছিল কম উগ্র নয়—Deutschland ueber alles—জর্মনি সবার উপরে—ছিল ওদের জাতীয় সঙ্গীত। ইংরাজ বলত : বৃটানিয়া সমুদ্ররাজ্ঞী। ওরা বলত : জর্মন জাতি Welt-bezwinger—জগজ্জয়ী।

ফরাসীরা গাইল :

Aux armes citoyens !
Formez vos bataillons
Marchons marchons….

লঘুগুরু ছন্দে এর তর্জমা :

ধর' ভীম অস্ত্র পুরবাসী !
রচি' বিজয়িসংঘ অবিনাশী !
চল' আগে…চল আগে…

জাতীয় দর্পের সঙ্গে জাতীয় দর্পের সংঘাত·· যুদ্ধ যে ফের গর্জে উঠবে এতো দুই আর দুইয়ে চারের লজিক।

এ-সমস্যার সমাধান কোথায়—এর ওর তার সঙ্গে আলোচনা করতাম। কিন্তু কোনো সুষ্ঠু উত্তর পেতাম না। কেবল যাঁদের মত আমি মূল্যবান্ মনে করতাম

তাঁরা সবাই একবাক্যে বলতেন: জাতীয়তা—nationalism-এর যুগ গত। এঁদের শিরোমণি ছিলেন দুজন: রোলাঁ ও রাসেল। বার্লিনে রুষদেশের যা খবর পেতাম আমার রুশ বন্ধুবান্ধবীর মুখে তাতে মনে হ'ত না যে রাশিয়া আন্তর্জাতিকতার ধার ধারে।

এই সময়ে আমি হঠাৎ শ্রীমানব রায়ের সংস্পর্শে আসি। তিনি তাঁর এক বাহনকে দিয়ে আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি গুপ্তভাবে আছেন। সে-সময়ে বার্লিনে বলশেভিকদের সবাই এড়িয়ে চলত। বিশেষ ক'রে জর্মন ফরাসী ও রুশ উদ্বাস্তুরা।

আমার বুকের মধ্যে গুর গুর ক'রে উঠল। আমি কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবীর সঙ্গে ইতিমধ্যে সংস্পর্শে এলেও মানব রায় তখন ছিলেন বিপ্লবীদের মুকুটমণি। মানবরায়ের সঙ্গে কথা ক'য়ে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। এমন দীপ্ত বুদ্ধি আমি আর কোনো বিপ্লবীর মধ্যেই দেখি নি—না হেরম্বগুপ্ত-র, না বীরেন চট্টোর, না পিলাইয়ের, না ভূপেন দত্তর। এদের একটা আড্ডা ছিল—সপ্তাহে একদিন ক'রে তাঁরা জমায়েৎ হতেন। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে—প্রবচনটি অকাট্য। নৈলে কি নিরীহ দিলীপকুমারও সেখানে গিয়ে তারস্বরে প্রেমের গান করেন? বিশেষ করে আমার মুখে "মলয় আসিয়া ক'য়ে গেছে কানে শুনে স্বামীজির ভ্রাতা মহাবিপ্লবী ভূপেন্দ্র দত্ত মুগ্ধ। যখনই গাইব ঐ গানটি গাওয়াই চাই। আমি মনে মনে ভাবতাম চাপা হেসে: "এমন দুর্ধর্ষ বিপ্লবীও কি না প্রেমের গান শুনে উচ্ছ্বসিত।" তখন আমার কণ্ঠ য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে সাধনা ক'রে হয়ে ছিল শিখরচারী। আমার সম্বন্ধে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞা Mrs Cousins একদা বলেছিলেন; "Dilip sings like a king". রাজারা মস্ত গায়ক এ আমার জানা ছিল না, কিন্তু খোদ ভূপেন্দ্র দত্ত যখন "মলয় আসিয়া ক'য়ে গেছে কানে" শুনে উজিয়ে উঠলেন তখন মনে হয়েছিল যে, রাজা হয়ত বিপ্লবীকেও মোহিত করতে পারে যদি সে ইতালিয়ান পদ্ধতিতে কণ্ঠ সাধনা ক'রে রাজকীয় ধ্বন্যালোকে পৌঁছয়। কিন্তু ঠাট্টা রেখে বলি মানব রায়ের কথা। যেমন অমায়িক তেমনি আলাপী। হাসতেও পটু অথচ বিতণ্ডাতেও দুর্ধর্ষ। আমি বলশেভিকদের সম্বন্ধে যা যা শুনেছিলাম বলতে তিনি আমাকে অপ্রতিবাদ্য যুক্তি জালে হারিয়ে দিয়ে হেসে বললেন: "পরের মুখে ঝাল খাবেন না দিলীপ বাবু—চলুন মস্কোয়, যাবেন?" আমি তো আতঙ্কেই সারা। ওখানে গেলে আর ফিরতে পারব না—বলেছিল আমাকে একবার বন্ধু শহীদ সুরবর্দি—যার কথা পরে বলছি। মানব রায়কে একথা বলতেই তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন: "আমি জামিন দিলীপ বাবু, চলুন।" আরো কি কি কথা হয়েছিল মনে নেই, কেবল তাঁর শেষ অনুরোধটি ভুলি নি, কেন না আমার বুদ্ধির তিনি তারিফ করেছিলেন। বলেছিলেন: "আপনি

দেশের সুসন্তান বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রূপে প্রতিভায়। আমরা চাই এমনি রিক্রুট। ওল্ড ফোগিদের দিয়ে কাজ হবে না—তাদের দিন শেষ হয়েও এসেছে। রুষদেশে এমন একটা নবজাগরণের যুগে এক আশ্চর্য নবশিহরণ" · ইত্যাদি। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনে কেমন যেন আবিষ্ট হ'য়ে পড়লাম। বললাম: "আচ্ছা আপনাকে আমি ভেবে উত্তর দেব। "তিনি বললেন "ভাবুন যত ইচ্ছে, কেবল বাজে লোককে কনসাল্ট করবেন না।"

অতঃপর আরো একদিন তাঁর কাছে যেতে হয়েছিল জানাতে যে আমি যেতে ভয় পাচ্ছি কেন না লণ্ডনের হাইকমিশনর এন. সি. সেন আমাকে তার করেছেন: যেও না মস্কো। গেলে তোমার পাসপোর্ট আর তোমার কোনো কাজে আসবে না।

কিন্তু তবু মানব রায়ের অসামান্য বুদ্ধি তর্ক যুক্তি আমি ভুলতে পারি নি। শুনেছি শেষ বয়সে তিনি মত বদলেছিলেন এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে না কি তাঁরি জন্যে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। তবে একথা সত্য কি না জানি না, তদন্ত করতেও মন চায় নি কোনোদিনই। মানব রায়ের মনীষার স্মৃতিই অটুট থাকুক আমার মনে।

তেইশ

বিধাতা যখন আঁতুড় ঘরে আমার ললাটে অদৃশ্য আখরে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ইতিহাস লিখেছিলেন তখন তাঁর বোধহয় মনে একটু দয়া হয়েছিল লেখার পর যে, এ-ছেলে সংসারী হবে না, যোগী হবে। একদিকে যেমন যোগী হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়, অন্যদিকে তেমনি সংসারী বুদ্ধি না থাকলে সংসারে পদে পদে ভুগতে হয়। বিধাতা তাই লিখেছিলেন : "একে বাঁচাবে নানা সময়ে নানা বন্ধু।' বার্লিনে আমার কতিপয় বন্ধু বান্ধবী আমাকে বাঁচিয়েছিলেন নানা সংকটে। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ওলগা বিরুকফ।

ওলগার পিতৃদেব পল বিরুকফ ছিছেন টলস্টয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর সঙ্গে আমার ১৯২২ সালে দেখা হয়েছিল সুইজর্লণ্ডে। যেমন সুশ্রী তেমনি উদার। সর্বোপরি আদর্শবাদী। টলস্টয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে যাঁরা অহিংস যুদ্ধবিরোধী ও নিবামিষাশী হন তাঁদের বলে টলস্টয়ান। পঞ্চাশ বৎসর আগে রুষদেশে ও অন্যত্র টলস্টয়ানদের দেখা মিলত। টলস্টয়ানরা সত্যিই বিশ্বাস করেন খৃষ্টধর্মকে। সাধনা করেন সরল নিরীহ জীবন যাপন করতে। বলেন বাইরের সব শাসনই ভুল কেবল অন্তরের শাসনই আমাদের ঠিক পথে চালায়। ওলগা বার্লিনে এসেছিল চিত্রবিদ্যা শিখতে। পরত homespun সুতোর ফ্রক—খদ্দরের মতন। রোজ খেত এক সস্তা নিরামিষ ভোজনালয়ে। ভুলেও কখনো কোনো থিয়েটারে বা নাচঘরে যেত না—তবে গান ভালোবাসত ব'লে আমার সঙ্গে যেত নানা সিমফনি কন্সার্টে ফিলহার্মনিক হলে। বলত আমাকে রুষজাতির মতন গানপাগল জাত আর দুটি নেই—যদিও স্বীকার করত সত্যবাদিনী তো—জর্মনই সঙ্গীত রাজ্যে শিখরচারী। তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হ'ত সেই নিরামিষাশী রেস্তের াঁ-তে, আর শুনতাম সাগ্রহে রুশ জাতির নানা বিচিত্র মতিগতির কথা। সে বলশেভিকদের আদৌ পছন্দ করত না, কিন্তু স্বীকার করত, সত্যের খাতিরে যে বলশেভিকরা অরাজকতা ও বিদেশী ইম্পীরিয়ালিস্‌ম থেকে রুষদেশকে বাঁচিয়েছে। লেনিন মহদাশয়, কিন্তু ট্রটস্কি স্টালিন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে সে চুপ ক'রে থাকত। একদিন বলেছিল : দিলীপ, দেয়ালেরও কান আছে। তাছাড়া আমি নির্বিবাদী, বাবার মতন, চাই নিজের পথে চলতে'এর ওর তার পথের গুণাগুণ সম্বন্ধে নাই বা রায় দিলাম।" কেবল "বলশেভিকরা ধর্মের মূলচ্ছেদ করেছে শুনি—" আমার এ প্রশ্নের উত্তরে হেসে বলেছিল : "ভাই দিলীপ, সমুদ্রকে শুকিয়ে ফেলা যেদিন সম্ভব হবে সেইদিনই

কেবল ধর্মকে মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা যাবে। খৃষ্টদেব অকারণ বলেন নি স্বর্গ মর্ত লুপ্ত হ'লেও আমার বাণী লুপ্ত হবে না।"

বড় ভালো লাগত তার সরল বিশ্বাস, ঐকান্তিকতা, ধর্মনিষ্ঠা, পবিত্রতা, আদর্শবাদ, মিষ্ট হাসি ও সহজ স্নেহশীলতা। কপটতার ধারপাশ দিয়েও সে যেত না কখনো। সরল একরোখা ধর্মভীরু এ-সুকুমারীকে আমার মনে হ'ত অনন্যা। সে বলত—চিরকুমারী থাকবে চিরদিন। রবীন্দ্রনাথের বলাকার লাইন মনে পড়ত: "পরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে···ক্ষতি এনে দিবে পদে অদৃশ্য অমূল্য উপহার।" পরে তার পিতৃদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে (ভাগ্যক্রমে পিতাপুত্রী উভয়েই চমৎকার ফরাসী বলতে পারতেন) আমি ওলগার মনের আরো যেন নাগাল পেয়েছিলাম। মনে পড়ত ইংরাজী উপমা: "A chip of the old block."

বহুদিন বাদে আমার এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম ওলগা টলস্টয় ম্যুসিয়মে কাজ করে ও তার টেবিলে আমার ছবি। মস্কো থেকে সে আমাকে চিঠি লিখত মাঝে মাঝে। তার কথা যখনই মনে হয় অন্তরে জেগে ওঠে তার মুখের প্রসন্ন নির্মলতার আভা। টলস্টয় যে ম'রেও মরেন নি—ওলগা ছিল তার অন্যতম তথা জীবন্ত প্রমাণ।

মানবরায়ের নিমন্ত্রণের কথা শুনে সে দুহাত তুলে বলল: "না না না—যেও না মস্কোয়। আমাকে যেতেই হবে, কিন্তু তোমার মতন ধর্মপন্থীর পক্ষে মস্কোর আবহাওয়া হবে দুঃসহ।" এই ধরনের জোরালো নিষেধ।

আমার কাছে সে সাগ্রহে শুনত আমাদের দেশের মুনি ঋষি অবতারদের কথা। সবই তার অন্তর সাদরে বরণ ক'রে নিত। বলত প্রায়ই একটি কথা: "তোমাদের দেশ সম্বন্ধে টলস্টয়ের ধারণা ছিল খুব উঁচু।" কিন্তু টলস্টয়ের কোনো লেখায় তাঁর এধরনের রায় তখনো আমার চোখে পড়ে নি। ওলগা বলত: একথা ও ওর পিতৃদেব পল বিরুকফের কাছে শুনেছিল।

মস্কো যাবার ইচ্ছায় ওলগাই প্রথম বাদ সাধে।

চব্বিশ

মস্কো-সম্পর্কে আরো সোচ্চার হয়েছিল শহীদ সুরবর্দি—পই পই ক'রে মানা করেছিল মস্কো যেতে। রীডার্স ডাইজেস্টে নানা লোকে লেখে The most unforgettable Character I have seen. আমি বলতে চাই একটি unforgettable character এর কথা: অর্থাৎ শহীদ সুরবর্দি। তার সম্বন্ধে আমি অন্যত্র লিখেছি একাধিকবার। তবু তার কথা আমার "স্মৃতির শেষপাতায়" না থাকলে আমার স্মৃতিচারণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পুনরুক্তি সর্বত্র এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়, তবে যেমন "এক নদীতে মানুষ দুবার স্নান করে না।" তেমনি একই বন্ধুর দুটি চিত্রায়ণ একই রূপে বসে ফুটে উঠতে পারে না। কারণ স্পষ্ট: শহীদকে আমি নানা সময়ে নানা রূপে দেখতাম। ইতিপূর্বে তার চিত্রায়ণে যে-রূপকে ফুটিয়েছি সে একটি বিশেষ "মুড"-এর স্ফুরণ। আজ লিখছি অন্য মুড-এ—মনে রেখে যে তার সম্বন্ধে যে-সব কথা বলা হয় নি সেই সব কথাই বলব যথাসাধ্য। এইটুকু উপক্রমণিকা ক'রেই শুরু করি "সুরবর্দির কথা অমৃত সমান।"

অমৃত সমান—বটেই তো। ভগবানকে বলা হয়েছে রসময়—রসো বৈ সঃ। সুতরাং [illegible]-মানুষ তার হাবভাবে চিঠি পত্রে, হাসি ঠাট্টায়. স্মৃতিচারণে অনায়াসে রসের ঝর্ণা বইয়ে দিতে পারে তার কথা অমৃত সমান বললে অত্যুক্তি হবে কেন? সংসারে আমরা চলি দিনগত পাপক্ষয় ক'রে দিনের পর দিন ধূসর নীরস মরুপথের পথিক হ'য়ে। শ্রীঅরবিন্দ কোথায় বলেছেন যে মানুষের মনের মাত্র দুটি অবস্থা আছে—সুখী ও দুঃখী—একথা ঠিক নয়: আরো একটি (তৃতীয়) অবস্থা আছে এবং সেইটিই আমাদের জীবনকে বেশি ছেয়ে ধরে যাকে বলা চলে না-সুখের-না-দুঃখের অবস্থা ওরফে নিউট্রাল। সবই আছে অথচ কিছুতেই যেন সাধ মিটছে না, রস মিলছে না। স্বাস্থ্য অটুট, যশে সুপ্রতিষ্ঠ, ধন অঢেল, বন্ধুরা সদয়, বণিতা অবিদ্যা নয়—তবু মন খাঁ খাঁ করে—না, বর্ণনায় ভুল হ'ল—শূন্যতাও নয়, বিরসতা। মনে পড়ে একবার আমার প্রকাশক বন্ধু ৺শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের ওখানে গিয়েছিলাম। দেখি রেডিও বাজছে কিন্তু তিনি খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন অন্যমনস্ক ভাবে।

শুধালাম: 'রেডিওতে কী বাজছে?' তিনি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন· "কে জানে? আমি খুলে রেখে দিই—ঐ ঘ্যান ঘ্যান করে—করুক না।" আমাদের জীবনের অধিকাংশ দিন ক্ষণ পহরই ঠিক এম্‌নি বন্ধ্যা—ঘ্যান ঘ্যান করে আমরা খবর

নিই না কে কী বলছে, সংকল্প করি না—"আমি এবার বলার ম'ত কিছু বলবই বলব—শোনার ম'ত কিছুই শুনবই শুনব।" হা অদৃষ্ট। বলার মতন কিন্তু বলতে পারে কজন? শুনবই বা ছাই কী? অমুক অমুককে গাল দিল বা মেরে বসল, তমুক পথ চলতে গিয়ে বাস-এর নিচে প'ড়ে মারা গেল, যদু মধু বিধু সিধু একই কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে চলবে মঞ্চে বা রেডিওতে। রসিক হ'লেই কেবল পারে মানুষ মনকে উচ্চকিত করতে উল্লসিত করতে—দৈনন্দিন একঘেয়েমিকে পাশ কাটিয়ে সোজা রসের ঝর্ণার নাগাল পেয়ে আনন্দের বান ডাকিয়ে দিতে।

শহীদ সুরবর্দি ছিল এই জাতের বিরল মনীষী—খাঁটি রসিক। যেখানেই যাবে শুধু তার উপস্থিতিতেই লুপ্ত হ'ত সব দৈনন্দিন ধূসরতা—এক আশ্চর্য শ্যামলতা, নবীনতা ফুটে উঠত তার ব্যক্তিরূপের সরসতায়, হাসিতে, প্রীতিস্পর্শে।

তার সঙ্গে আমার আলাপ হয় দৈবাৎ নয়। সে আমার সাঙ্গীতিক নামডাক শুনে অনেক খোঁজখবর নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। নিজের পরিচয় দিল—Moscow Kuenstler Theater এর regisseur অর্থাৎ প্রযোজক।

আমি তো শুনে থ। ভারতীয়—তার উপর ভেতো বাঙালী বিখ্যাত রুষ মঞ্চের প্রযোজক!! বার্লিনে তখন মস্কো মঞ্চের জয়জয়কার। এর ওর তার মুখে শুনতাম ডস্টয়েভস্কির ব্রাদার্স কারামাজভ, চেকভের চেরি অরচার্ড আরো নানা রুষ নাটক দেখতে বিষম ভিড় জমে। দুদিনেই টিকিট সব নিঃশেষ। কিন্তু রুষ ভাষায় অভিনয়! কী বুঝব—ভেবেই যাই নি। শহীদ হেসে বলল: "কেন মূক ছায়াছবি কি দেখতেন না কখনো? রুষদেব অভিনয়ই যথেষ্ট, ভাষাজ্ঞান্ নাই থাকল।" বললাম: "আচ্ছা তাহ'লে যাব একদিন দেখতে ডস্টয়েভস্কির ব্রাদার্স কারামাজভ—যা প'ড়ে আইনষ্টাইন বলেছিলেন "উপন্যাসের গৌরীশঙ্কর"।

"স্বাগতম্" বলল শহীদ মিষ্টি হেসে, "কিন্তু শুধু আপনাকে থিয়েটার দেখাতে আমি আসি নি। রবীন্দ্রনাথের King of the Dark Chamber আমরা অভিনয় করব রুষভাষায়—আপনাকে তার সঙ্গীতসঙ্গত রচনা করতে হবে।"

আমার গায়ে কাঁটা দিল! এ-জগদ্বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে আমি সঙ্গীততরঙ্গ বহাব!—একি ভাবা যায়! শহীদ খুশী হ'য়ে আমাকে দিল শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনের অনুবাদ। কিন্তু হা অদৃষ্ট! আমার সস্তায় কিস্তি মেরে যশস্বী হওয়া হ'ল না। রবীন্দ্রনাথের নাটকটি অভিনীত হ'ল না।

কিন্তু ক্ষতিপূরণ হ'ল এই সূত্রে শহীদকে বন্ধু পেয়ে। দুদিনেই আমরা ভালোবেসে ফেললাম পরস্পরকে। ওর সাহচর্যে রসিকতায় জীবনস্মৃতির বর্ণনায় কাব্যসম্বন্ধে মন্তব্যে বিশেষ ক'রে রুষদেশের সংস্কৃতির স্তবগানে ও মাতিয়ে তুলল আমাকে। ওর সঙ্গে প্রায়ই এক সঙ্গে লাঞ্চ খেতাম, বা ডিনার। ও নানা পুরুষ ও ললনাকে দেখিয়ে

আমাকে বলত কে কোন্ জাতের মানব মানবী। দশবারো বৎসর য়ুরোপে রাশিয়ায় কাটিয়ে ও হয়ে উঠেছিল মানব চরিত্রের এক অন্তর্ভেদী ক্রিটিক। সবচেয়ে ও অপছন্দ করত ভড়ংকে। তাই প্রায়ই তীরন্দাজি করত আমাদের দেশের নানা সুসন্তানের মেকি প্রতিষ্ঠাকে। ওর কাছে সত্যি শুনে থম্‌কে যেতাম সময়ে সময়ে: একি ব্যাপার!—অমুক দেশের দশের একজনের স্বর্ণদীপ্তি আসলে নিছক গিল্টি! অমুক দেশনায়কের দেশভক্তি প্রেম মুখের কথা! অমুক নামজাদা সাহিত্যিকের ধুমধড়াক্কা সবই অসার—সস্তা প্যাঁচ!

কিন্তু খাঁটি মানুষকে ও মান দিত সাগ্রহেই কেবল বলত: "দিলীপ ভাই, খাঁটি মানুষ জগতে বেশি মেলে না জেনো।"

ওর কাছ থেকে ওর জীবনস্মৃতি শুনতে শুনতে সময় সময় মনে হ'ত যেন ফিরে গেছি অতীত যুগে—যে-যুগে রোমান্স ঘটত পদে পদে। কতরকম অভিজ্ঞতাই যে ওর হয়েছিল—বলত ও ফলিয়ে। একটির কথা শুধু বলি এখানে।

পঁচিশ

ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চার পাঁচ বৎসর ছিল রুষদেশেই আটক। সময়ে সময়ে অনশনে কাটত। সে-সময় ওর এক বান্ধবী মাদাম জার্মানোভা (খ্যাতনামা অভিনেত্রী) ওর অন্নদাত্রী হ'য়ে ওকে বাঁচান। তাঁর কাছে ও কৃতজ্ঞ ছিল বরাবর—পরে যখন ১৯২৭ সালে পারিসে আসে তখন তাঁকে তথা তাঁর স্বামিপুত্রকে ওই বাঁচিয়ে রেখেছিল। ঋণশোধ। "না দিলীপ", বলত ও, "সে-ঋণ শোধ হবার নয়।" কিন্তু ফিরে যাই বার্লিন পর্বে।

বার্লিনে আমার যে-কয়টি বন্ধু বান্ধবী লাভ হয়েছিল তাদের মধ্যে শহীদের সঙ্গেই আমার বেশি সময় কাটত—আর কাটত হু হু ক'রে। কারণ শহীদ ছিল শুধু বন্ধু নয়, তার উপর কথক' সর্বোপরি রসিক। ওর রসিকতার দুএকটি নমুনা দিই।

বার্লিনে তিনটি রুষ সুকুমারীর ওখানে আমার ছিল অবাধ গতিবিধি। তাদের সঙ্গে ওলগার সঙ্গে ও শাপিরোর সঙ্গে আমার কথালাপ হ'ত মূলতঃ ফরাসীতেই—যদিও কখনো কখনো জর্মনেও হ'ত। তবে জর্মনে নানা প্রতিশব্দ হাৎড়ে না পেলে আমাকে ফরাসী ধরতে হ'ত ব'লে ফরাসীতেই আমি বেশি আলাপ করতাম। এদের সঙ্গে শহীদের আলাপ করিয়ে দিয়ে সে এক মহা বিপদ—শহীদ ওদের সঙ্গে রুষভাষায় আলাপ করতে উজিয়ে উঠত, আমি থেকে যেতাম ক্ষুণ্ণ বিহ্বল [illegible]মাত্র। তবে শহীদ দরদী তো—একটু বাদে ফিরে আসত জর্মন ভাষায় বা ফরাসী ভাষায় আলাপ করতে রুষ ভগ্নীত্রয় আমাকে বলত সোচ্ছ্বাসেই যে,শহীদ খাস সাহিত্যিক ভাষায় কথা কয়। হবে না? -সব দেশেই রঙ্গমঞ্চের ভাষাই হ'ল খতিয়ে শিখরচারী। শহীদ রুষ ভাষায় তালিম নিয়েছিল নট নটীর কাছেই তো।

একদা ওরা শহীদকে ও আমাকে চা-র নিমন্ত্রণ করে। (সচরাচর আলাপ চলত চা-যোগে রুষ সামোভার সঙ্গতে) শহীদের অভ্যুদয় হয় একটু 'লেট'-এ। ওর হাজারো বন্ধু বান্ধবী তো—প্রায়ই দেরি হ'ত। বড় বোন সুকুমারী মিনা পের্লেমান সাভিমানে অনুযোগ করল: "Vous êtes en retard, mon cher! Ici, en Europe, il faut être ponctuel." শহীদ অম্লানবদনে এক গাল হেসে জবাব দিল: "Mais ponctualité c'est le commecement de matérialism, voyons!" (কিন্তু প্যাংচুয়ালিটি থেকেই যে বস্তুতান্ত্রিকতার শুরু, মাদমোয়াসেল) ওরা হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলল—এমন রসিকের সাত খুন মাপ।

অতঃপর শহীদ আত্মক্ষালনার্থে বলল (ফরাসী ভাষাতেই) "মাদমোয়াসেল! আপনি নিজামের হায়দ্রাবাদে যদি যেতেন দেখতেন তারা কী আধ্যাত্মিক—প্যাংচুয়ালিটির

ধারও ধারে না। বলি শুনুন সেখানে মানুষ কী ভাবে কাল কর্তন করে চিরন্তনের এলাকায়।

"সে সময়ে আমাকে বাহাল করা হয়েছিল এক মস্ত ইংরাজ ওমরাওয়ের দেখাশোনা করতে। তিনি যাবেন এলোরা দেখতে। ট্রেন ছাড়বে সকাল নটায়। আমি তাঁকে বললাম: 'ব্যস্ত হবেন না—লাঞ্চ সেরে গেলেই চলবে।"

'সে কি?'

'হায়দ্রাবাদের ট্রেন কদাচ সময়ে রওনা হয় না—লেট থাকেই থাকে।'

'তা কখনো হয়? যদি আজ ঠিক সময়ে ছাড়ে?'

'অসম্ভব।'

'না না। আমি ঠিক সময়েই যাব।'

"আমার কথায় কান না দিয়ে গেলেন তিনি স্টেশনে। যেই নটা বেজেছে—গার্ড শিষ দিল। ট্রেন চলল। ইংরাজ মহোদয় তাঁর কামরা থেকে গলা বাড়িয়ে আমাকে শাসিয়ে বললেন:

'কেমন? বলি নি। ট্রেন ছাড়ল তো ঠিক ন-টায়ই—কাঁটায় কাঁটায়।'

"আমি হেসে বললাম: 'না স্যার—এ কালকের ট্রেন।"

ভগ্নী এয়ী তো হেসে গড়িয়ে পড়ে।

* * *

একদা শহীদ ও আমি ড্রেসডেনে পাহাড়ে উঠছি। চারদিকে তুষার।

আমি বললাম: "কোথাও রেস্তরাঁ আছে কি শহীদ? কাউকে জিজ্ঞাসা করো না ভাই।"

ও বলল: "এদেশের লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করা বৃথা।"

"সে কি?"

"শোনো বলি। একবার আমি পরিব্রাজক হয়ে পদব্রজে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। জঠরে অগ্নি জ্বলছে। কোনো রেস্তরাঁ না পেলে ধড়ে প্রাণ থাকবে না। এক পথিককে শুধালাম:

"মাইন হের! এখানে কি কোনো রেস্তরাঁ আছে বলতে পারেন?"

সে থেমে আমায় বলল: "আপনি কি রেস্তরাঁ চান না হোটেল?"

আমি বললাম: "আমি ক্ষুধার্ত—হোটেল হ'লেও হয়, রেস্তরাঁ হ'লেও হয়।"

সে বলল: "জানি না, মাইন হের!"

এমনি সরস ছিল ওর কথা। আর গল্পের পুঁজি অফুরন্ত। আমি একদিন ওকে বলেছিলাম: "ভাই তুমি ভাগ্যবান্—যেখানেই কেন যাও সবাই আদর করবে এমন বহুভাষী কথকের।"

ও হেসে বলেছিল: "Es ist nicht alles gold, was glaenzt, mein Optimist*! জানো না তো কথকের কী দুরবস্থা হয় সময়ে সময়ে! একবার আমাকে টেবিলে বসিয়ে দিল—ডানদিকে মেক্সিকোর চর্ম বণিক, বাঁদিকে আরবী মোল্লা। আমাকে কথা চালাতে হচ্ছে এর সঙ্গে স্পানিশে, ওর সঙ্গে ফরাসীতে!"

কিন্তু এ-ধরণের কথা বলত ও আদর কাড়তেই বলব। কারণ কোথাও ওকে অবজ্ঞাত কি অনাদৃত হ'তে দেখিনি। ওর কথাবার্তা, প্রাণশক্তি, সমালোচনা, পরচর্চা সব কিছুর মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠত এক আশ্চর্য রূপদক্ষতা। যা-ই বলবে তার মধ্যে দিয়েই ঝিকিয়ে উঠবে আনন্দের আলো। এককথায় আনন্দময় পুরুষ।

অথচ জীবনে সে দুঃখ পেয়েছে কম নয়। আর যেমন তেমন দুঃখ নয়, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

অক্সফোর্ডে গিয়ে সে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, ফার্স্ট ক্লাস বোধ হয় পায় নি। কী তার বিষয় ছিল তাও মনে নেই। তবে মনে আছে সে বলত—কবিতাই ছিল তার প্রথমা প্রিয়া, first love. কিন্তু এ-প্রেমকে সে বরণ ক'রেও ধারণ করতে পারে নি। উত্তর যৌবনে সে আর কবিতা লিখত না। তার একটি চিঠিতে আমাকে ইংরাজীতে লিখেছিল (অনুবাদ আমার): "শ্রীঅরবিন্দ আমার কবিতা সম্বন্ধে [শ্রীঅরবিন্দকে আমি শহীদের মাত্র দুটি ইংরাজী কবিতা পাঠিয়েছিলাম আমার বাংলা অনুবাদ সহ] যা বলেছেন আমি সাগ্রহেই পড়েছি। কিন্তু তিনি কী জানবেন —আমার প্রেরণা কি রকম তন্বী ছিল, আমার কলাকারু কি রকম সস্তা। আমি ইচ্ছে করলে এরকম কবিতা আরো অনেক লিখতে পারি মিলে ছন্দে নিখুঁৎ—যেমন আর সকলে লেখে। কিন্তু সে-সব কবিতার উৎস কী শুনবে?—আমার সাহিত্যিক সংস্কৃতি—literary culture—কোনো গভীর আন্তর উপলব্ধি নয়। হয়ত কখনো অনুভব করেছি একটা আবছা তৃষ্ণা, আধফোটা আশা, ঈষৎ দর্শনের মোহ—তার বেশি কিছু নয়। অথচ তবু থেকে থেকে দেখি আমি হঠাৎ ব'সে গেছি কবিতা লিখতে—জানি না কেন। কীজন্যে আমি লিখি? আমার মধ্যে এমন কোনো তাগিদই তো নেই যাকে ছন্দে রূপ না দিলেই নয়।...তবেই দেখ ভাই, আমি কী এক অদ্ভুত এ-ও-তার তাল পাকানো চীজ (You see what a brute matiere of sensations experiences, longings and thoughts I am.)‡

*যা চকচক করে তা-ই সোনা নয়, হে উচ্ছাসী।

‡পুরো চিঠিটি আমার একটি ইংরাজী স্মৃতিচারণে ছাপা হয়েছে।

ছাব্বিশ

কিন্তু শহীদ অত্যুক্তিপ্রিয় ছিল স্বভাবে, তাই নিজের কাব্যকৃতিকে প্রায়ই এভাবে অপদস্ত করত। শ্রীঅরবিন্দকে আমি যে দুটি কবিতা পাঠিয়েছিলাম তার একটি এখানে উদ্ধৃত করি—এটি ও আর একটির অনুবাদ (মূল সহ) আমার অনামিকা সূর্যমুখীতে ছাপা হয়েছে।

You will not rue me
When I am dead;
Like a careless flower,
Dropped from your head.
But on some stormy day,
By some firelight hour,
I will stir in your soul
Like an opening flower.
You will smile and think
And let fall your book,
And bend over the fire
With a far-off look.

ব্যথা তুমি আজ পাবে না—যখন
মরণান্তে যাব আমি ঝ'রে
কুন্তল হ'তে তোমার অনাদৃত
ক্ষণফুলের ম'তই ধুলার 'পরে।
কিন্তু পরে, আমি কোনোদিন
প্রদীপজ্বালা ঝড়ের গোধূলিতে
চিত্তে তোমার লাজুক কলির ম'তই
মেলব আমার দলগুলি নিভৃতে।
মৃদু হেসে বইটি রেখে দেবে,
আমার কথা পড়বে তোমার মনে,
হয়ত দীপের দিকে চেয়ে রবে
সেদিন সুদূর আনমনা প্রেক্ষণে।

এ-কবিতাটি, আর একটির সঙ্গে, শহীদ আমাকে দিয়েছিল বার্লিনে, আমার কাছে কথা আদায় ক'রে যে, কাউকে দেখাব না। ওকে আমি প্রায়ই টুকতাম ওর এই

অত্যধিক স্পর্শকাতরতা নিয়ে। বলতাম: "এতো চমৎকার কবিতা! দেখাতে বারণ করছ কেন শুনি?" ও কী উত্তর দিত ভালো মনে নেই, তবে নিজের কাব্যকৃতিকে ছোট করতে যেন ও একটা নিষ্ঠুর (sadistic) আনন্দ পেত। তাই আমার এ দরদী অনুযোগে ও কর্ণপাত করত না। বলত এ সবই কথা নিয়ে খেলা। বলত শ্রেষ্ঠ কবিতা সে-ই যার প্রতি চরণটি একটি আন্তর অনুভবের রূপায়ণ। বীজ যেমন ফুল হ'য়ে ফোটবার আবেগকে বহন না ক'রে পারে না, তেমনি আবেগ অন্তরে আবির্ভূত হ'লে তবেই সে সার্থক কবিতার প্রসূতি হয়। যে-কবিতায় মাত্র সুন্দর সুন্দর কথার শোভাযাত্রা দেখতে পাই সে কবিতার শিল্পকারু নিখুঁৎ হ'লেও কবিতার পদবী তাকে দেওয়া চলে না। পিতৃদেবের একটি কবিতা ওর কাছে উদ্ধৃত ক'রে পূর্ণ সাড়া পেয়েছিলাম:

কাব্য নয়ক ছন্দোবন্ধ, মিষ্ট শব্দের কথার হার,
কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার সে তো শুদ্ধই শব্দসার।

কিন্তু এখানে ওর সঙ্গে আমার মতৈক্য হ'লেও ও যখন বলত প্রেরণা ষোলো আনা নিখুঁৎ না হ'লে কবিতা লেখা বৃথা—তখন আপত্তি করতেই হ'ত। অনেক চমৎকার কবিতারই প্রকাশ অনবদ্য নিটোল নয়। হয়ত একটি স্তবক অপূর্ব, তার পরের স্তবকে প্রেরণা তেমন দুর্নিবার নয় কিন্তু তবু সব জড়িয়ে কবিতাটি রসোত্তীর্ণ হ'তে পারে। বারো আনা রসসৃষ্টি হ'লে ষোলো আনাই রসসৃষ্টি নামঞ্জুর হ'তে পারে না।

কিন্তু শহীদ এখানে ছিল অনমনীয়—তাই ওকে আমি প্রায়ই hypercritical নাম দিয়ে বলতাম: "না ভাই, সমস্তটা না পেলে সমস্তটাই ছাড়ব তোমার এ-ধনুর্ভঙ্গ পণে আমার মনের সায় নেই। যেমন ধরা যাক আমি ছিলাম হারীনের কবিতার ভক্ত। ও বলত: "ও কবিতাই হয় নি—শুধু pose, ত্রিভঙ্গঠাম। ছন্দে সিদ্ধি লাভ করলে ওরকম কবিতা কে না লিখতে পারে?" আমি বলতাম রাগ ক'রে: "তোমার এ বাড়াবাড়ি। হারীনের বারো আনা কবিতা রসোত্তীর্ণ হয় নি ব'লে ওর যে-চার আনা রসাল ফুল ফুটিয়েছে তার মূল্য কমে না।" কিন্তু ওকে বাগ মানাবে কে? তবে ওকে সাধুবাদ না দিয়ে পারতাম না যখন দেখতাম ও যে-কঠোর নিরিখে অপরের কবিতাকে বাতিল করত নিজের কবিতার সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি নিষ্ঠুর ক্রিটিক ছিল। কিন্তু এ-গোঁ-কে আমল দেওয়ার ফলে ও কবিতা লেখা ছেড়ে দিলে এজন্যে আমি খেদ করলে ও বলত হেসে: "ভাই স্নেহ করো আমাকে এ-জন্যে আমার আনন্দ হয় সত্য, কিন্তু সে স্নেহের ফলে আমার নিকৃষ্ট কবিতাকে 'উৎকৃষ্ট' বলতে চাইলে আমি আপত্তি করবই করব।"

কিন্তু ওর একটি কবিতা ও আমাকে দিয়েছিল যেটি কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

শ্রীঅরবিন্দকে যখন এ কবিতাটি পাঠিয়েছিলাম বহু বৎসর পরে তখন তিনি এর প্রশংসা করেছিলেন মুক্তকণ্ঠেই। কবিতাটি ও লিখেছিল কালি দিয়ে নয়—হৃদয়ের রক্ত দিয়ে। তাই এর উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এর মূল ইংরাজীটি আমার "অনামিকা-সূর্যমুখী" তে ছাপা হয়েছে তাই উদ্ধৃত করলাম না। আমার বাংলা অনুবাদটি আমার নিজের বিশেষ ভালো লেগেছিল, তাই আশা করি পাঠকদেরও লাগবে—কবিতাটির নাম : কৃপাই—

যে-তৃষার্ত পা-স্থ মরুভূর খরদাহে
একবিন্দু জল তরে চারিদিকে ধায় ;
যে ক্ষুধিতে নিয়তির অলংঘ্য বিধান
করে প্রসারিত কর দুটি অসহায় ;
ছুটে এসে যে তোমার চরণ চুমিতে
দেখে হায়—সব শেষ, উত্তীর্ণ লগন,
শ্রীচরণে রক্তশূল, শোনে যে তুফানে
"রক্ষা নাই আর"—গায় প্রমত্ত পবন ;
বিনিঃসঙ্গ নিশীথে যে আচ্ছন্ন তন্দ্রায়
স্বপ্ন দেখে নিরাশায় গহন হিয়ায়
শ্যামল ক্ষেত্রের, কুসুমিত নন্দনের,
জাগিয়া পারে না তবু কাঁদিতেও হায় ;
আঁধারের নিগড় যে পারে না কাটিতে
তোমার অসিরও চেয়ে তীক্ষ্ণ বেদনায় ;
অন্যায় রণে যে মানে হার—কৃপা তব
ঝরায়ো সবার 'পরে অঝোর ধারায়।
সকলেই তারা হতভাগ্য—মানি, তবু
এ-মিনতি শ্রীচরণে—ভুলিও না তারে
বহে যে নিষ্ফল প্রেমভার, আমরণ
প্রাণবেদিকায় দায়িতার প্রতিমারে
পূজি,' অবশেষে দেখে—প্রিয়তমা তার
প্রগল্‌ভা চপলা, তার অধর মধুর
নয় ঐকান্তিকা, হে দয়াল, বরষিও
কৃপা তব সে-দুর্ভাগা শিরে—যে বিধুর
সেই স্বৈরিণীরই স্মৃতি জপে যন্ত্রণায়,
সে-বিশ্বাসহন্ত্রীর—যে আদরে আদরে

ভুলায়ে হরিতে শেষে উন্মুখ হৃদয়-
অর্ঘ তার দলি' পদে যায় হেলাভরে।
অভাজন হ'তে সেই অভাজনে দিও
পরশ কোমলতম তোমার হে প্রিয়!

শ্রেষ্ঠ কবিতায় আত্মজীবনীর বীজই ফুল ফোটায় একথা কবি মাত্রেই জানে। এমার্সন অকারণ লেখেন নি :

"The poet writes from a real experience : the amateur feigns one. Talent amuses, but if your verse has not a necessary autobiographical basis, though under whatever gay poetic veils, it shall not waste time."

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে এমার্সনের এ-নিশ্চয়োক্তিটি প'ড়ে আমার হৃদয় সাড়া দিয়েছিল, বলেছিল—যথার্থ কবিতার সংজ্ঞা এই-ই বটে। মন আমার এমনই দুলে উঠেছিল যে, আমি এর ভাবানুবাদ করেছিলাম গদ্যে নয়, কবিতায় :

প্রতি রক্তবিন্দু দিয়া লভিয়াছে যারে হিয়া—আঁকে তারে কবি :
কবি চিত্রী নহে যারা—আবেগের ভানে তারা রচে কাব্য, ছবি।
চঞ্চল মনীষা হায়, ক্ষণিক প্রমোদ চায়। কোথা বলো তার
প্রাণের সাধনাদীপ্তি অচঞ্চল সত্যভিত্তি—গৌরবী দুর্বার?
তব সৃষ্টিতলে যদি তোমার জীবননদী না বহে উচ্ছল,
তবে শুধু রঙ্গগানে মঞ্জরিবে কবি প্রাণে পল্লব পুষ্পদল?

"রূপাই" কবিতাটি শহীদ কেন কোথাও প্রকাশ করে নি কল্পনা করা কঠিন নয়: এর প্রতি চরণ সে লিখেছিল তার হৃদয়ের রক্ত দিয়ে। এটি কবিতা তথা আত্মজীবনী। গভীর ঘা খেয়ে লেখা। প'ড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ বিশেষণ দিয়েছিলেন Poignant—যার বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ও একটি মেয়েকে গভীর ভাবে ভালোবেসেছিল। সে ওকে খেলিয়ে কাছে টেনে দূরে ঠেলে। প্রথম যৌবনের প্রেমে বিশ্বাস ক'রে ওর স্বপ্নভঙ্গ হয়। তখন ও পণ নেয়—কাপুরুষের মতন হাহাকার না ক'রে নিজের প্রতিভাকে রূপসৃষ্টির কাজে নিয়োগ করবে। রুষদেশে গিয়েছিল রুষবিপ্লবের সময়। চার পাঁচ বৎসর ছিল সেখানে। রুশ ভাষা এত ভালো শিখেছিল যে, অনর্গল ভাষণ দিতে পারত। সেখানে প্রতিভাধর যুবক মোড় নিল রঙ্গমঞ্চের দিকে ও প্রতিভাবলে মস্কো আর্ট থিয়েটারে পেল মানী শিল্পীর পদ—régisseur—প্রযোজক।

কিন্তু ওর ললাটলিপিতে বিধাতাপুরুষ সুখশান্তি লেখেননি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।

বাধল বলশেভিক বিপ্লব। ওর ভালো লাগে নি বলশেভিকদের নিষ্ঠুরতা। অসাবধানে ব'লে ফেলত একথা একে ওকে তাকে। তার উপর হ'ল আর এক সাংঘাতিক যোগাযোগ: যে-মহিলা লেনিনকে নিশানা ক'রে গুলি ছুঁড়েছিলেন তার সঙ্গে ওর আলাপ ছিল। ফল যা হবার—ওর প্রাণ নিয়ে টানাটানি চেকা পুলিশ ওর পিছু নিল। ছদ্মবেশে কোনোমতে পালিয়ে এলো ইস্তাম্বুলে। কিন্তু পাসপোর্ট নেই দেখে তারা ওকে এক বৎসর হাজতে রেখে দিল। এসব কথা আমার ওরই মুখে শোনা, তবে পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা তো, কিছুটা ভুল হ'য়ে থাকতে পারে। তবে ওর একটা কথা মনে পড়ে যা অবিস্মরণীয়। ও বলেছিল আমাকে:

"জানো দিলীপ, আমার মনে হয় প্রত্যেক মানুষকে কিছুদিনের জন্যে একা হাজতে বন্দী ক'রে রাখা ভালো। কেন জানো? সভ্য মানুষের এক মহা যন্ত্রণা তার দায়িত্বজ্ঞান। যা করছি আমার যোগ্য তো—না তামসিক আলস্য? একমাত্র জেলেই আমরা রেহাই পাই বিবেকের তিরস্কার থেকে—কেন না সেখানে আমার কোনো স্বাধীনতাই নেই, আমি একেবারে ষোলো আনা জেলরক্ষীদের তাঁবে। প্রতিপদে তাদের ইচ্ছায়ই চলতে হবে আমাকে। তোমাদের গীতায় একবার পড়েছিলাম ভগবান্ মানুষের হৃদয়ে লুকিয়ে থেকে অদৃশ্য তারের টানে তাকে নাচান—যদিও সে নিজে ভাবে—সে নাচছে স্বেচ্ছায়ই। জেলরক্ষীরা কতকটা এই ভগবানের মতন, কেবল অদৃশ্য নন এই যা। কী খাব, কতবার বাইরে টহল দেব, কী পড়ব, সপ্তাহে কটা চিঠি লিখতে পারব—সবই ধরা বাঁধা—তাঁদের মর্জির আমি হুকুমবরদার। ফলে মন হাল ছেড়ে দেয় বলে: আঃ, বাঁচলাম—আমার আর কিছু করবার নেই। তাই ঘোরা যাক ঘানি গাছের চারদিকে চোখ বাঁধা বলদের ম'ত।..." ইত্যাদি।

আমি একটু ফলিয়ে বললাম, তবে ওর মোদ্দা কথাটা ছিল এই-ই বটে: যে, দায়িত্বজ্ঞান আমাদের অন্তরে জাঁদরেল বিবেক নাম নিয়ে আমাদের ঘুরিয়ে মারে। একটি উর্দু গজলে আছে:

বৈঠনে দেতা নহী দমভর কিসীকো চৈনসে
দরবদর হমকো ফিরাতা হৈ, য়হ আখির কৌন হৈ?

অর্থাৎ

দুদণ্ডও থাকতে যে না দেয় আমাকে শান্তিতে
ঘুরিয়ে মারে চারদিকে হায়—কে সে, কেমন, কে জানে?

কবি অমজদ এ-সূত্রে ইঙ্গিত করেছিলেন যে এঁরই নাম আল্লা—ভগবান্। কিন্তু ভগবানের বিকল্প রূপ বিবেককেও এ-অদৃশ্য নিয়ন্তার পদে বরণ করা চলে।

ভালোই হ'ল ভগবানকে ডাক দিয়ে। শহীদকে আমি বলেছিলাম ভগবানকে দর্শন করা যায় একথায় আমি বিশ্বাস করি। ও আমাকে গভীর স্নেহ করত তাই ওর সদাসংশয়ী মনের বলিষ্ঠ যুক্তি তর্ক ফেঁদে আমাকে নাজেহাল করে নি। ভগবান সম্বন্ধে ওর মনোভাব যে ঠিক কী ছিল আমাকে কোনোদিনই খোলাখুলি কিছু বলে নি। তবে একটি কথা বলত যা ভুলবার নয়: যে, ভগবানের কাছ থেকে যা মেলে তা ইন্দ্রিয়জগতের অভিজ্ঞতার চেয়ে যদি কম বাস্তব হয় তবে ও চায় না, চায় না, চায় না। কংক্রীট শব্দটি ছিল ওর অতি প্রিয়। তাই বলত: "ভগবানের কাছ থেকে ছোটখাটো প্রসাদে তুষ্ট হয়ে নিজেকে ঠকিও না। যিনি মনের প্রাণের নিয়ন্তা তাঁর কাছ থেকে মনের প্রাণের প্রত্যক্ষ—কংক্রীট—খোরাক না পেলে সব ছায়াবাজি।"

বহু বৎসর পরে যখন আমি সব ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দের চরণে আশ্রয় নিই তখন ও সর্বপ্রথম আমাকে দুটি পত্রে লিখেছিল ওর অন্তরের কথাটি যা (ও লিখেছিল) ও আর কাউকেই কখনো বলে নি। ওর গভীর স্নেহের ওই পরম পুরস্কার আমি সাদরে গ্রহণ করেছিলাম, আরো এই জন্যে যে তা থেকে আমি লাভ করেছিলাম কম নয়।

ও আশ্চর্য ভালো ইংরাজী লিখত। কিন্তু ওর এ-দুটি চিঠির অনুবাদ করা সহজ নয়। অথচ এত বড় ইংরাজী চিঠির উদ্ধৃতি বাংলা লেখায় অশোভন। তাই চেষ্টা করি ভাবানুবাদ দিতে—পরিশিষ্টে মূল পত্র দুটি পেশ করা যাবে।

ও হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্র) থেকে আমাকে লিখেছিল ১৯৩২ সালে জানুয়ারি মাসে:

প্রিয় দিলীপ,

আমাদের বন্ধু নীরেন তোমার চিঠিটি আমাকে দিয়েছিল যথাকালে। যদি প্যারিস রওনা হবার আগে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'ত তাহ'লে বড় ভালো হ'ত। কারণ তাহ'লে আমি তোমাকে খুলে বলতাম আমার কাব্য সম্বন্ধে নানা ধারণা কি ভাবে বদলে গেছে ও কতখানি। যতই দিন যাচ্ছে ততই আমার মনে হচ্ছে যে, কাব্যের বাক্‌সম্পদ আমাদের অন্তরের এক গভীর সংযমকে স্ফুট করলে তবেই কৃতকৃত্য হয়। তুমি শ্রীঅরবিন্দকে আমার যে কবিতাগুলি পাঠিয়েছিলে তাদের সম্বন্ধে তিনি কী বলেছিলেন তুমি আমাকে জানাতে কুণ্ঠিত হ'লে কেন? তুমি কি আমাকে

এত কম জানো? তোমার কি মনে নেই—আমি সর্বদা আত্মবিশ্লেষণ করতে চাইতাম কী নিষ্করুণভাবে? কেউ যদি আমার কবিতার ত্রুটি দেখিয়ে দেয় আমি কৃতজ্ঞ হব না এ কি সম্ভব—বিশেষ ক'রে শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাজনের সমালোচনা? তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যাদের মিল নেই তারাও কি স্বীকার করে না যে এ-দেশের তিনি একজন মহাপুরুষ?

এবার তোমার চিঠির উত্তরে আমার যা বলবার আছে বলি। ভেবো না আমি তোমাকে উপদেশ দেবার অধিকারী—যে-আমি এক হিসেবে নিরঙ্কুশই বলব। কিন্তু আমি তোমাকে বলতে পারি বন্ধুভাবে (যে—আমি জীবনে অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে গেছি) যে, যেসব কিছুর তেমন মূল্য নেই আমাদের কাছে সে-সব ত্যাগ করা তত কঠিন নয় যেমন কঠিন সেই সব পাপ ত্যাগ করা যাতে আমরা আসক্ত।··· আমাকে ভুল বুঝো না: আমি নিজেকে কোনো দিনই একজন আদর্শ পুরুষ ভাবি নি—আমি নিজেকে জানি তো। তাই তোমার মতন স্নেহময় বন্ধুর চোখের আয়নায় আমি নিজের রূপের খবর নিই না, কেন না আমি জানি যে, তোমরা আমাকে ভুল ভেবেই এত বড় মনে করেছ। কিন্তু তবু আমার ভাঙা জীবনেও আমি ধীরে ধীরে কোনো কোনো ইষ্টার্থে (values) পৌঁছচ্ছি—যেমন ক'রেই হোক। আমি শুধু সেই কথাই আজ কিছু বলতে চাই, যদিও আমি সত্যিই চাই না তুমি আমার নানা মূল্যায়নকে বেশি বড় ক'রে দেখ। আমার বক্তব্য হোক শুধু বন্ধুর কাছে বন্ধুর নিজেকে একটু খুলে ধরা।

সব আগে বলি—আমি তোমার চিঠির জন্যে তোমার কাছে কত কৃতজ্ঞ। তোমার আন্তর আনন্দের জন্যে তোমাকে আমার সত্যিই হিংসা হয়—যে-আনন্দ তোমার নাগালের মধ্যে এল শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসে।

তারপর আমার বক্তব্য এই যে, তোমার নবজীবনাদর্শকে আমি এতটুকুও খাটো করতে চাই নি। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম সেই প্রচ্ছন্ন আত্মবঞ্চনার কথা যে আবহমানকাল আমাদের সিদ্ধিকে সুলভ করতে চায়। কিন্তু তোমার এ-কথা খুবই ঠিক যে আমাদের স্বভাবের ছন্দ এক নয়। তাই তোমার নানা আত্মিক উপলব্ধির জটিল জগত সম্পর্কে আমার কিছুই বলবার নেই—কী ক'রে থাকবে যে-আমার মন নিজের পরিচয় পেতেই দিশাহারা হ'য়ে পড়েছে? আমার নিরাবেগ মন্থর ও রুক্ষ চেতনার কাছে সাধনার পথ এতই দুরারোহ মনে হয় যে আমি সন্দেহের চোখে দেখি শিল্পে বা জীবনে সেইসব উপলব্ধিকে যাদের সহজেই নাগাল পাওয়া যায়। আর বিশাল জীবনের সাম্রাজ্য রূপরাগের সীমিত সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক অনেক অনেক বড়। তাই আমি কোন্ মুখে অবিশ্বাস করব যাকে শ্রীঅরবিন্দ বর্ণনা করেছেন আত্মিক জীবনের প্রাণশক্তি ব'লে? আমি তো ঠিক এইজন্যেই শিল্প থেকে দূরে

স'রে এসেছি—শুধু শিল্প কেন তার চেয়ে মহত্তর অনেক কিছুর প্রতিও আমি বিমুখ হয়েছি এই একই কারণে। যাই হোক, আমি আজ শুধু তোমাকে বলতে চাই, বিশ্বাস কোরো, যে আমি তোমাকে ইতিপূর্বে যা কিছু লিখেছি, লিখেছি কেবলমাত্র একটি নিগূঢ় কামনায়—শুধু তোমাকে বলতে (যা আমার স্বভাব আমাকে বলতে দেয় না) যে, আমি গভীর স্নেহে তোমার প্রগতির দিকে চেয়ে থাকব—যে প্রগতি আমার কাছে চিরদিনই থাকবে (হায়) শুধু পদযাত্রা মাত্র, লক্ষ্যসিদ্ধি নয়।

কিন্তু কেমন ক'রে তুমি আমাকে ভুল বুঝলে বলো তো? আমি তেমন মূর্খ গর্বী নই যে সর্বদাই ভাবে সবাই তাকে ভুল বুঝছে। হা হতোঽস্মি, ভগবান্‌কে অনুভূতির মধ্যে ধরা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, তাঁকে ছোঁওয়া যায় তোমার এ-ঘোষণা আমার কাছে কেমন ক'রে অগ্রাহ্য হবে—যে-আমি চিরদিনই এ-সম্বন্ধে সচেতন? আর তোমার দৃপ্ত বিনয়—যে আমার মতন উচ্চশিক্ষিত এ-তত্ত্বকে স্বীকার করতেই পারে না? এ-জিগিরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে সে কবে। তোমার সরল উচ্ছ্বাসী মন যে-সত্যের পরিধির মধ্যে এসেছে সে-সত্য আমাদের মতন উদ্‌ভ্রান্ত বুদ্ধিমন্তদের নাগালের বাইরে। দিলীপ, তুমি এ-পথের তীর্থযাত্রী হয়েছ অল্প বয়সেই বলব—ভগবানকে ধন্যবাদ। কিন্তু যারা প্রাজ্ঞ দিশারিকে সহায় না পেয়ে পথ চলে শুধু তিক্ত চিন্তার বোঝা ব'য়ে—তাদের কথাও একটু ভেবো। কেন তুমি ভাবলে যে, যাঁকে তুমি পরম ভাগবত ব'লে চিনেছ তাঁকে গুরুবরণ ক'রে তুমি ধন্য হয়েছ—তোমার এ-অমূল্য অভিজ্ঞতা আমার কাছে নামঞ্জুর? আমার নিজের চোখে আমি অতি ছোট আমার এ-উপলব্ধিকে তুমি কেমন ক'রে সংশয়বাদ মনে ক'রে বসলে? কিন্তু ভুল বোঝাকে আমি দূষি না। বরং আমি মনে করি—ভুল বোঝার মধ্যে দিয়েই আমরা পরস্পরের মনের পটে ছাপ ফেলি। তোমাকে যেসব কথা আজ বলছি—যা আর কাউকেই বলতে পারতাম না—তার মূলে কি এই ভুল বোঝাই লুকিয়ে নেই? কে জানে?...আমি শুনে খুশী হয়েছি যে শ্রীঅরবিন্দ বছরে কয়েকবার সবাইকে দর্শন দেন। জীবনের অনেক কিছুই ঘটে সমুদ্রে পাথর পড়ার মতন—যে ফেলে সে-পাথর সে জানতে পারে না পাথরের ঘায় যে-সব বৃত্ত জেগে ওঠে তারা কোন তটে গিয়ে লাগবে।

শ্রীঅরবিন্দের "ভগবান্" কবিতাটি অতি সুন্দর। প'ড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি সত্যিই:

নিম্নে অগণন বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে তুমি তবু
ব্রহ্মাণ্ডের সমূর্ধ্বে আসীন।
কর্মী জ্ঞানী সম্রাটের নিয়ন্তা হয়েও তুমি, প্রভু,
ভক্তাধীন প্রেমে চিরদিন।

করো না তো ঘৃণা জন্ম লভিতে কীটেরো মাঝে নিতি,
তুচ্ছ কঙ্করেরো তুমি প্রাণ,
এ-অচিন্ত্য দীনতায় পাই তাই তব পরিচিতি
মহীয়ান্—তুমি ভগবান।

কখনো কখনো ছোট মনের মধ্যেও মহৎ মনের চিন্তা জেগে ওঠে: তাই আমিও তোমাকে এই দীনতার কথাই বলতে চেয়েছিলাম—এই humility-র যার চমৎকার ছবি ফুটিয়েছেন তোমার গুরুদেব। তুমি এমন গুরুর আশ্রয় পেয়েছ ভাবতে মন আমার আনন্দিত। নির্বিচারে তাঁর নির্দেশ মেনে চলবার চেষ্টা কোরো ভাই। শুধু সনাতন বেদ নয় হাফেজও লিখেছেন তাঁর Divan-এর প্রথমেই।

Colour the prayer-mat with wine
If the old man of the tavern tells you this,
Because the Teacher is not unaware
Of the way and the ways of the Goal.

ইতি। তোমার স্নেহাধীন শহীদ।

অতঃপর আমি ওকে কয়েকটি পত্র পাঠিয়ে দিই। তার মধ্যে একটি চিঠি ছিল কৃষ্ণপ্রেমের বাকি সব চিঠি শ্রীঅরবিন্দের। কৃষ্ণপ্রেম লিখেছিল (অনুবাদ আমার):

"তোমার 'শ্রীরাধা' কবিতাটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার কেবল একটি মন্তব্য আছে। আমার মনে হয় তুমি বড বেশি ঝুঁকেছ—বিশ্বজনীনতার দিকে। তুমি বলেছ আমাদের অন্তরাত্মা যে চায় পরমাত্মাকে তারই প্রতীক কৃষ্ণরাধার প্রেম। আমার মনে হয় এর উল্টোটাই সত্য: আমরা ভগবানকে ভালোবাসি এইজন্যেই যে, রাধা কৃষ্ণকে ভালোবাসেন, অর্থাৎ মানবিক ভগবৎপ্রেম আসলে কৃষ্ণরাধার পারস্পরিক প্রেমের প্রতীক বা প্রতিচ্ছবি।"

শহীদ এ-চিঠিগুলি প'ড়ে আমাকে লিখেছিল:

ভাই দিলীপ,

আমি শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব চিঠিগুলি বারবার পড়লাম। তোমার গুরুদেব কী চমৎকার দিয়েছেন আধুনিক মনের অকৃতার্থতার নিদান। এ-মন হ'ল মার্ক্স ফ্রয়েড

Thou who pervadest all the worlds below,
Yet sitst above!
Master of all who work and rule and know,
Servant of love!
Thou who disdainest not the worm to be
Nor even the clod,
Therefore we know in that humility
That thou art God. (Title of the poem is—*GOD*)

যুক্ত ও স্বপ্নবাদী বিশ্বমানবের জগা খিচুড়ি—উচ্ছ্বাসে অগাধ কিন্তু চিন্তায় বামন। য়ুরোপে যাঁদের আত্মিক উপলব্ধি হয়েছে তাঁরা এ-সব অর্ধসত্যকে বুদ্ধির কসরৎ ছাড়া আর কিছু মনে করেন না—কিম্বা বলা যেতে পারে বাজিকরের ভেল্কি, যে এ-জগতের ছায়াবাজির মঞ্চে এক গভীরতর ছায়াবাজির খেলা দেখায়। ··

রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে কৃষ্ণপ্রেমের মন্তব্যে আমি সত্যিই চমকে উঠেছি—যখন সে বলছে কৃষ্ণ রাধার দিব্যপ্রেমই মর্ত্য প্রেমের উৎস—এই এই এই—যাকে আমি তোমার কাছে বারবার বলতাম 'কংক্রীট'—অন্তরে বাহিরে। তোমার মনে থাকতে পারে আমি তোমার কাছে নানা ভাবেই বলতে চেয়েছি এই কংক্রীটের আধ্যাত্মিকতার কথা। কৃষ্ণপ্রেমের মতন আমিও বীতশ্রদ্ধ আমাদের সেই সব স্বদেশবাসীদের 'পরে যাঁরা প্রতিমাকে প্রতীক (symbol) ব'লে তার ওকালতি করেন। য়ুরোপকে এই ভাবে তাঁরা অজান্তে প্রণাম করেন ব'লেই আমাদের হিন্দু মহাকাব্যে পুষ্পকরথের উল্লেখ ক'রে বলেন আমাদেরও ছিল উড়োজাহাজ। এই লজ্জাকর আত্মসম্ভ্রমজ্ঞানের পাশাপাশি শ্রীঅরবিন্দের Behauptungen (Statement of a position) কী দীপ্ত, স্থির শান্ত প্রভায় উদ্ভাসিত, নয় কি ? · অপিচ শিল্প সম্বন্ধেও আমি শ্রীঅরবিন্দ ও কৃষ্ণপ্রেমের মতে সায় দিই : যে, শিল্প হ'ল অধ্যাত্ম অনুভূতির একটি আনুষঙ্গিক (by product) : শিল্পের ভর গতি ও ধ্বনির 'পরে কাজেই সে নাগাল পেতে পারে না সেই নৈঃশব্দ্য ও স্থৈর্যের যে সমস্ত ধ্বনি ও কাঁপনের উৎস।

শ্রীঅরবিন্দকে শহীদের এ চমৎকার চিঠিটি পাঠিয়ে দিতে তিনি আমাকে উত্তর দেন (১৭.৫.৩২ তারিখে) :

দিলীপ,

সুরবর্দি ঠিকই বলেছে আর বলেছে চমৎকার ক'রেই।···ভারতীয় apologist-রা পাশ্চাত্য বুদ্ধিমন্তদের দরবারে আমাদের আত্মিক উপলব্ধিদের 'প্রতীক' নাম দিয়ে যে-ভাষ্য করেছেন সেভাষ্য অতি দুর্বল। এতে ক'রে তাঁরা আমাদের তরফের কথার সাড়ে পনেরো আনা বিসর্জন দিয়েছেন, বাকি আধ আনাকে বাঁচাতে। এক হিসেবে, দেবদেবীদেরও প্রতীক বলা যেতে পারে। কিন্তু সে-হিসেবে দাঁড়ায় না কি যে, সব কিছুই প্রতীক যাদের মধ্যে পড়েন এই উকিলগুলিও, যদিও দুঃখের বিষয়, তাঁরা প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব ব'লে নিজেদেরকে জানান দিতে পারেন।"

বার্লিনে শহীদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিই যখন লুগানো-কনফারেন্সে সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আহূত হ'য়ে সুইজর্লণ্ড যাত্রা করি। (সে ট্রেনে আমার এক রুশ বন্ধুরও আমার সহযাত্রী হবার কথা ছিল কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত আসতে পারেন নি। তাঁর কথা পরে বলছি।) শহীদ স্টেশনে এসেছিল আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে। ট্রেনে উঠে ধারের বার্থে ব'সে গলা বাড়িয়ে দেখি সে ঠায় দাঁড়িয়ে। আমি ব'সে। কিন্তু ট্রেন

ছাড়তে পাঁচ সাত মিনিট দেরি করেছিল সেদিন। শহীদ হেসে বলল: Dilip, do you know what is the most awkward moment of a man's life?" আমি বললাম: "শুনি।" সে বলল: "যখন কোনো বন্ধু এক বন্ধুকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে—যখন এর ওকে তথা ওর একে যা বলার সবই বলা হয়ে গেছে, কিন্তু ট্রেন ছাড়ছে না।"

সাতাশ

শহীদের কাছে আমি প্রায়ই (বিশেষ ফাঁপরে পড়লে) ধর্না দিতাম নানা প্রশ্ন নিয়ে। চাইতাম ওর উপদেশ বা নির্দেশ। য়ুরোপীয় জীবনের সম্বন্ধে ওর গভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা আমার অল্পজ্ঞ মনকে সময়ে সময়ে সত্যিই অভিভূত করত। ও ফলিয়েই বলেছিল আমাকে কী ভাবে ও ছদ্মবেশে রিক্তহস্তে মস্কো থেকে পালায় চেকা পুলিশের হাত থেকে নিস্তার পেতে। কিন্তু সে সব বর্ণনা আমার কলমে সজীব হ'য়ে উঠবে না তাই শুধু বলি—ও ওলগার কথায় ষোলো আনা সায় দিয়ে আমাকে বারণ করেছিল মস্কো যেতে মানব রায়ের সঙ্গে। বলেছিল হেসে: "দিলীপ, তুমি সরল মানুষ, ওখানে গিয়ে কি বলতে কি ব'লে ফেলবে আর তার কি রিপোর্ট পৌঁছবে কর্তৃপক্ষের কাছে কে জানে? কেন সাধ ক'রে চুলকে ঘা করবে? তুমি গান শিখতে জর্মনিতে এসেছে—খুব বুদ্ধির কাজ করেছ—কারণ যদিও রাশিয়ানরাও সঙ্গীতে মহীয়ান্ কিন্তু রুশভাষা কঠিন ভাষা—তাই বেশি লাভ করতে পারবে না রুশ সঙ্গীত থেকে·· ইত্যাদি। আরো অনেক কিছু বলেছিল—তার চুম্বকটি এই যে মস্কোমুখী হ'লে আমাকে বিপন্ন হ'তে হবে। সে সময়ে পুলিশের প্রশাসন ছিল খুব কড়া—ফ্রাউ জার্মানোভার মুখেও শুনেছিলাম। শহীদ আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ডস্টয়েভস্কির "ব্রাদার্স কারামাজভ" অভিনয় দেখাতে—যাতে ফ্রাউ জার্মানোভা পার্ট নিয়েছিলেন স্বৈরিণী গ্রুশেনকা-র। হের কাচালভ—ইভানের। শহীদই আমাকে ফিশ ফিশ ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যার ফলে অভিনয় আরো উপভোগ করেছিলাম।

কিন্তু হা অদৃষ্ট, ওদের রবীন্দ্রনাথের নাটকটির অভিনয় করা হ'ল না, আমারও বার্লিনে কম্পোজার নাম কেনা হ'ল না।

* * *

এর পরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় ১৯২৭ সালে প্যারিসে—যখন আমি চেক ভাইস কনসাল ভ্লাদিমির ভানেক ও তজ্জায়া মার্থার অতিথি। সেখানে আমি একদিন মার্থার উপরোধে প'ড়ে পণ্ডিত জহরলালকে নিয়ে গিয়েছিলাম। মার্থা ছিল জহরলালের মহাভক্ত। শহীদের সঙ্গেও পণ্ডিতজির প্যারিসে দেখা হয়েছিল।

সে সময়ে মস্কো আর্ট থিয়েটার ফিরছে। ফ্রাউ জার্মানোভা তাঁর স্বামী পুত্র নিয়ে ছিলেন শহীদের ফ্ল্যাটে। তাঁদের রসদদার ছিল শহীদ একা। শুধু তাঁদের নয় তাঁদের দুটি কুকুরেরও। শহীদ কী যে ভালোবাসত বান্ধবীর কুকুর দুটিকে। আমি ওকে হেসে বলতাম: "ঠিকই হয়েছে! সাহেব পুরাণে আছে—love me, love my dog!" শহীদ হেসে উত্তর দিত ভলটেয়ারের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে: "না দিলীপ, ওদের আমি ভালোবাসি ওরা মানুষ নয় ব'লেই। ভলটেয়ার ছিলেন একজন

সত্যিকার জ্ঞানী, জানো তো!—যিনি উঠতে বসতে বলতেন : 'The more I see dogs the less I like men' হা হা হা!"

ফ্রাউ জার্মানোভা একদিন আমাকে খাইয়েছিলেন নানা রুশ রান্না—শুধু borsch আর pilav এই দুটি নাম মনে আছে। তবে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর সরলতায়। শহীদ কেন উদয়াস্ত খেটে এ-অতিথি পরিবারের অন্নসংস্থান করত বুঝতে বেগ পেতে হয় নি। যে-স্বৈরিণী ওকে বঞ্চনা ক'রে ওর মন ভেঙে দিয়েছিল তার কথা ওর মুখে শুনি নি কখনো, তবে ওর স্নেহময়ী বরেণ্যা অতিথি যে ওর ভাঙা মন জুড়ে দিয়েছিলেন তাঁর গভীর স্নেহে—ওদের অনবদ্য ménage a trois দেখলে এবিষয়ে সংশয় থাকত না।

বিচিত্র মানুষ বৈকি। কোথা থেকে কোথায় গিয়ে নানা ভূমিকম্পের পরেও যার পা টলে নি সে কেন আমাকে লিখল তার "ভাঙা জীবনের" কথা—আমি মাঝে মাঝে ভাবি। এর উত্তর কী তাও জানি অথচ ঠিক জানি না। তাই মুখে চাবি দিয়ে তার কাছে আমার ঋণ স্বীকার ক'রেই এ-অধ্যায়ের সমাপ্তি টানি।

না। যখন এতটাই বললাম তখন বলি বাকিটুকু—বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে।

* * *

প্যারিসের পরে শহীদের সঙ্গে দেখা হয় নি দশবারো বৎসর। হঠাৎ একবার পণ্ডিচেরি থেকে ফিরে ওর সঙ্গে পুনর্মিলন হয়—তখন ও থাকত থিয়েটার রোডে—আমার মাতুলালয়ের ঠিক সামনের বাড়ীতে। মহানন্দ। ওকে নিয়ে পেশ করলাম সুভাষের দরবারে। সুভাষ ওর কথা শুনে মুগ্ধ। ও-ও সুভাষের চরিত্র নিষ্ঠা ও দীপ্তি-মুগ্ধ। গুণী গুণং বেত্তি। বন্ধুবর তুলসীও হ'য়ে উঠেছিল শহীদের মহাভক্ত। তার ওখানেও শহীদ আসর জমাত বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে।

তারপর আমি ও ইন্দিরা ১৯৫৩ সনে বেরোই বিশ্বভ্রমণে—যে-কাহিনী আমার "দেশে দেশে চলি উড়ে"-তে বলেছি ফলিয়েই। এ-সফরে, কী আশ্চর্য যোগাযোগ, এক ভারতীয় রাজপুরুষের বাড়ীতে গান করতে গিয়ে হঠাৎ শহীদের সঙ্গে দেখা—নিউয়র্কে! আনন্দের বান ডেকে গেল আরো এই জন্যে যে, ইন্দিরার সমাধির কথা শুনে ও তাকে অকুণ্ঠেই শ্রদ্ধার অর্ঘ দিল। বলল : "আমার জন্যে প্রার্থনা করবেন, লক্ষ্মী দিদি!" ইন্দিরাও উচ্ছ্বসিত ওর সরস আলাপে, হাসিতে, ব্যক্তিরূপে।

অতঃপর দেশে ফিরে আমরা পুনায় সাধনার আসন পাতলাম ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৬ সালে শুনলাম ও স্পেনে পাকিস্তানের রাজদূত হ'য়ে গেছে। ওকে পাঠালাম আমার "Beggar Princess Mirabai" নাটক।

উত্তরে ও লিখল সান সেবাস্টিয়ান থেকে (৪.৮.১৯৫৬—অনুবাদ আমার)

ভাই দিলীপ,

ভ্লাদিমা ইতালি থেকে তোমার চিঠিটি পাঠিয়ে দিয়েছে। কী আনন্দ! তুমি আমাকে 'যাযাবর' তথমা দিয়েছ। কিন্তু আমি অন্তত এই পৃথিবীর বাসিন্দা, তোমার মতন আকাশে বসবাস করি না। আমার মন বলে বরাবরই যে তুমি এখনো বেঁচে বর্তে আছ, কিন্তু তুমি যে পুনায় থিতু হয়েছ এতে আমি খুশী—তোমার pervasive personality কোনো একটা বিশেষ স্থানে কায়েমী হ'লে আমাদের মতন লোকের একটু সুবিধে হয়।...স্পেন ধর্মে গোঁড়া ক্যাথলিক—অন্য কোনো দেশের ধর্মে তার ঔৎসুক্য নেই।...তাই আমার মনে হয় না এর পরে তুমি সফরে বেরুলে এ-অঞ্চলে ঢুঁ মারবে। তবে যদি আমাকে তোমার খবর দাও ও তারিখ জানাও তবে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে লণ্ডন প্যারিস বা রোমে যেতে পারি।

আমি উল্লসিত হয়েছি ইন্দিরা দেবীর সংবাদ পেয়ে। আশা করি আমাকে তিনি বেবাক ভুলে যান নি? এ-জীবনে ভগবৎ-উপলব্ধির ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁদের মতন ভাগ্য কার?

তোমার মীরাবাই সম্বন্ধে নাটকটি প'ড়ে আমি পুলকিত। মীরাবাই বিশ্ববরেণ্যা, কে না তাঁকে ভালোবাসে? তুমি যে তাঁর সম্বন্ধে লিখছ এতে আমি সত্যিই ভারি খুশী। এ-যুগে আমরা প্রায়ই ভুলে যাই কত শত মধুর ও সুন্দর অঘটনের কথা।... যে-সব চমৎকার কথায় চমৎকার চমৎকার চিন্তা মূর্ত হয়ে ওঠে, তুমি তাদের বেসাতি করছ খুব ভালো কথা। তোমাদের কথা আমি ভাবব সস্নেহে।

ইতি। তোমাদের স্নেহাধীন শহীদ

এর পরে সাত বৎসর ওর খবর আমরা পাইনি হঠাৎ কে বললে যে, শহীদ স্পেন থেকে ফিরে এসেছে করাচিতে—অসুস্থ। আমি ওকে লিখলাম সোজা পুনায় চ'লে আসতে—যদি সম্ভব হয় পুনায় খুব ভালো ডাক্তার আছে—আমি সব ব্যবস্থা করব কয়াজি নার্সিং হোম-এ। উত্তরে ও লিখল আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে যে ওর হার্ট দুর্বল, চোখে ছানি পড়ছে নড়া চড়া একদম বন্ধ। যদি একটু সেরে ওঠে তো চেষ্টা করবে।

আমি তখন পণ্ডিত জহরলালজির কাছে দরবার করলাম ওর সঙিন অবস্থার কথা জানিয়ে: তিনি ওকে কোনোমতে দিল্লিতে টেনে আনতে পারেন না? দিল্লির সেরা নার্সিং হোমে ওর চিকিৎসা হওয়া দরকার...ইত্যাদি।

উত্তরে পণ্ডিতজি লিখলেন (২৯.৫.৬৩):

প্রিয় দিলীপকুমার,

দুঃখিত হলাম শহীদ-এর খবর শুনে। আমি জানতাম সে পাকিস্তানের রাজদূত হ'য়ে স্পেনে গেছে। তারপরে তার আর কোনো খবর পাই নি।

আমি তার জন্যে যদি কিছু করতে পারি সানন্দেই করব। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না কী করা যেতে পারে। সে যদি দিল্লি আসতে পারে তবে আমি যা পারি করব। কিন্তু আমি তাকে সোজাসুজি লিখতে চাই না। তাতে ক'রে ভুল বোঝার সৃষ্টি হ'তে পারে।

তাই আমি বলি কি, তুমিই তাকে ফের লেখো জানিয়ে যে, তার সম্বন্ধে অনেক সুন্দর স্মৃতি আমার মনে আজো উজ্জ্বল আছে। লিখো—যদি সে দিল্লি আসতে পারে তবে আমি তাকে সাদরে বরণ করব।

ইতি—জহরলাল নেহরু।

আমি এ-চিঠির একটি কপি শহীদকে পাঠিয়ে অনুরোধ করলাম সোজা দিল্লি যেতে। উত্তরে সে করাচি থেকে আমাকে ১৮.৬.৬৩ তারিখে লিখল তার শেষ পত্র (অনুবাদ আমার):

ভাই দিলীপ,

তোমার স্নেহের জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ—ইন্দিরা দেবীর কাছেও, তাঁর শুভৈষণার জন্যে।

তুমি পণ্ডিতজির যে চিঠিটি আমাকে পাঠিয়েছ, প'ড়ে আমার হৃদয় দুলে উঠল। আমি সত্যিই ভাবতে পারি নি যে, বিশ্ব জগতের অগুন্তি সমস্যা নিয়ে যাঁকে ভাবতে হয় তাঁর আমার মতন এক নিঃসহায়ের কথা মনে থাকতে পারে। আমার কোনো বিশেষ সানিটোরিয়মে যাবার দরকার নেই। তাই আমি পণ্ডিতজিকে এখন কিছু লিখতে চাই না। আমার হার্ট যদি হঠাৎ দৈবী করুণায় একটু সেরে ওঠে তো আমি নিজেই দিল্লি যাব। ইতিমধ্যে যদি তোমার তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হয় তো তাঁকে আমার কথা বোলো. বোলো—তাঁর চিঠি প'ড়ে আমি চোখের জল ফেলেছি সকৃতজ্ঞে। তিনি আমার সমবয়সী। আমি জানি তোমার মতন বন্ধু আমার লাভ হয়েছে বহুভাগ্যে—আমাদের মধ্যে ব্যবধান সত্ত্বেও। তোমার ও ইন্দিরা দেবীর জন্যে আমি প্রায়ই প্রার্থনা করি। তোমরাও কোরো আমার জন্যে।

তোমার স্নেহাধীন শহীদ

আমি এর পরেও চেষ্টা করেছিলাম শহীদকে পুনায় আনতে। লিখেছিলাম—দরকার হ'লে আমি লোক পাঠিয়ে তাকে উড়িয়ে আনতে পারি। কিন্তু সে লিখল—উপস্থিত তার বিছানা থেকে নড়বার পর্যন্ত জো নেই—ডাক্তারের নিষেধ। শেষে খবর পেলাম কলকাতায় মার্চ মাসে (১৯৬৫) যে শহীদ আমাদের মায়া কাটিয়ে প্রয়াণ করেছে—"to that undiscovered country from whose bourn no traveller returns." ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ!

আটাশ

শহীদ আমাকে মস্কো যেতে নিষেধ করেছিল খুবই জোরালো সুরে। তার সঙ্গে আমার যে তর্কাতর্কি হয়েছিল তার কিছুটা আমি মানব রায়কে বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন: "সুরবর্দির বান্ধবী লেনিনকে গুলি করতে চেয়েছিল এই জন্যেই চেকা পুলিশ সুরবর্দির পিছনে লেগেছিল। আপনি যাচ্ছেন ও দেশের গান শিখতে আর আমাদের গান গাইতে ওদের কাছে। আপনার ভয়টা কি?"

এইসঙ্গে আমার আর এক বন্ধু শাপিরো (রাশিয়ান বলশেভিক) আমাকে বলেছিল মানব রায় ভুল বলেন নি—রাশিয়ায় শিল্পীর গুণীর কবির যেমন আদর আর কোনো দেশে তেমন নয়। তাই—বলেছিল শাপিরো—আমি মস্কো গেলে কেবল জয়ধ্বনিই পাব—বিশেষ যদি মানব রায় আমার পেট্রন থাকেন। শাপিরো আমাকে আরো কি কি বলেছিল মনে নেই—(থাকার কথা নয়, পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা তো)—কিন্তু এটুকু মনে আছে যে সে চেয়েছিল আমার আশ্চর্য কণ্ঠ (voix merveilleuse) রাশিয়ানরা শোনে এবং তাদের আশ্চর্য কণ্ঠও আমি শুনি।

স্বভাবে আমি দোমনা—vacillating—তাই মনস্থির করতে না পেরে লণ্ডনের হাই কমিশনর এন, সি, সেনকে লিখলাম। তাঁর ওখানে লণ্ডনে আমি মাঝে মাঝে আসর জমাতাম, তাঁরা বিশেষ ভালোবাসতেন আমার মুখে ৺পিতৃদেবের নানা গান শুনতে। তিনি লণ্ডন থেকে আমাকে দ্বিতীয়বার লিখলেন: খবর্দার! মস্কো মুখো হ'লে বিপদে পড়বে—তবে সে বিপদ আসবে মস্কো থেকে নয়, বৃটিশ রাজের কাছ থেকে। লিখলেন: হয়ত তোমার পাসপোর্ট আর কাজে আসবে না—ফলে তুমি আর স্বদেশে ফিরতে পারবে না।

ও বাবা!—আতঙ্কে আমার রাত্রেও প্রায় "নিদ নাহি আঁখি পাতে" অবস্থা। মস্কো আমার মাথায় থাক আমি মানব রায়কে বললাম: "হুম্, আচ্ছা, ভেবে দেখি, পরে জানাবো।" তিনি তীক্ষ্ণধী, বললেন: "বৃটিশ পুলিশের ভয়—এই তো?" সলজ্জে না না ক'রে চম্পট দেওয়া ছাড়া আর গতি রইল না এভাবে হাতে নাতে ধরা প'ড়ে। ফিরে ওলগার কাছে এসে সব বলতে সে খুশী হ'য়ে বলল: "আমার সত্যি ভয় হয়েছিল পাছে তুমি মস্কো যাও—তবে তোমার ভয় যে জন্যে আমার ভয় ঠিক সেজন্যে নয়। আমি মনে করি—জীবনে সবচেয়ে বড় সম্পদ ধর্ম। তুমি স্বভাবে ধার্মিক, আমিও তাই। তাই আমি চাই নি তুমি তাদের সঙ্গে দহরম মহরম করো যারা ধর্মকে বলে মনের আফিং।"

শহীদ বলল: "আমার ভয় সম্পূর্ণ আলাদা। তুমি ওখানে গিয়ে মুখ বুঁজে থাকতে পারবে না। সরল মানুষ তো, ব'লে ফেলবে কত কী বেফাঁশ কথা—আর

বলার সঙ্গে সঙ্গে ফেঁশে যাবে।…ইত্যাদি। কিন্তু এ-বিষাদ প্রসঙ্গের এখানেই সমাপ্তি টানি, বলি শাপিরোর কথা।

তাকেও আমি ভালোবেসেছিলাম জেনেশুনে যে, সে বল্‌শেভিক। না, ভুল বলেছি। আমি প্রথম দিকে জানতাম না। আমাকে ওলগাই প্রথম সাবধান ক'রে দেয়। কিন্তু তখন "টু লেট"—আমি শাপিরোকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমার স্বভাব আমাকে রেহাই দিত না—যাকে একবার সত্যি ভালোবাসতাম তাকে আঁকড়ে না ধ'রে পারতাম না। বেশ মনে আছে—যৌবনে যখন থেকে থেকে বিবাহ করার ইচ্ছা হ'ত, আমার বিবেক আমাকে শাসাত যে বিবাহ করলেই আমি ডুবব স্ত্রী পুত্র কন্যার মোহপাকে। আমার মনে হ'ত বিবাহভীতিকে আমল না দিলে আমি পরমহংসদেবের ভাষায় "বদ্ধজীব" ব'নে যাব দেখতে দেখতে। আসক্তি আমার প্রকৃতির রক্ত মজ্জায় গাঁথা। যাই ভালো লাগে দারুণ ভালো লাগে তারপর শুধু যে আর মুক্তি পাই না তাই নয়, মুক্তি চাইতে হবে ভাবলেও কষ্ট: রবীন্দ্রনাথের "জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে"—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে।

এহেন আমি শাপিরোকে ভালোবেসে ফেলার পরে তাকে এড়িয়ে চলব কেমন ক'রে? তার সুকুমার দীপ্ত মুখশ্রী আজও মনে জাগে। কানে বাজে তার "মঁ শের" (mon cher) সম্বোধন। সর্বোপরি, আমার গানে তার মুখে আলো জ্ব'লে ওঠা। তাকে নিয়ে আমি কখনো কখনো যেতাম বিপ্লবীদের আড্ডায়। শাপিরোকে খুব বেজেছিল যখন আমি ভেবেচিন্তে রুষদেশে যাব না ব'লে দিলাম মানব রায়কে। সে সদুঃখে বলেছিল—তোমার এমন কণ্ঠ আমার কয়েকটি বন্ধুবান্ধবী যদি শুনতেন দিলীপ! তুমি খুব ভুল করলে মানব রায়ের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ক'রে। মস্কো গেলে শুধু তোমার লাভ হ'ত না আমার অনেক বন্ধুবান্ধবীরও লাভ হ'ত। তারা হ'ত তোমারও বন্ধুবান্ধবী।"·· ইত্যাদি।

কিন্তু এবার শাপিরোর কথা একটু বলি সংক্ষেপে।

সে কাজ করত রুষ দূতাগারে (embassy)। উদয়াস্ত অফিসে থেকে ফিরত এক ছোট বোর্ডিং-এ (pension) ক্লান্ত দেহে। তবে আমার সঙ্গে লাঞ্চের ছুটিতে যেত এখানে ওখানে নানা রেস্তরাঁতে। কথাবার্তা হ'ত সেখানেই। কী চমৎকার যে সে ফ্রেঞ্চ বলত! শুধু ফ্রেঞ্চ নয়—জর্মন ভাষায়ও তার দখল ছিল অসামান্য। বড় ঘরের ছেলে শৈশবেই শিখেছিল গভর্নেস রেখে এ-দুটি ভাষা। আমার সঙ্গে কথা হ'ত বেশি ফরাসী ভাষায়ই। রুষ ভগ্নী ত্রয়ী, ওলগা ও শাপিরো এই পাঁচজনের সঙ্গে নিরন্তর ফ্রেঞ্চে আলাপ ক'রেই আমি সে ভাষায় পারঙ্গম হয়ে উঠেছিলাম—যদিও শাপিরোর মতন নিখুঁৎ ফ্রেঞ্চ বলা ছিল আমার সাধ্যাতীত। যেমন বাঁধুনি

তেমনি উচ্চারণ! ওলগাও স্বচ্ছন্দে ফ্রেঞ্চ বলত কিন্তু এত চমৎকার শৈলীতে নয়। তার মুখে শুনলে মনে হ'ত ফরাসী তার শেখা ভাষা। শাপিরোর—যেন মাতৃভাষা, এ একটুও বাড়িয়ে বলা নয়।

শাপিরো প্রথম দিকে আমাকে আত্মকথা কিছুই বলে নি। মনে হ'ত—চাপা যুবক, আত্মগুপ্ত। ওলগা প্রথমদিকে তাকে নেকনজরে দেখে নি—যখন আমি তাকে সেই নিরামিষ রেস্তর্ঁাতে টেনে আনতাম। কিন্তু তার ঐকান্তিকতা সৌকুমার্য ও ফরাসী ভাষায় অসামান্য অধিকার দেখে সে প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারত না। শনৈঃ শনৈঃ সে শাপিরোকে ঈষৎ প্রীতির চোখে দেখতে সুরু করেছিল বিশেষ ক'রে দেখে যে সে আমাকে সত্যি ভালোবাসে। ওদের মধ্যে সময়ে সময়ে রুষ ভাষায় কথা হ'ত—ওলগা পরে তর্জমা ক'রে আমাকে বলত সে আলাপের চুম্বক।

এমনি ক'রে আমাদের ত্রয়ীর মধ্যে একটি প্রীতির কেন্দ্র গ'ড়ে ওঠে—কতকটা সঙ্গীতের আবহে, কতকটা সাহিত্যের। ওদের আমি গান শোনাতাম ওরা আমাকে বলত রুশ সাহিত্যের কথা। আর একটি কেন্দ্র ছিল—যাদের কথা বলেছি—ত্রয়ী রুশ ভগ্নীর কেন্দ্র, যেখানে শহীদ প্রায়ই আসত। শহীদ শাপিরোকে তেমন আমল দিত না যদিও শহীদের রুশ ভাষায় অধিকারের কথা বলতে শাপিরো উজিয়ে উঠত। কালাতিপাতে শহীদও শাপিরোর প্রতি কিছুটা সদয় হ'যে উঠেছিল। বলত: "ভাই, যতই বলি না কেন অহমিকা মরিয়া-না-মরে রাম। আমাকে যে admire করে তাকে ডিশমিশ করার মতন কঠিন কাজ সংসারে কমই আছে।" কিন্তু দেখো, শাপিরোর কাছে বলশেভিস্‌মের রীতিনীতি সম্বন্ধে পাঠ নিও না। ওকে ভালোবাসো বেশ কথা—তুমি সহজেই মানুষকে আপন ক'রে নিতে পারো—তোমার এ আশ্চর্য প্রতিভার কথা শাপিরোও বলছিল সেদিন রুশভাষায়। কিন্তু ভালোবাসার পথ কুসুমাস্তৃত নয়, বন্ধু। যাকে ভালোবাসো তার নানা রুচি পক্ষপাত আদর্শ স্বপ্নের ছোঁয়াচ একটু না একটু লাগবেই। এই দেখ না শাপিরো চায়—তুমি মস্কো ঘুরে আসো। ভাগ্যে ওল্‌গা ছিল। সে আমার সঙ্গে যোগ না দিলে টাগ অফ ওয়ার-এ কে জিতত কে বলতে পারে? হয়ত তুমি একদিন 'দুত্তোর' ব'লে মস্কো পাড়ি দিতে মানব রায়ের ডাকে ”

আমি আমাদের কথাবার্তার যেসব রিপোর্ট পেশ করছি তার মধ্যে কিছুটা কল্পনার মিশেল থাকবেই। তবে ওদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতাই আমার বর্ণনার বিষয়বস্তু, কথালাপ নয়, এটুকু মনে রাখলে আমার নানা মনগড়া বিবৃতির কতকটা শোধন হবে। আমি বলতে চাইছি এ-সূত্রে বিশেষ ক'রে একটি কথা: যে বার্লিনে আমার জীবন ছিল বৈচিত্র্যে অতি সমৃদ্ধ—আর সে-সমৃদ্ধির মূলে ছিল নানাজাতের বন্ধুবান্ধবীর প্রীতি। এদের মধ্যে শাপিরোর স্থান কারুর চেয়েই কম নয়।

শাপিরোর মনের ছোঁয়াচে যেমন আমি হয়ে উঠেছিলাম সমৃদ্ধ আমার মনের ছোঁয়াচে সে-ও হয়ে উঠেছিল তেমনি উৎফুল্ল। আমি শিখেছিলাম ওর কাছে মন্ত্রগুপ্তির বিদ্যা। ও শিখেছিল আমার কাছে আত্মকথনের রীতি। তাই কয়েকমাসের মধ্যেই আমার আত্মকথনের জোয়ারে ওর মনেও জেগে উঠল এ-জোয়ার—ও বলল আমাকে ওর অবিশ্বাস্য জীবনকাহিনী—যার কথা আমি লিখেছি ফলিয়েই আমার "ভাবি এক হয় আর" উপন্যাসে।

আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ওর আদর্শনিষ্ঠা। ওর বাবা ছিলেন লণ্ডনের এক ধনী ডাক্তার। শাপিরো তাঁর একটিমাত্র ছেলে তথা উত্তরাধিকারী। তিনি ছিলেন White Russianদের দলে—বলশেভিস্‌মকে যারা বিষচক্ষে দেখে। কিন্তু শাপিরো নানা ওঠাপড়ার পরে হয়ে দাঁড়ালো একনিষ্ঠ বলশেভিক—ঠাকুরের লীলায় কি পার পায় কেউ? ধনী পিতার পুত্র—যে আশৈশব বিলাসে মানুষ—সে কিনা ঝুঁকল এ-দুরন্ত আদর্শের দিকে যার ফলে বাপ তাকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। বললেন: "হয় বলশেভিসম্ ছাড়ো নয়—আমায়—আর সেই সঙ্গে তোমার জন্মস্বত্ব—আমার সম্পত্তি।" ও জবাব দিল: "সম্পত্তি আমি চাই না, চাই নিজের চোখে বড় হ'তে—নিরন্নদেব অন্নসংস্থানের ব্যবস্থায় আমার সব শক্তি নিয়োগ করতে।"

বাপ ওকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু ও কানে তুলল না তাঁব যুক্তি মিনতি চোখের জল। চ'লে এল লণ্ডন থেকে মস্কো—যোগ দিল লেনিনের সৈন্যদলে। একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিল—কিন্তু সে রুশদেশ ছেড়ে চ'লে এল, বলল বলশেভিককে সে বিবাহ করতে পারে না।

তারপর? যা হবার। ও প্রণয়িনীকে ছাডল, সম্পত্তি ছাডল, গৃহসুখ ছাড়ল—শুধু ওর আদর্শকে বরণ করতে মনে প্রাণে। বার্লিনে খুব কম মাইনে পেত। কিন্তু তাতে কী? টাকা কে চায়। বুর্জোয়া প্রণয়িনীর সঙ্গে ঘর কবাও তো সম্ভব নয়। ও চা'য লেনিনের ধ্বজাবাহী হ'তে—নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিযে রাষ্ট্রের সেবক হ'তে। কেবল এই পথেই মনের শান্তি মিলতে পারে। যদি ভবিষ্যতে বলশেভিকরা হেরেও যায় (তখনো লেনিনের শাসন অচলপ্রতিষ্ঠ হয নি) ও থাকবে নির্জিতদের দলেই। কারণ ও জানে অন্তিমে বলশেভিস্‌মের জয় অবশ্যম্ভাবী। তবে সে-দিগ্বিজয়ের পথ কাঁটাবনের মধ্যে দিয়ে। ওকে আমি অনুবাদ ক'রে শোনাতাম রবীন্দ্রনাথের বলাকার শেষ কবিতা থেকে আর ওর চোখে আলো জ্ব'লে উঠত বলত: "এই এই এই দিলীপ, বলশেভিকদের মনও করে এই অঙ্গীকার নির্ভয়ে:

পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ় ফণা

নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ,
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
ভয় নাই ভয় নাই, যাত্রী—
ঘর ছাড়া দিক হারা অলক্ষ্মী তোমার বরযাত্রী।"

এ কবিতাটির ও চমৎকার ফরাসী অনুবাদ করেছিল আমার মুখে এর ভাবার্থ শুনে।

এবার দিলীপ শাপিরো সংবাদের শেষ অধ্যায়ে আসি।

ও বিবাহ করেছিল। লেনিনের তরফে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল—বুঝি কলচাকের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে সাংঘাতিক আহত হয়। হাঁসপাতালে এক শ্রীমন্তিনী নার্সের প্রেমে প'ড়ে তাকে বিবাহ করে। বিবাহ করতে চায় নি, কিন্তু সে ওকে সত্যিই ভালোবেসেছিল—তাই রাজী হয়েছিল ওর আদর্শ বরণ করতে। এর পরে ও সানন্দেই তাকে বিবাহ করে। কিন্তু ওকে চ'লে আসতে হয় বার্লিন, কর্তৃপক্ষের আদেশে। ওর কাজ ছিল গোপনে রিক্রুট সংগ্রহ করা ও বলশেভিক প্রপাগাণ্ডা করা। জর্মনরা বলশেভিসমকে বিষচক্ষে দেখত, তাই একাজ ওকে খুব সাবধানেই করতে হ'ত। যেকোনো মুহূর্তে ওকে জর্মন নায়কেরা হুকুম করতে পারেন—প্রস্থান করো। তখন? কী হবে? কিন্তু ও হেসে বলেছিল আমাকে: "পরিণাম চিন্তা যে করে সে খাঁটি বলশেভিক নয় দিলীপ। হয়ত আমাকে এখানে জেলে যেতেও হতে পারে। কিন্তু আমি বেপরোয়া—চাই শুধু আমার আদর্শকে জীবনে ফলিয়ে তুলতে লেনিনের সেবক হ'য়ে। আমার কেবল এক দুঃখ আছে: আমার জন্যে আমার স্ত্রীকে জেনেভায় কাজ নিতে হ'ল।"

"তুমি তাকে দেখতে যাও না কেন মাঝে মাঝে?"

"টাকা কোথায় দিলীপ? আমি যে নিঃস্ব। যা মাইনে পাই তাতে টায়ে টায়ে চ'লে যায়।"

আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল: "সে হবে না শাপিরো। চলো আমার সঙ্গে জেনেভা। আমি লুগানো যাচ্ছি—জেনেভা হ'য়ে। আমি তোমার ট্রেনভাড়া ও হোটেল খরচ দেব। না—কোনো কথা নয়। আমাকে যদি সত্যিই বন্ধু মনে করো তবে কেন আমার এ সামান্য সাহায্য নেবে না—বিশেষ যখন আমার হাতে যথেষ্ট টাকা আছে? চলো তুমি। যেতেই হবে তোমাকে।"

ওর চোখে জল চিক চিক ক'রে উঠল। বলল: "ভাই, তুমি আমাকে বলশেভিক জেনেও ভালোবেসেছ—তাই তোমার উদারতার মানহানি করব না। যাব তোমার সঙ্গে জেনেভা।"

কিন্তু হা দুর্দৈব—কি একটা জরুরি কাজের জন্যে ও ছুটি পেল না। আমাকে একলাই জেনেভা ছুটতে হ'ল। সেখানে দুদিন কাটিয়ে লুগানো।

লুগানোতে ও আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখল। কী সুন্দর চিঠি! লিখল ওর জীবনের অনেক আশা আকাঙ্খার কথা। কেবল শেষে লিখল: "বন্ধু, আমি নাস্তিক. সমাজ মানি না, ভগবান মানি না, চলতি নীতিবাদও মানি না। কিন্তু তুমি যে ভালোবাসার চুম্বকে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছ তাকে মানতে আমার বাধে নি। হয়ত আমাদের কোনোদিনই আর দেখা হবে না। কিন্তু আমার প্রাণবাগানে তুমি যে প্রেমের ফুল ফুটিয়ে গেছ সে অমরা ফুল।"

সে-চিঠিটি হারিয়ে গেছে কিন্তু ও এই ধরণের কথা যে লিখেছিল সরল কাব্যোচ্ছ্বাসে একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না।

ঊনত্রিশ

বার্লিনে আমি ছিলাম এক বৎসর। বিদেশ আমার কাছে কোনোদিনই বিদেশ মনে হ'ত না। যৌবন মায়াবী, কাঁকর থেকেও পায়ে ফুল ফোটাতে। য়ুরোপে আমার পথের নানা বাধাও সত্যিই আমাকে চলার পথে এগিয়ে দিয়েছিল—পদে পদে কাঁকরেও ফুল ফুটিয়ে।

বার্লিন জীবনে আমার পাঁচ সাতটি বন্ধু ও শুভার্থী ছিলেন এমনি ফুল। তাই তাঁদের সৌরভ আজো ভেসে আসে স্মৃতির বাগানে পা দিতে না দিতে। এদের মধ্যে একটি পারিজাত ছিলেন রেঁালা। আর একটি জর্জ দুহামেল। তৃতীয় রাসেল। এঁরা ছিলেন স্রষ্টা জাতের মানুষ তাই এঁদের উপাধি পারিজাত। রাসেলের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় লুগানো-তে। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয় নি—যদিও তিনি আমাকে পত্রে লিখেছিলেন (আমি কলকাতায় ফিরলে পর) যে, আমাকে তিনি ভোলেন নি। তাঁর একটু কাছে এসেছিলাম ১৯২৭ সালে কর্ণওয়ালে তাঁর বাড়িতে—যেকথা আমার তীর্থংকর-এ লিখেছি। কিন্তু তিনি আমার কাছে এসেছিলেন ১৯২০ সালে—তাঁর নানা রচনার মধ্যে দিয়ে। আমি তাঁর দুষ্পাঠ্য গাণিতিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক বই ছাডা প্রায় সব বইই পডেছি। অন্ততঃ ত্রিশ পঁয়ত্রিশটি বই। রোলাঁর বইও পডেছি অনেক—তবে সব জডিয়ে বোধহয় দশবারোটির বেশি হবে না। দুহামেলেরও কয়েকটি বই পড়েছিলাম যাদের মধ্যে আমার মনে সবচেয়ে গভীর ছাপ ফেলেছিল তাঁর বিখ্যাত Civilization, Possession du Monde এবং তাঁর রুষ ভ্রমণ কাহিনী। প্রথম বইটিতে তাঁর Amours de Ponceau (পঁসো পদাতিকের পত্নীপ্রেম) নক্সাটিতে তিনি অপরূপ রসে রঙে ফলিয়ে তুলেছেন—আহত পঁসোকে তার তন্বী পত্নী কিভাবে যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিল। সেই সূত্রে বর্ণনা করেছেন দরদী ঢঙে হাঁসপাতালে ধাত্রীদের সেবা দরদ ও পঁসোর পত্নীপ্রীতি নিয়ে তাদের নারীসুলভ ঔৎসুক্য। ২৭২ পৃষ্ঠায় লিখছেন (অনুবাদ আমার): সুখ বা মঙ্গল কাকে বলে সে নিয়ে মানুষের প্রায়ই ঠিকে ভুল হয়।··· আমি খুব কাছ থেকেই দেখেছি বিজ্ঞানের জাঁকজমক যাদের স্তবগানে সারা জগৎ আত্মহারা। কিন্তু তবু আমি বলবই বলব যে সত্য সভ্যতা নেই বিজ্ঞানের অতিকায় আবিষ্কারে, অবান্তর মারণাস্ত্রে! তাকে পেতে হবে মানুষের হৃদয়রাজ্যে।"

আর একটি বইয়ে দুহামেল দিয়েছেন আত্মপরিচয় বড সুন্দর ক'রে: "ভাগ্যবশে যুদ্ধের সময় এমন একটি জায়গায় আমাকে থাকতে হয়েছিল আর এমন কাজে, যেখানে মানুষের দুঃখকষ্টই ছিল আমার একমাত্র চর্চা ও তার সঙ্গে লড়াই করাই একমাত্র

পেশা।* (Possession du Monde) দুহামেল ছিলেন ডাক্তার, রেড ক্রসে আহতদের সেবাশুশ্রূষাই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ।

বলেছি, দুহামেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সুইজর্লণ্ডের ছবির-মতন শহর লুগানোতে যেখানে আমি গিয়েছিলাম সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গান সহযোগে, রোলাঁ তাঁর সম্বন্ধে আমাকে বলেন (দুহামেল ছিলেন রোলাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু): "দুহামেল যতটা বিচার ও বিশ্লেষণ প্রবণ ততটা রাগপ্রবণ (emotionnable) নন। হ'লে যুদ্ধে চারদিকে যন্ত্রণার দৃশ্যে অমন নির্বিচল থাকতে পারতেন না।"

কিন্তু আমি দুহামেলের স্নেহ পাই প্রধানত আমার গানের দৌলতেই বলব। রোলাঁর কাছে শুনেছিলাম—দুহামেল শুধু সঙ্গীতপ্রিয় নন, সঙ্গীতকোবিদ। তাঁর স্ত্রীও মনোরমা—কমেদি ফ্রাঁসেস-এর যশস্বিনী অভিনেত্রী। মলিয়েরের বিখ্যাত Misanthrope নাটকটিতে তাঁর Arsinoe´ অভিনয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। উভয়েই আমাদের গান শুনে উচ্ছ্বসিত। পরে প্যারিসে তাঁদের ওখানে আমি গান গেয়ে গভীর তৃপ্তি পেয়েছিলাম এ-দম্পতীর হার্দিক সাড়ায়। পরে আমাকে একটি পত্রে দুহামেল লিখেছিলেন: "এমন দিন যায় না যেদিন আমার মনে তোমাদের আশ্চর্য গান না গুনগুনিয়ে ওঠে।" সঙ্গীতের মাধ্যমে মানুষ কত কী পায়, সুরের ডাকে মানুষ মানুষের কত কাছে আসে আমাকে বোঝাতে একদিন একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে বলি।

দুহামেল বললেন: "গত যুদ্ধে আমাকে দেখাশোনা করতে হ'ত নানা আহত সৈনিককে। এদের মধ্যে ছিল একটি জর্মন পদাতিক ঘোর ফরাসীবিদ্বেষী। রোজ আমি যাই, কিন্তু তার বিমুখতা কেটেও কাটে না, কত চেষ্টা করি কিন্তু কিছুতেই তার মন পাই নে। ভাবতে খারাপ লাগে, কারণ আমার কাছে সে কোনো বিশেষ জাতের লোক নয়—শুধু দুঃখী, কাজেই স্নেহভাজন। একদিন তার কাছে ব'সে অন্যমনস্ক ভাবে শিস দিচ্ছি। হঠাৎ দেখি তার মুখে কাঠিন্যের পর্দা সরে গেছে—আমাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল: 'বীটোভনের পঞ্চম সিম্ফনি—না?' আমি একটু হেসে বললাম: 'হাঁ'। সাধে কি তিনি লিখতে পেরেছিলেন: "মানুষের সব চেয়ে বড় আনন্দ সম্পদ হচ্ছে অপরকে সুখী করতে পারা—একথাটি যারা জানে না তারা জীবনের কিছুই জানে নি।*

---

*Le sort m'a, pendant la guerre, assigne une place et une tache telles que la la douleur e'tait mon unique spectacle, mon e'tude et mon adversaire de tous les' instants. Que l'on m'excuse d'y songer avec une perseverance qui ressemble a de l'obsession.······(LA POSSESSION DU MONDE)

*"La plus grande joie, elle est de donner le bonheur, et ceux qui l'ignorent ont tout a' appprendre de la vie." (*Possession du Monde*···Duhamel).

এই সূত্রে একটি ঘটনা মনে পড়ছে—বলবার ম'ত।

লুগানো শান্তি সমিতিতে আমি প্রায়ই দুহামেল বা রোলাঁর সঙ্গে এক টেবিলে বসতাম ওঁরা উভয়েই আমাকে স্নেহ করতেন ব'লে। (রাসেলের সঙ্গে একবার এক টেবিলে ব'সে তাঁকে প্রশ্নজালে বিব্রত করেছিলাম) একদা একটি পরিচারিকা—waitress—খাবার নিয়ে পরিবেষণ করতে আসতেই দুহামেল তাকে "মাদাম" ব'লে সম্বোধন করেন। য়ুরোপের পরিচারক পরিচারিকা সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থা আমাদের সেবক সেবিকাদের চেয়ে অনেক উন্নত হ'লেও এ-পর্যন্ত কাউকে কোনো পরিচারিকাকে "মাদাম" ব'লে ডাকতে শুনি নি। পরে এ নিয়ে দুহামেলকে প্রশ্ন করতে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন আমি লিখে রেখে পরে প্রকাশ করেছিলাম। দুহামেল বলেছিলেন:

"আমরা জীবনে প্রায়ই মনে ক'রে থাকি যে দুঃস্থের দুরবস্থা দূর করা ছাড়া আর কোনো মহৎ কাজই নেই মানুষের। কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ের রহস্য দুর্ভেদ্য—কী ক'রে যে মানুষের বৈষম্য সমস্যার সুরাহা হয় আমরা কেউই বলতে পারি না জোর ক'রে। কিন্তু যেটা আমরা পারি যদি প্রাণপণে করি তাহ'লে দুঃস্থের অবস্থা ফিরিয়ে দিতে না পারলেও দুটো মুখের কথায়ও তাদের অনেক ক্ষোভের গ্রন্থিমোচন করতে পারি। সেইজন্যে (এই কথাটি দুহামেল বলেছিলেন বড চমৎকার ক'রে) দরদের একটা প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে—ব্যথা কোথায় সূক্ষ্ম হ'য়ে লুকিয়ে থাকে, দুঃখ কোথায় আত্মগোপন ক'রে আরো দুঃখ পায় তার খবর নেওয়া। আন্তরিক শীলতা (মৌখিক থ্যাঙ্কিউ-এর চলতি ভদ্রতা নয়) করতে পারে এই করবার মতন কাজটি—যদি আমরা ব্যথা দিয়ে ব্যথা বুঝি।"

সৌভাগ্যক্রমে এ-উক্তির সত্যতা আমি জীবনে বহুবার উপলব্ধি করেছি। তাই দারিদ্র্য অনশনের দুঃখে ভুগতে না হওয়া সত্ত্বেও অনেক দুঃস্থের দুঃখকষ্টে দুঃখ পেয়ে নানা সময়ে তাদের কিছুটা অন্ততঃ সান্ত্বনা দিতে পেরেছি বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। দুহামেলের এ-কথাগুলি আমার স্বাভাবিক দরদবোধকে একটু উস্কে দিয়েছিল ব'লে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কীভাবে একটু বলি খুলে।

১৯১৪—১৯১৮-র বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার ফলে অনেক ভদ্র পরিবারের মেয়েকে পরিচারিকা বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। এই লুগানোতেই এম্‌নি একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল যার শোকাবহ কাহিনী তাকে আমার কাছে টেনে এনেছিল আমার গানের সূত্রে।

সে ছিল আমার ঘরেরই পরিচারিকা—femme de chambre—তন্বী শ্রীমন্তিনী শ্যামলী—যাকে বলে brunette। চোখদুটি তার প্রায়ই সজল মনে হ'ত—যদিও অশ্রুল যাকে বলে তা নয়। কথা বলত মুখ না তুলে। কেউ আমাকে তার সম্বন্ধে

কোনোদিন কিছু বলে নি। একদিন দেখি সে অদূরে একটি বেঞ্চিতে বসে আমার ভাষণ ও গান শুনছে সাগ্রহে।

ঘরে ফিরে তাকে কিকাজে তলব ক'রে বললাম এক পেয়ালা chocolat আনতে, তুহামেলী ভঙ্গিমায় "মাদাম" সম্বোধন ক'রে। ওর আড়ষ্ট ভাব কেটে গেল মুহূর্তে। ওর চোখ দুটি যেন বলত আমাকে (ছড়াটা রচনা করেছিলাম যখন ওর সম্বন্ধে পরে লিখি)।

মুখের দরদ নয়ত মুখের কথা,
উৎস যে তার প্রাণের অতল তলে।
ব্যথা দিয়ে বুঝলে মনের ব্যথা
আকাশ-আলো ঝর্ণা হ'য়ে চলে।

লক্ষ্য করতাম ও আত্মমগ্ন হ'য়েই থাকত—কাউকেই ধরা ছোঁওয়া দিত না। হঠাৎ কি হ'ল (যাকে বলে ice was broken) ও আমাকে বলতে সুরু করল কত কথাই যে! আহা, পরে কতদিনই যে ওর জলভরা চোখ দুটি আমার মনে পড়েছে—আর সেই সঙ্গে ওর কৃতজ্ঞতা আমাকে ওর আত্মকাহিনী বলতে পেরে। অথচ আমি শুধু শুনে গিয়েছিলাম মাত্র—তাইতেই ও পেয়েছিল সান্ত্বনা।

বলল বেচারি মেয়ে (ফরাসীতেই) : "আমি ভদ্র ঘরের মেয়ে মসিয়ে!—চিরদিন সুখেই মানুষ হয়েছি। আমাকে যে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করতে হ'তে পারে কখনো কল্পনাও করি নি। যুদ্ধের আগে আমাদের অবস্থা খুবই ভালো ছিল। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে ঘর গেল, কলকারখানা গেল—সবচেয়ে বাজল যখন তারা গেল যারা রোজগার করত। রইলাম শুধু আমি একা—একেবারে একা। ভগবানের নিষ্ঠুরতা কোথায় সবচেয়ে বেশি প্রকট হ'য়ে ওঠে জানেন কি?—যেখানে যাদের নেওয়া উচিত নয় তাদের সরিয়ে নিয়ে যাদের নেওয়া উচিত তাদের রেখে দেন চিরজীবী ক'রে। যাওয়া উচিত ছিল যে-অকেজো মেয়েটার তার মরণ হ'ল না, কিন্তু চ'লে গেল কর্মিষ্ঠ বাপ, বলিষ্ঠ ভাই, বুদ্ধিমতী বোন্।

"আমার মতন আরো অনেক মেয়ে এম্‌নি ভাবেই আজো বেঁচে আছে এখানে ওখানে সেখানে—শুধু মুখ বুজে কাজ করে যেতে—যাতে ক'রে বেঁচে থাকা যায়—যে বেঁচে থাকার কোনো মানেই হয় না। তবে আমাদের একমাত্র সুখ এই যে, সারাদিন ভাববার এতটুকুও ফুর্সৎ পাই নে। পেলে কি সইতে পারতাম এ-জীবন? খেটে খেটে শুধু নিজেকে ক্ষইয়ে ফেলা—তারপর ঘুমে নেতিয়ে পড়া। এই-ই যে জীবনের বিধান মসিয়ে, উপায় কি বলুন? জীবনের সবচেয়ে বড় সুখ তো জীবনকে ভুলে থাকা।"

সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে তার কৃতজ্ঞতা যে তার কথা আমি মন দিয়ে শুনেছিলাম। তাকে কোনো pourboire—বখশিস—দেবার কথা শুধু আমি না,

কারুরই কখনো মনে হয় নি, মুখ বুজে সে তার কাজ ক'রে যেত—ব্যস। কারুর কাছেই কিছু চাইত না—ধন্যবাদ-কে মনে করত একটা শিষ্টাচার মাত্র—তার বেশি নয়। কেবল আমার গানের টানে সে আমার কাছে এসে (যেন আচম্‌কা) খুলেছিল তার মনের দুয়ার। কিন্তু তা-ও মাত্র ঐ একদিনের জন্যেই। তারপরেই সে ফিরে গিয়েছিল তার অটল দূরত্বের আড়ালে।

কিন্তু মসিয়ে দুহামেলের কথায় ফিরে আসি। আরো, দুএকটি কথা বলার আছে—তাঁর সম্বন্ধে।

দু-হামেল লুগানো শান্তিসভায় ব্যক্তিত্ব ও আন্তর্জাতিকতা (L'individualite et l' Internationalisme) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। শুধু যে তাঁর শ্রুতিমধুর ফরাসী আমাদের কানকে খুশী করেছিল তাই নয়, তাঁর ভাবভঙ্গির মাধ্যমে তাঁর সৌকুমার্যও আমাদের মুগ্ধ করেছিল। তিনি একটি কথা বলেছিলেন আমার ডায়ারিতে টুকে রেখেছিলাম : "বক্তাকে আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু কথককে বলি 'স্বাগতম্'। আমি তোমাদের কাছে আসি নি বক্তাভাবে, এসেছি কথকরূপে, বন্ধুভাবে।"

তাঁর কথার মধ্যে ফরাসীসুলভ রসিকতা প্রায়ই ঝরত অপ্রত্যাশিত ভাবে। এ-সভায় এক গোঁড়া আমেরিকান ধর্মযাজকের গুরুগম্ভীর তর্জন আমাদের অনেকেরই ভালো লাগে নি। দুহামেলকে একথা কৌতুকচ্ছলে বলাতে তিনি হেসে আমাকে বলেছিলেন : "মসিয়ে রোওয়া! যখন দেখবেন কোনো বক্তা তারস্বরে কোনো ঘোষণা করছেন তখন জানবেন তাঁর মনে সে বিষয়ে ঘোরতর সংশয় আছে। আর যখন দেখবেন তিনি টেবিলে ঘোর মুষ্ট্যাঘাত ক'রে কোনো বিশেষ মত জাহির করছেন তখন ভুলেও ভাববেন না যে, তিনি তা বিশ্বাস করেন।"

আমার কাছে দুহামেল এসেছিলেন গানের টানে। আমাদের গানকে ওদেশে যাঁরা সত্যি ভালোবেসে বরণমালা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সব আগে মনে পড়ে রোঁলাকে, তার পরেই দুহামেলকে। লুগানোয় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ১৯২২ সালে। তারপর প্যারিসে তাঁর বাড়িতে তাঁকে গান শুনিয়েছিলাম ১৯২৭ সালে। ১৯৩৪ সালে তিনি আমাকে Conferencia ব'লে একটি পত্রিকা পাঠান। তাতে Pourquoi j'aime la musique de chambre (কেন আমি চেম্বার-ম্যুজিক ভালোবাসি) নিবন্ধে আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে লিখেছিলেন : "দিলীপকুমার নানা প্রসিদ্ধ রাগ গাইলেন। ওঁদের সঙ্গীত স্বরলিপি করা থাকে না, যুগ যুগ ধ'রে চলে তার ঐতিহ্যের জের টেনে।" অপিচ : "এ-সঙ্গীত তার আবেগ উচ্ছ্বাস ও তার রূপের প্রকাশে মানুষ যতটা উঁচুতে পৌঁছতে পারে পৌঁছেছে—"Ces musiques sont, dans l' expression des sentiments, des passions et des idees, aussi loins et aussi profonds qu'il est humainement possible d'aller."

ত্রিশ

বার্লিনে শেষের দিকে—দুতিন মাস—শাপিরোর সঙ্গে প্রায় রোজ একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া হ'ত সেই নিরামিষাশী রেস্তোরাঁ-তে যেখানে ওলগা যেত। বার্লিনের কত কী স্মৃতিই ভুলে গেছি কিন্তু আমাদের ত্রয়ীর সৌহার্দ্য ভুলতে পারি নি। আজও ভাবলে একটু আশ্চর্য লাগে • সৌহার্দ্য হ'ল কাদের মধ্যে? না, এক টল্স্টয়ান রুষ সুকুমারী, এক কৃষ্ণভক্ত মডার্ণ হিন্দু আর এক দুর্দান্ত একরোখা বলশেভিক! আমরা তিনজনেই ছিলাম আদর্শবাদী। কিন্তু কোথায় খৃষ্টান টলস্টয়ের আদর্শ, কোথায় বৈষ্ণব ভাগবত আদর্শ, আর কোথায় লেনিনপন্থীর রণোন্মুখ আদর্শ। ওলগা বিশ্বাস করত না ধর্ম ছাড়া আর কোনো পথে মানুষেব মুক্তি হ'তে পারে—বড় ঘরের মেয়ে হ'য়েও বরণ করেছিল ঠিক কৃষাণের জীবন না হোক দরিদ্রের জীবন বটেই তো। দিলীপ—তখনকার দিলীপ—ছিল এক বহুমুখী বহুরূপী—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় (ইদানীন্তনদের চিত্র)

> All sides he sees and turns to every call;
> He has no certain light by which to walk;
> Always he journeys but nowhere arrives.
> চারিদিকে দৃষ্টি তার, প্রতি ডাকে দিতে চায় সাড়া,
> নাই কোনো ধ্রুবালোকে তীর্থপথে দিতে সুনির্দেশ;
> চিরযাযাবর—শুধু পারে না কোথাও উত্তরিতে।

তবু আমাদের বন্ধুত্ব ছিল দৃঢ়ভিত্তি—আজও মনে করলে মন ভিজে ওঠে—মনে হয় এ-অসাধ্য সাধন করতে পারে কেবল যৌবন। কালাতিপাতে মনের প্রাণের নমনীয়তা ও কমনীয়তা ক'মে আসেই, ফলে যদু মধুর গলায় প্রীতির বরণমালা দিতে ইতস্তত: করে—মধু কি গ্রহণ করবে? মধুও আগে ভাবে তারপর এগোয় বিধুর হাতে হাত মেলাতে। বিধুও সাতপাঁচ ভাবে সিধুকে প্রীতিভোজে নিমন্ত্রণ করতে। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে মিলের দিকটা আছে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে অমিলের হাজারো আড়াল এসে দেখতে দেয় না। কিন্তু যৌবন গুণে গুণে পা ফেলে না, ভেবেচিন্তে ডাক দেয় না। সাবধান হওয়া তার স্বধর্ম নয়। তাই হয়ত মানব রায়কেও আমার এত ভালো লেগেছিল যে ওলগা ও শহীদ সঘনে বাধা না দিলে হয়ত আমি যেতাম মস্কো—কে বলতে পারে? আরো এই জন্যে যে, মানব রায় তাঁর যে-কয়টি নিবন্ধ দিয়েছিলেন প'ড়ে আমার সত্যিই মনে হয়েছিল—রুষদেশে স্বর্গ নেমে এল ব'লে classless society-তে, নয়া মানবধর্ম জাঁকিয়ে আসন নিল ব'লে।

তাই ভারি নিরাশ হয়েছিলাম যখন শাপিরো আমার সঙ্গে জেনেভা আসবে ব'লেও আসতে পারল না। আমার আরো সাধ ছিল ওর সঙ্গে ওর প্রিয়তমার মিলন ঘটিয়ে পুলকিত হ'তে। টাকার তো এই-ই সদ্ব্যবহার। বন্ধুর যদি কোনো কাজেই না লাগি তবে টাকা জমিয়ে কী চতুর্বর্গ লাভ হবে? কেবল বন্ধুর মতন বন্ধু ওরফে প্রীতি অহৈতুকী হওয়া চাই। এ সুযোগ বিধাতা বেশি দেন না—সব মহার্ঘ বস্তুর মতনই অহৈতুকী প্রীতি বিরল। কিন্তু বিরল ব'লেই তো এত তৃপ্তিকর, অসাধ্যসাধনী।

জেনেভায় একা ভালো লাগল না। সুন্দর দৃশ্য চোখকে মুগ্ধ করে কিন্তু মন ভরে কেবল প্রীতির লেনদেনে।

ক্ষতিপূরণ মিলল লুগানোয়। বন্ধুত্ব হ'ল দুহামেলের সঙ্গে, ভ্লাদিয়ার সঙ্গে ও মার্থার সঙ্গে। দুহামেলের কথা বলেছি। বলি বাকি দুজনার কথা। বিশেষ ক'রে ভ্লাদিয়ার কথা, যার সঙ্গে ত্রিশবৎসর বাদে ফের দেখা হয়েছিল রোমে—আমার তৃতীয় সফরে।

একত্রিশ

লুগানোতে আমি গিয়েছিলাম রোলাঁর নিমন্ত্রণে একথা বলেছি। কেবল বলা হয়নি রোলাঁ আমার ভাষণের জন্যে কী ব্যবস্থা করেছিলেন। লুগানোর বেশির ভাগ ডেলিগেটই ছিলেন কন্টিনেন্টাল। স্বইজর্লণ্ডে ইংরাজী ভাষারও তেমন চল নেই। লুগানো ইতালিয়ান স্বইজর্লণ্ডের পরিধির মধ্যে, তাই সেখানে ইতালিয়ানেই বেশির ভাগ লোক আলাপ করত। ফরাসীরও প্রতিপত্তি ছিল তাই আমার কোনো অসুবিধাই হয়নি। কিন্তু তাই ব'লে তো আমার ফরাসী ভাষায় ভাষণ দেবার ক্ষমতা হয়নি তখনো। (পরে হয়েছিল যখন নীস-এ ১৯২৭ সালে আমি আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল ফরাসী ভাষায়ই বক্তৃতা দিয়েছিলাম—কিন্তু ১৯২২-এর মাঝামাঝি আমার ভয় ভয় করত ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা দিতে) তাই রোলাঁকে আমার বক্তৃতার একটি কপি পাঠিয়েছিলাম,* তিনি সেটি তাঁর বোন মাদ্‌লীনকে দিয়ে ফরাসী ভাষায় তর্জমা করিয়ে স্বইজর্লণ্ডে ছাপিয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য রোলাঁর কাছ থেকে এতখানি আনুকূল্য পাব আমি আদৌ আশা করি নি। তবে তিনি মহাপ্রাণ বিশ্বপ্রেমিক। আমাকে ভালোবেসে আপন ক'রে নিয়েছিলেন। বলতে কি, তাঁর নির্দেশ মেনেই তো আমি জর্মনিতে গান শিখতে যাই, প্যারিসে গান শেখার প্রবল ইচ্ছাকে নাকচ ক'রে। বার্লিনে প্রয়াণ করার ফলে আমার দুটি মস্ত লাভ হয়েছিল: এক, জর্মন ভাষা শিখে জর্মন গান গাইতে পারা; দুই, নানা রুষ বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ লেনদেনের মাধ্যমে রুষদেশের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া—যে-পরিচয় আরো গভীর হ'য়ে উঠেছিল শহীদের মাধ্যমে। জর্মনিতে আমার মন দেখতে ফুলের মতন দল মেলেছিল বিশেষ ক'রে আমার রুষ বন্ধুবান্ধবীর দাক্ষিণ্যেই। কোনোদিনই মনে হয় নি ওরা বিদেশী—এমন কি ঐকান্তিক বলশেভিক শাপিরোকেও নয়। বলতে কি, তার তথা ওলগার মাধ্যমে আমি যেন রুষ জাতির মহত্বকে অনুভব করেছিলাম আমার গহন হৃৎস্পন্দনে।

লুগানোতে আমার য়ুরোপের সঙ্গে পরিচয় আরো ব্যাপক ও গভীর হ'য়ে উঠেছিল সেখানকার নানা জাতির ডেলিগেটদের মনের পরশ পেয়ে। ইতালিয়ান, ফরাসী, হাঙ্গেরিয়ান চেক, জর্মন ও মনে পড়ে সার্বিয়ান তরুণীর কথা। কী সুন্দরী যে! তার মহা দুঃখ আমি এমন গায়ক হ'য়েও নাচি না। সেখানে এক বিউটি-উৎসবে এই মেয়েটি প্রথম পুরস্কার পায়।

কিন্তু এসব সংস্পর্শ উপর ভাসা। লুগানোতে আমি সবচেয়ে লাভ করেছিলাম

---

* এ-মূল কপিটি পরে শ্রীঅর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের "রূপম্" পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

বন্ধু ভ্লাদিমির ভানেককে পেয়ে। তার কথা বলার আছে—অঢেল কিন্তু সংক্ষেপে বলতে হবে বাছাই ক'রে যে-খবর সকলের ভালো লাগবে। অর্থাৎ topical-কে বাদ দিয়ে গভীরেরই বেসাতি। "কবিরে তোমার কহিতে শিখাও গভীর কথা।"—সাধু, নিশিকান্ত!

ভ্লাদিমির ভানেক ছিল চেকোশ্লোভাকিয়ায় এক উদীয়মান আদর্শবাদী লেখক। তার একটি চেক ভাষায় লেখা বৃহৎ উপন্যাস সে আমাকে উপহার দিয়েছিল। শুনেছিলাম যে সে সময়ে প্রাগে ঔপন্যাসিক ব'লে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এই সুবৃহৎ বইটির দৌলতে।

কিন্তু তাকে আমি এত কাছে পেয়েছিলাম প্রধানতঃ তার হিন্দু সংস্কৃতি তথা ধর্ম সম্বন্ধে গভীর ঔৎসুক্যের সাড়ায়। আমার কাছে কী আগ্রহেই যে সে শুনত ভারতের ধর্মবাণীর কথা! আমাদের কথা হ'ত ফরাসী ভাষায়ই—ভ্লাদিমি ফরাসী জর্মন ও ইতালিয়ান তিনটি ভাষায়ই আলাপ করতে পারত। কিন্তু ইংরাজির সঙ্গে তার তেমন গভীর পরিচয় ছিল না, যদিও পড়তে পারত সহজ বই।

১৯২২ সালে সে প্রাগে একটি ভালো কাজ পেয়েছিল প্রশাসকদের মহলে। পরে সে ভাইস কনসাল হ'য়ে পারিসে যায়—সেখানে (১৯২৭ সালে) আমি তার অতিথি হয়েছিলাম। প্রাগেও আমি তার কাছেই ছিলাম। সে আর তার ফরাসী স্ত্রী মার্থা আমাকে সাদরে বরণ ক'রে নিয়েছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু ব'লে। সত্যিই অন্তরঙ্গ আদান-প্রদান। তাদের সঙ্গে ভেনিসে গণ্ডোলা নৌকাবিহারের স্মৃতি ভুলবার নয়। মার্থাও চমৎকার ইতালিয়ান বলতে পারত—তাই তাদের সঙ্গে ইতালিতে বসবাস হয়ে উঠেছিল সব দিক দিয়েই নিটোল। মার্থা আমাকে বোঝাতে চাইত ইতালির নানা চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের মহিমা। কিন্তু আমি ভালোবাসতাম শুধু ইতালিয়ান গান—যার সুর আমি পরে বাংলা গানে বসিয়েছিলাম। মার্থাও আমার গান শুনতে শুনতে বিহ্বল হ'ত ভ্লাদিমির মতনই। কাজেই ভেনিস প্রাগ ও পাঁচ বৎসর পরে প্যারিসে আমাদের ত্রয়ীর সংসার—menage a trois—সব দিক দিয়েই হ'য়ে উঠেছিল প্রায় নিখুঁৎ। প্রায় নিখুঁৎ বলছি এইজন্যে যে, মার্থা রাগ করত আমি নাচতে নারাজ ব'লে। "এদেশে এসে আমাদের নৃত্যগীতের সঙ্গে নৈযুদ্ধ্য ঘোষণা করলে সেটা হবেই হবে গর্হিত" বলত সে সঘনে। কিন্তু আমি যে সুভাষকে কথা দিয়েছিলাম কোনো মেয়ের সঙ্গে নাচব না। কেবল একবার মাত্র প্যারিসে গ্রামোফোনের রেকর্ড সঙ্গতে মার্থার সঙ্গে তিনচারটি পদক্ষেপ করেছিলাম তালে তালে। তবে সেখানে দর্শক ছিল কেবল ভ্লাদিমি। সে মৃদু হেসে বলেছিল, "আমি কিন্তু সুভাষকে লিখে দেব দিলীপ, যে তুমি আমার সরলা স্ত্রীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নেচেছ—আমি সাক্ষী।"

মার্থা হেসে কুটি কুটি। "লিখে দাও দাও—ও মুক্তি পাক বন্ধুর শাসনের বেড়াজাল থেকে।"

মার্থা ছিল তেজস্বিনী মেয়ে, তাই কথায় কথায় বলত: "স্বাবলম্বন ছাড়া মুক্তির আর কোনো পথ নেই।" আমি বলতাম: "বটে, কিন্তু সত্যিকার স্বাবলম্বন বড় দুর্লভ মণি সখী, আর অজ্ঞানের স্বাবলম্বন-ব্রত হ'ল খতিয়ে দম্ভব্রত—শুনতে গুরুগম্ভীর হ'লেও বিপদে পড়লে হয়ে দাঁড়ায় ছেলেমানুষি।"

১৯২২ সালে—যখন ভানেক দম্পতীর সঙ্গে আমার মিতালি হয়—আমার গুরু করণ হয় নি। সদ্‌গুরু খুঁজছিলাম, কিন্তু দোমনা হ'য়ে তাই মার্থার অঙ্গীকার ভালোই লাগত মোটের উপর, যার মর্ম হচ্ছে: "আপনার বুদ্ধিতে ফকির হওয়াও শ্রেয় পরের বুদ্ধিতে আমীর হওয়ার চেয়ে।"

ভ্লাদিমির কিন্তু ছিল স্বভাবে শ্রদ্ধালু। ভারতের মহাপুরুষদের কথা ও খুব মন দিয়েই শুনত আমার কাছে। আমি ওকে বলতাম: "গুরু করণের বিপদ আছে, মার্থার একথা মানতেই হবে। কিন্তু যখন দেখি বিবেকানন্দের মতন পক্ষিরাজ-তুরঙ্গমও শ্রীরামকৃষ্ণের লাগাম মানতে বাধ্য হয়েছেন তখন মনে হয় গুরুবাদ সম্বন্ধে সঠিক না জেনে শুধু জনশ্রুতির এজাহারেই তাকে বরখাস্ত করা মূঢ়তা।" এতে ভ্লাদিমিরর যে সায় ছিল তার আরো প্রমাণ পেয়েছিলাম কয়েক বৎসর পরে যখন আমি শ্রীঅরবিন্দকে গুরুবরণ করি।" কিন্তু সেকথা বলার আগে ওর জীবনের ইতিহাস কিছু বলা দরকার ভূমিকা হিসেবে।

ও আমাকে ১৯৪৯ সালে একটি পত্রে লেখে ইতালি থেকে (তার আগে ও আমাকে লিখেছিল মার্থার সঙ্গে ওর বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়েছে)।

"তোমার পত্রে তুমি লিখেছ: 'মানুষ আজ ক্ষিপ্তপ্রায়, বিশ্বমানবকে বাঁচাতে হ'লে সব আগে চাই নিজেকে বাঁচানো।' তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শোনো কী ভাবে আমাকে প্রাণে বাঁচতে হয়েছে।"

"জর্মনরা যখন ১৯৩৯ সালে প্রাগ অধিকার করে তখন প্রাণে বাঁচতে মোটরে ক'রে আমরা পালিয়ে গেলাম সুইডেনে। বাঁচলাম এক অঘটনে। সুইডেনে আমি স্বদেশের জন্যে জর্মনদের বিরুদ্ধে উঠে প'ড়ে লাগতে সুইস সরকার আমাকে দুবৎসর জেলে বন্ধ ক'রে রাখেন। অতঃপর ১৯৪৪ ও ১৯৪৬ সালে আমি চেক সরকারের এক মন্ত্রী হ'য়ে রোমে আসি। পরে প্রাগে এসে বসতে না বসতে ফের বলশেভিস্টরা সেখানে হানা দিল। অগত্যা আমাদের ফের রোমে এসে সংসার পাততে হ'ল। প্রাগ থেকে প্রায় কিছুই আনতে পারিনি কেবল তোমার ছবি ও চিঠি ছাড়া।... আমার কাছে একটি ছোট চিঠি আছে—শ্রীমা তোমাকে লিখেছিলেন: ভ্লাদিমির ভানেককে তুমি লিখতে পারো আমরা অন্তরে ওকে গ্রহণ করেছি—যথাকালে ওকে

জানাব কবে নাগাদ ও পণ্ডিচেরি আশ্রমে আসতে পারবে বরাবরের জন্যে।...এ-স্মারকগুলি আমার ধর্মজীবনেব মস্ত সহায়—শ্রীঅরবিন্দ আমার অন্তর আলো ক'রে আছেন বিশ্বাসরূপে। আমি যদি শেষ পর্যন্ত পণ্ডিচেরি যেতে না-ও পারি তাহ'লেও তিনি থাকবেন আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন যাঁর জন্যে বাঁচা সার্থক সব বেদনা সত্বেও। তুমি এবং তিনি আমার জীবন্ত স্বপ্ন আজকের দিনে। আর যদি মৃত্যু এসে হানা দেয় তাহ'লেও তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবই দেব।"

("Dans cette lettre tu as écrit · 'Le monde est detraqué aujourd' hui. Il n'y a aucun espoir de sauver l'humanité à moins qu'on se sauve d'abord.' Comme elles sont mille fois plus vraies, tes paroles, aujhourd'hui ! Voici comment nous avons essayé de nous sauver au moins physiquement depuis ce temps : En 1939, quand les allemands ont envahi Prague, nous nous sommes sauvés, ma femme et moi, en auto, en Suède. C'était presque un miracle que la chose a pu réussir. En Suède J'ai travaillé pour mon pays contre les allemands ce qui m'a valu deux ans de prison...Ensuite, en 1944 et 1946, j'étais Ministre de Tchécoslovaquie à Rome et puis be nouveau à Prague ou nous avons vu le pays se redressir et tomber de nouveau dans les mains des Bolchevistes. Et nous avons fuit de nouveau, cette fois en Italie ··ou je m'occupe de commerce. J'ai sauvé peux des choses de Tehécoslovakie mais ta photographie et ta lettre sont toujours avec moi · Et j'ai encore ce petit papier sur lequel il est écrit par la MÉRE : 'Vous pouvez lui écrire qu'en principe il est accepté ; mais que nous lui ferons savoir quand le moment sera venu pour qu'il vienne ici ··' J'y vois un signe spirituel qui est très renconfortant. Aurobindo Ghosh signifie pour moi une croyance—la seule vraie croyance que j'ai—il restera pour moi comme un rêve de cette vie qu'il a valu la peine de vivre—même si je n'arrive jamais á Lui et toi avec Lui. Peut-être unefois, aprés la morte je m'associérai á vous deux.")

এমন খোলো আনা আন্তরিক ও শ্রদ্ধাবান্ মানুষ আমি বেশি দেখি নি জীবনে। শুধু আন্তরিক নয়, আদর্শের জন্যে যে অনেক কিছু ছাড়তে প্রস্তুত, মরণকেও যে ভয়

করে না। প্রাগে ও প্রথম নাজিদের বিরুদ্ধে পরে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল ব'লে বহু দুঃখ বিপদের মধ্যে দিয়ে ওকে যেতে হয়েছিল—যেসব দুঃখ বিপদকে ও সহজেই এড়িয়ে যেতে পারত যদি শুধু সাবধানীদের মতন মুখ বুঁজে থাকত। কিন্তু ও স্বভাবে ছিল ঐকান্তিক ও সরল, তাই পর পর জর্মন গেষ্টাপো ও রুষ চেকা পুলিশ ওর পিছু নিয়েছিল—যার ফলে ওকে শেষটায় শুধু যে দেশত্যাগী হ'তে হয়েছিল তাই নয়—মার্থার সঙ্গে ওর নিবিড় প্রেমও মন্দা হ'য়ে এসেছিল তার বলশেভিস্‌মের দিকে ঝোঁকার দরুণ।

মার্থার কথা এখানে একটু বলি। সে ছিল খাঁটি বিদুষী। জর্মন. চেক, ইতালিয়ান ও ফরাসী চারটি ভাষায় অবাধে আলাপ করতে পারত। আমি যখন প্রাগে তাদের অতিথি হই তখন মার্থার চেষ্টাতেই আমার প্রেসিডেণ্ট মাসারিক-এর সঙ্গে সান্ধ্যভোজনের পর লেনিন গান্ধি টলস্টয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মার্থা সে সময়ে প্রেসিডেণ্ট মাসারিক ও তাঁর মন্ত্রী বেনোয়াকে গভীর শ্রদ্ধা করত। টলস্টয়ের নৈরাজ্যবাদও (anarchism) ওকে টেনেছিল। কিন্তু সব আগে ছিল ও খৃষ্টভক্ত। ওদের ওখানে যখন আমি অতিথি হই (লুগানো পর্বের পরে) তখন ও আমাকে শোনাত—ফরাসীতে—বাইবেলে খৃষ্ট বাণী, আর আমি শোনাতাম ওকে গীতা ও শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। বাইবেলে আমার ভক্তি আসে প্রথম মার্থার খৃষ্টভক্তিরই ছোঁয়াচে।

কিন্তু ও ছিল স্বভাবে বিষম উচ্চাশিনী। তাই চাইত ভ্লাদিয়া বড় রাজপুরুষ হয়। শহীদ আমাকে বলত: "মার্থা বড় সোজা মেয়ে নয় দিলীপ। যাকে ভালোবাসবে তাকে হয় চালাবে কাছে টেনে, নয় দুঃখ দেবে দূরে ঠেলে। ভ্লাদিয়ার আইন পড়তে ঘোর অনিচ্ছা. কিন্তু মার্থার উপরোধ ওকে আইন-পরীক্ষা দিতেই হবে আজ না হয় কাল।"

আমি সেসময়ে যাকে বলে সবুজ তরুণ—green youth—এতশত বুঝতাম না। আমি দেখতাম মার্থা ও ভ্লাদিয়ার মধ্যে নিবিড় প্রেম। কিন্তু নিবিড় ও গভীর সমার্থক নয়। ভ্লাদিয়া পরে আমাকে বলেছিল—নানা চিঠিতেও লিখেছিল—যে মার্থার সঙ্গে ওর সম্বন্ধের কোনো স্থায়ী আদর্শের ভিৎ ছিল না। কারণ ভ্লাদিয়া ছিল সত্যিকার ভগবৎ-বিশ্বাসী ভাগবত জীবনের পূজারী, মার্থা খৃষ্টকে ভক্তি করত কিন্তু বলত প্রায়ই তাঁর কথা: "সীজরকে দাও যা তাঁর প্রাপ্য, যেমন ঈশ্বরকে দেবে যা তাঁর নিজস্ব।" এককথায় মার্থা ছিল ঐহিক+বিচক্ষণ+ধার্মিক+উচ্চাশিনী+সামাজিক। আদর্শবাদী বলতে যা বোঝায় তা ও ছিল না, কারণ ওর আদর্শ বদলে যেত প্রায়ই। বলত আমাকে অকুণ্ঠেই: "বাঁচা মানেই চলা দিলীপ, আর চলা মানেই বদল। এই দেখ না, যে-আমি আবাল্য খৃষ্টভক্তির আবহে মানুষ

সেই আমি আজ লেনিনকেও মহান্ মনে করি।" আমি এধরণের কথায় ঘা খেতাম, কিন্তু ও ছিল তীক্ষ্ণধী, তর্কে হারবার পাত্রী নয়। সময়ে সময়ে আমাদের তর্কের চকমকিতে আগুনের ফিনকি বেরুত—শান্ত করত ভ্লাদিমা আমার তরফে দাঁড়িয়ে। কারণ বলশেভিস্‌মকে সে আদৌ ভালোবাসত না। ওদের পরে বিবাহচ্ছেদ হয় মার্থা কম্যুনিষ্ট হ'য়ে মস্কো যাবার পরে। আমাকে একটি চিঠিতে ওয়ার্স থেকে মার্থা লিখেছিল যে, ধর্ম মানুষকে অনেক কিছু দিতে পারে—এমন কি শান্তিজলও ছড়াতে পারে, কিন্তু মানুষের দুঃখ নিবৃত্তি হ'তে পারে কেবল রাষ্ট্রের নিপুণ চালনায়। তাছাড়া শান্তি খানিক দূর পর্যন্ত আমাদের আশ্রয় দিতে পারলেও এ-ভূমিকম্পের যুগে ধর্মের খুঁটিও টলমল ক'রে উঠেছে এ-সত্য খোলা চোখেই দেখা যায়…ইত্যাদি।

কিন্তু সে-সময়ে—পঞ্চাশ বৎসর আগে—ও এতটা জটিলা (sophisticated) ছিল না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ শ্রীঅরবিন্দ গীতা বগীয় ধর্মকথা সাগ্রহেই শুনত। আমাকে একবার একটি চিঠিতে লিখেছিল: "তোমার সরল বিশ্বাস থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছিলাম দিলীপ, তাই তোমার বন্ধুত্বের কথা কোনোদিনই ভুলতে পারব না।" আজ সে কোথায় আছে জানি না, সম্ভবতঃ মস্কোতে। তবে আমার মনে হয় না তার স্বাবলম্বী মন রুশ ডিকটেটরদের ব্রজবিধান মেনে নিয়ে থাতয়ে শান্তি পাবে। কিন্তু তার সঙ্গে যোগসূত্র বহুদিন আগে সে নিজেই যখন ছিন্ন ক'রে নাস্তিক রুষপন্থিনী হয়েছে তখন তার সম্বন্ধে আর কিছু না বলাই ভালো—আরো এইজন্যে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তার কাছ থেকে আর কোনো খবর পাই নি। তবু প্রার্থনা করি সে যেন পায় যা সে চায়—মানব-হিতৈষণার মাধ্যমে? এখানে তার কোনো ফাঁকি ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন: 'Imperfect is the joy not shared by all." অর্থাৎ "নিখুঁৎ নহে সে-সুখ সর্বভোগ্য নয় যার স্বাদ।" এইই হ'ল এ যুগের বাণী—পারি বা না পারি আমাদের প্রত্যেককেই চাইতে হবে নিত্যানন্দের স্বাদ বিশ্বজনকে পরিবেষণ করতে, অবিচার ও বৈষম্যের দুর্ভোগ থেকে দুর্গতদের মুক্তি দিতে। নোবেল লরিয়েট আলবের কাম্যু (Albert Camus) তাঁর বিখ্যাত The Rebel গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন: "The most pure form of the movement of rebellion is thus crowned with the heart-rending cry: 'If all are not saved what good is the salvation of a handful only?" অর্থাৎ বিদ্রোহের শুদ্ধতম ছন্দ আবহমানকাল নিজেকে জানান দিয়ে এসেছে আমাদের অন্তরাত্মার এক অরুন্তুদ আর্তনাদে: সবাই যদি মুক্তি না পায় তবে মাত্র কতিপয়ের মুক্তি দিয়ে কী হবে?

কিন্তু হায় রে, জগতের প্রগতি কীভাবে হয়েছে—সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে নব সুষমার আত্মপ্রকাশ কেমন ক'রে মানুষকে বাধার পথেই এগিয়ে দিয়েছে তার কোনো নিশ্চিত জ্ঞান বিনা কী ক'রে জানব কোন্ পথে মানুষের দুঃখনিবৃত্তি হবে—কোন্ ব্যবস্থায় "স্বর্গ নামিয়া আসিবে মর্ত্যে স্বর্গে উঠিবে ধরণী ?" আমাদের দৃষ্টির পরিধি কতটুকু ? কীই বা বুঝি আমরা এ-বিশাল গতিপ্রমত্ত কোটি কোটি সূর্য চন্দ্র নীহারিকার লীলার লক্ষ্য, কেনই বা এক অনুপরিমাণ জীবের মাথায় খেয়াল চাপল এ-সমস্যার সমাধান করতেই হবে—প্রতিপদে জগতের বিবর্তন কেন পথকেটে চলেছে নিত্যসংঘর্ষের প্রহেলিকার মধ্যে দিয়ে ? আমরা শুধু পারি নিজের মুক্তিপথে অগ্রসর হ'তে—তাও বহু কষ্টে চোখের জলে, সংশয়ের দ্বিধার প্রশ্নের অশান্ত নাগরদোলায় টলমল টলমল করতে করতে। তাই মার্থার পক্ষে কোন্ পথ সুপথ আর কোনটা বিপথ কেমন ক'রে বলব যখন দেখি যে-নিজেকে নিয়ে আশৈশব ঘর করেছি তারো কোনো ধ্রুবপরিচয় পেতে পদে পদে নাজেহাল হ'তে হয় ? ধ্রুবদিশা পান কয়েকজন —মানি, কিন্তু কজনই বা ? সব মানুষের গতি না হ'লে শুধু দুচারজনের প্রগতি দেখে দুর্গতরা কতটুকু সান্ত্বনা পায় ? তাই মার্থাকে বিচার করা ছেড়ে ফিরে আসি ভ্যাদিয়ার প্রসঙ্গে।

বলেছি, ওর ছিল গভীর আস্থা ভারতের যোগ ধর্ম ও মহাজনের বাণীতে। শ্রীঅরবিন্দের কথা আমি যখনই ওকে বলতাম বা লিখতাম ও সাড়া দিত সর্বান্তঃকরণে। ও সত্যিই চেয়েছিল য়ুরোপ ছেড়ে ভারতে এসে সাধনার আসন পাততে। কিন্তু ওর স্ত্রী আনালিসা ও কন্যা মিরার দায়িত্বকে ও এড়াতে পারে নি, আরো এইজন্যে যে, স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে ওর পুরো মনের মিল ছিল।

তবু ওর অমৃতাশী মন আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল এই ভেবে যে, আমি আপ্তকাম হয়েছি শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবনের দীক্ষায়। ওকে মাঝে মাঝেই শ্রীঅরবিন্দের নানা চিঠির সঙ্গে আমার খবর দিতাম—বিশেষ ক'রে শ্রীঅরবিন্দের কাছে কীভাবে পথের পাথেয় ও কাব্য ও গানের প্রেরণা পাচ্ছি। একটা উদাহরণ দিই।

ওকে আমাদের FLUTE CALLS STILL বইটি পাঠাতে ওর সে কী বালসুলভ আনন্দ! লিখল আমাকে একটি চিঠিতে (ফরাসীভাষায়) ৩রা আগস্ট ১৯৬৪ :

"দিন পনেরো আগে আমি তোমার অপূর্ব বইটি পেয়েছি। আমি তোমাকে তখনি তার ক'রে আমার আনন্দ জানাতে চেয়েছিলাম···প্রতিদিন সকালে বইটি পড়তে পড়তে মনে হ'ত আমি তোমাদের মন্দিরে। প্রতিদিন আমি আনালিসা ও মীরাকে আগের দিন যে-অধ্যায়টি পড়েছি তার কথা বলি।

"আহা, আলোর তীর্থপথে তুমি কত এগিয়ে গেছ দিলীপ! কত না আনন্দবীজ

তুমি বুনে চলছ লোকের মনে! এ-পথের সম্বন্ধে আমি কিছুটা জানি—তাই তোমার বইটিতে কিছুই আমার কাছে উদ্ভট মনে হয় নি। আমি শুধু বলি—আমি যেন পারি তোমাদের অনুগমন করতে। তাছাড়া আমি শুনেছি তোমার গান, দেখেছি সামনে ইন্দিরাকে নাচতে ·····

"আমরা তোমার আশ্চর্য প্রাণশক্তির কথা ভাবতে উজিয়ে উঠি।···ধ্যানদর্শন, সে-সম্বন্ধে লেখা, গান করা, নানা জিজ্ঞাসুর সঙ্গে আলাপ করা পূজার মহোৎসব তোমাদের আশ্রমের হাজারো ব্যবস্থা করা··তার উপরে ইন্দিরার হাঁপানি আর্থরাইটিস—সে কেমন আছে এখন? তুমি এখন ৬৭ বৎসর পেরুলে—কিন্তু ঠিক সেই যুবকই আছ যাকে আমি দেখেছিলাম লুগানোয় প্রাগে। অদ্ভুত! তোমার বিশাল আত্মাই তোমাকে এত শক্তি দিয়েছে—কালাতীত হবার শক্তি।···আমাদের চিঠি লিখো দিলীপ, তোমার আশীর্বাদের আমাদের দরকার আছে।

এ-চিঠিটির শুধু শেষাংশটুকু উদ্ধৃত করি:

"Nous admirons vraiment votre magnifique energie! Comment est-ce possible a´ suffire a´ tout cela? Avoir des visions, e´crire, chanter, parler aux gens, faire des fôtes et penser aux milles choses de votre Ashram! Et avec cela pauvre Indira souffrante de cette terrible asthme et arhtrite! Et toi avec tes 67 ans—tu es toujours le même jeune homme comme je t'ai connu a Lugano! C'est ton grand esprit qui te tient hors de temps . . E´cris-nous souvent, cher Dilip—nous avons besoin de toi et ta be´ne´diction.

Castilione della Pescaia 2/8/1964

Cav. Gr. Cr. Vladimir Vanek."

ইংরাজী ও পড়তে পারত কিন্তু ইংরাজীতে বলতে কি লিখতে পারত না। এতে আমার সুবিধা হয়েছিল কারণ মার্থা আর ভ্লাদিমির সঙ্গে সমস্তক্ষণ ফরাসী ভাষায় ভাবের আদানপ্রদান করতে করতে আমার ফরাসী ভাষায় কথা বলা আরো সহজ হ'য়ে এসেছিল, লিখতেও বেগ পেতাম না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—একথার মার নেই। ফরাসী ভাষাকে আমি বরণমালা দিয়েছিলাম যৌবনের উচ্ছলতায়: ফরাসী বাণীদেবীও আমাকে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন: "তথাস্তু ফরাসী ভাষায় তুমি রোলাঁর সঙ্গেও সমানে কথাবার্তা চালাতে পারবে—অন্য বন্ধুবান্ধবীরাও তোমার উৎসাহকে উদ্দীপ্ত করবেন।"

তাই আজ জীবন সন্ধ্যায় দেখতে পাই একের পর এক ফরাসী ও রুষ বন্ধুবান্ধবী আমাকে বন্ধু ব'লে বরণ করেছিল এই মঞ্জুল ও সুকুমার ভাষায়। ভ্লাদিমি অবশ্য

আমার চেয়ে বেশি পোক্ত হয়ে উঠেছিল ফরাসী ভাষায়। তা হবে না—যার গৃহলক্ষ্মী ফরাসিনী?

মার্থার কথাও আরো বলতে ইচ্ছা করে কিন্তু সে ছিল একরোখা মেয়ে। তাই খৃষ্টদেবের বাণী ছেড়ে অন্তিমে কার্ল মার্ক্সের বাণীর দিকে ঝুঁকেছিল। আমাকে শেষ চিঠি লিখেছিল কবে ঠিক মনে নেই তবে বোধহয় চেক রাজ্যে রুষদের হানা দেওয়ার পরেই। ভ্লাদিয়া তার কথা বলতে চাইত না—কেন কল্পনা করা কঠিন নয়। তাই তাকে আমি খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করিনি। তবে সে বলেছিল যে, মার্থা সম্ভবতঃ রুষদেশে গিয়ে বলশেভিকদের কাছে দীক্ষা নিয়েছে মার্ক্সবাদের।

মার্থা ও ভ্লাদিয়ার সঙ্গে ১৯২৭ সালে দেখা হয় নীসে—একবারে হঠাৎ। অঘটন ঘটে না এ-যুগে কে বলে? নীসের রাস্তায় একা চলেছি—দুলছি দ্বিধায়—আমেরিকা যাব রাসেলের জাহাজে, না পণ্ডিচেরি যাব সব ছেড়ে? আমেরিকায় নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, এডিসন কোম্পানীর লং-প্লেইং রেকর্ড করতে চেয়েছিলেন তাঁরা বিশেষ ক'রে আমার ঢঙের গান—তাল ও তালফেরে সমৃদ্ধ। সুভাষ য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে সভা ডেকে আমাকে মালাচন্দন দিয়ে একরকম জোর ক'রেই পাঠিয়ে দেয় সাগরপারে—আরো আমার কাছে শ্রীঅরবিন্দ-মহিমাকীর্তন শুনে। বলেছি, ও আমাকে পই পই ক'রে মানা করত বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকতে, চাইত—আমরা দেশের সেবা ক'রে কর্মযোগে আপ্তকাম হব।

কিন্তু দশচক্রে আমার চরণ মার্কিন মুখী হ'লেও নয়ন ছিল পণ্ডিচেরিমুখী। এহেন আমি ১৯২৭ সালে পল রিশারের দেখা পাই যাঁর অপরূপ কথাবার্তার অনুলিপি লিখে রাখি—পরে প্রকাশ করি আমার "এদেশে-ওদেশে" ভ্রমণকাহিনীতে। কিন্তু সেকথা বলবার আগে বলি—ভ্লাদিয়ার সঙ্গে কিভাবে দেখা হ'য়ে গেল হঠাৎ।

ও তখন প্যারিসে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাইস কনসাল হ'য়ে ছিল এক রম নিঃয়ে। নীসে এসেছিল—চেঞ্জে। আমি মার্সেল্‌স থেকে সোজা নীসে গিয়েছিলাম—সেখানে কিছুদিন সাগরতীরে একটা বৈরাগ্যের সুর ভাঁজব ভেবে। নীসে আমাকে কেউ চেনে না বেশ একলাটি থাকা যাবে। মনের সঙ্গে মুখোমুখি হ'তেই হবে—মনস্থির করা কি সহজ ব্যাপার?

চলেছি স্নিগ্ধ উদার রাজপথে (promenave) সাগরতীরে। এদিকে সাগর ওদিকে ছবির মতন সব বাড়ী। ফরাসীরা বাগান বড় ভালোবাসে। প্রতি বাড়ীর সংলগ্ন এক একটি বাগান। কী সুন্দর যে।

হঠাৎ পিছনে চিৎকার: "দিলীপ!"

ভ্লাদিয়া, পাশে স্মিতমুখী কমনীয়া মার্থা!! তখনো ওদের দাম্পত্য সম্বন্ধে ফাটল ধরেনি। আমি ভেবেছিলাম নীস থেকে স্পেন যাব (স্পেনে আমার গানের নিমন্ত্রণ

ছিল মাদ্রিদে) যেখান থেকে পারিস গিয়ে ভ্লাদিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করব। নীস থেকে ওদের কিছু লিখি নি। কিন্তু নিয়তিকে ঠেকাবে কে? দেখা হয়ে গেল আচমকা সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যের সুর টিমিয়ে এল। আমি উঠে এলাম আমার ছোট হোটেল থেকে ওদের বড় হোটেলে। আমার ঠাঁই হ'ল ওদেরই পাশের ঘরে। এই ঘরেই দুদিন বাদে পল রিশার এসে অপরূপ ফরাসীতে বলেছিলেন তাঁর আশ্চর্য জীবনের ও উচ্ছল স্বপ্নের কথা—সেই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কাহিনী। অঘটন আর কার নাম—যার ফলে আমার নীসের প্রবাসী জীবন হ'য়ে উঠল আশ্চর্য—অবিস্মরণীয়।

বত্রিশ

১৯২০ সালে পল রিশার-এর একটি বই প্রকাশিত হয়—ইংরাজীতে। ১৯১৯-এ টোকিয়োর ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে পল রিশার যে-ভাষণ দেন এটি তারই ইংরাজী তর্জমা। এ-ভাষণে রিশার বলেছিলেন—চীনের বুদ্ধি, জাপানের সৌকুমার্য (refinement) ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা এই ত্রিবেণীসঙ্গমের প্রাণবেগে জগতে এক নব জ্যোতির বান ডেকে যাবে—যে-ধারায় জেগে উঠবে নীটশের অহংমত্ত অতিমানব নয়—"এশিয়ার দেবমানব, করুণার অবতার—নবজগতের স্রষ্টা।" "তাই" বলেছিলেন রিশার সঘনে, "তোমরা হাত পাতো এই মহনীয় ভাবিকালের কাছে দীক্ষা চেয়ে, কারণ এশিয়ার মহামানবদের আবির্ভাব আসন্ন। এই যে দিব্য অবতার, এসেছে তারা—যাদের খুঁজেছি আমি সারা জীবন—আর তাদের মুকুটমণি শ্রীঅরবিন্দ এই অনাগতকালের একচ্ছত্র অধীশ্বর। সেদিন এল ব'লে যেদিন তিনি তাঁর ধ্যানপীঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন দিনের পূর্ণ আলোয় জগদ্‌গুরুর আসন গ্রহণ করতে। LES DIEUX ভাষণে তিনি লিখলেন:

"Car si l'homme partage avec tous les êtres l'empire de la terre, de l'eau, de l'air, lui seul est gardien de la flamme, maître du feu."

অর্থাৎ, জৈবলীলায় মাটি আলো হাওয়ার সাম্রাজ্যে মানুষ আর সব প্রাণীরই সহযাত্রী, সরিক—কেবল বহ্নিসম্পদে সে একেশ্বর, অগ্নিরাজ।

অপিচ (এবার শুধু অনুবাদ পেশ করি):

"যদি তিনি কিম্বা তাঁর কোনো প্রতিভূ আমাদের এ-দ্বন্দ্বের রাজ্যে নেমে আসেন, তবে এ-আস্তিক-নাস্তিক-আধ্যাত্মিক বস্তুতান্ত্রিকের ডামাডোলের মধ্যে তাঁকে চিনে নেব কোন্ নিরিখে? না, তাঁর অপরিসীম সহিষ্ণুতায়। তিনি কাউকেই তিরস্কার করবেন না তো, বলবেন সবাইকেই: 'ওরে, তোরা কেন পরস্পরকে দোষ দিস, তোদের ভেদের জন্যে? একটা ছোট্ট ইমারৎ তুলতে কতরকম মালমশলা লাগে বল্ দেখি? তবু তোরা মনে করিস—পরম সত্যের প্রাসাদ গড়া যাবে নানা বিরোধী উপকরণের মিলন না ঘটিয়ে? এ-সব সৃষ্টিলোকে যখন প্রতি উপাদান তার নিজের যথাস্থান খুঁজে পাবে তখন দেখবি তাদের মধ্যে কোনোই বিবাদ নেই।"

১৯২৪ সালে যখন শ্রীঅরবিন্দকে পণ্ডিচেরিতে প্রথম দেখি তাঁর গুরুগম্ভীর যোগাশ্রমে তখন শ্রীঅরবিন্দের "আর্য" পত্রিকার পাতায় দেখেছিলাম পত্রিকাটির সম্পাদক—শ্রীঅরবিন্দ, পল রিশার ও তজ্জায়া মিরা রিশার। পল রিশারের কয়েকটি

জ্ঞানগর্ভ বাণীর (aphorism) বলিষ্ঠতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। সাধকদের মুখে এ-ও শুনেছিলাম যে তিনি আশ্চর্য কথা বলেন—a brilliant conversationalist. তাই মনে নানা জল্পচিত্র আঁকতাম তাঁর ব্যক্তিরূপের।

নীসে একদিন হঠাৎ তিনি আমাদের হোটেলে এসে হাজির। আমি তো আহ্লাদে আটখানা। ওঁর কথা ইতিপূর্বে কয়েকবার বলেছিলাম আমার বন্ধু বান্ধবীকে। তারাও তাই ভারি উৎফুল্ল—শ্রীঅরবিন্দের কথা শোনা যাবে তাঁর কাছে। শ্রীঅরবিন্দের যোগিরূপ সম্বন্ধে পল রিশারের কাছে নানা গুহ্য খবর পাব ভেবেও পায়ে কাঁটা দিল আমার। মার্থা ও ভ্লাদিমিরও বিষম খুশী পল রিশারের সঙ্গে ফরাসী ভাষায়ই আলাপ জমবে ভেবে।

পল রিশার ছিলেন কতকটা ভলতেয়ারের মতন রসিক—satirist—আনাতোল ফ্রাঁসের মতন দরদী humourist নন যিনি বলতেন একাধারে দেখা দ্রষ্টা তথা বিচারক (le témoin et le juge) হ'ন ঠাট্টা ও করুণা (l'Ironie et la pitié): পল রিশারের কয়েকটি 'এপিগ্রাম' উদ্ধৃত করলে আমার বক্তব্যটি প্রাঞ্জল হবে:

Dimanche. Jour où s'étant reposé, ses fidèles l'en remercient

রবিবারে প্রভু নিলেন বিরাম, হ'ল না সেদিনে নূতন সৃষ্টি,
তাই তো সেদিনে ভক্তরা তাঁর ঝরান ধন্যবাদের বৃষ্টি।

La conscience est un juge integre qui ne tourmente que les bons et qui laisse courir les mauvais.

বিবেক কঠোর ন্যায়বিচারক করে কশাঘাত শুধু সুজনে,
দুর্জনে দিয়ে নিষ্কৃতি—তাই চিরজয় তার রটে ভুবনে।

Par ennui Dieu créa le monde, par honte depuis il se cache.

বেকার কর্তা ঝোঁকের মাথায় করি' এ-দারুণ জগত সৃষ্টি
লজ্জায় চিরপর্দানশীন—কেমনে সহেন লোকের দৃষ্টি ?

এ-হেন রসিক তথা মহামনীষী শুনেছিলেন—একটি ভারতীয় যুবক নীসে-এ এসেছেন। শুনেই আমাদের হোটেলে তাঁর আবির্ভাব। তখন আমরা ত্রয়ী হোটেলের ভোজনাগারে। সসম্ভ্রমে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসালাম আমাদের বৈঠকখানায়।

দিন কয়েক কী তোড়ই যে ছুটল গল্পালাপের। শ্রীমার উপদেশ মনে পড়ল—আমার ডায়রিতে টুকে রাখতাম। পরে মার্থা ও ভ্লাদিমিরও কিছু কিছু জুড়ে দিত যা আমি মনে রাখতে পারি নি। তবে এ-রকম চুক আমার বেশি হয় নি—আমার

বন্ধুদম্পতী দুজনেই আমার অনুলিপির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন। এর আগে ১৯২২ সালে আমি রোলাঁর বাণীর অনুলিপি লিখেছিলাম তারপরে বার্টাণ্ড রাসেলের। স্বদেশে অনুলিপি লিখেছিলাম শ্রীঅরবিন্দের, মহাত্মাজির ও রবীন্দ্রনাথের—যেগুলি যথাকালে তীর্থংকর ও Among the Great-এ প্রবাহিত হয়।

আর একটু ভূমিকা আছে: রবীন্দ্রনাথ একদা জাপানে পল রিশারকে দেখে তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। লিখেছিলেন অকুণ্ঠেই:

"When I met Monsieur Richard in Japan, I became more assured in my mind about the higher era of civilization than when I read about the big schemes which the politicians are formulating for ushering the age of peace into the world···When gigantic forces of destruction were holding orgies of fury, I saw this solitary young Frenchman, unknown to fame···his face beaming with the lights of the New Dawn and his voice vibrating with the message of New Life, and I felt sure that the great To-morrow had already come, though not registered in the calender of the statesmen."

(ভাবার্থ: বিশ্বশান্তির যে নবযুগ আসন্ন তার সম্বন্ধে রাজনৈতিকদের লম্বা লম্বা কথায় আমার মন তেমন আশ্বস্ত হয় না যেমন হয়েছিল আমার মসিয়ে রিশারকে দেখে। যখন মহাকায় ধ্বংসশক্তির দল জগৎকে নিয়ে রক্ততাণ্ডবে মত্ত তখন আমার চোখে পড়েছিল এই নিঃসম্বল ফরাসী যার অপর নামও কেউই জানত না, অথচ যার মুখে দেখেছিলাম প্রাণবাণীর জ্যোতিঃপ্রভা। তাকে দেখে আমার সত্যিই মনে হয়েছিল যে, ভাবী মহাযুগের সূচনা হয়েছে যদিও রাজনৈতিকদের পঞ্জিকা তার কোনো খবর রাখে না।)

কেবল রিশার ছিলেন পুরোপুরি আত্মসচেতন, তাই হয়ত সময়ে সময়ে বিষাদে মুহ্যমান হয়ে পড়তেন। কিন্তু সে-কথা যথাস্থানে।

আমিই প্রথম কথা কইলাম: "আপনার দীর্ঘশ্মশ্রু দীপ্ত সৌম্য কান্তি রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয়। মনে হয় রূপে আপনি তাঁর দোসর।

রিশার (মাথা হেলিয়ে): ধন্যবাদ।

মার্থা: তাঁকে আপনার কেমন লাগে?

রিশার: কবি বটে। গন্ধর্ব, রূপদেব। কেবল কি জানো—জীবনে কুরূপের সংস্পর্শে বেশি আসেন নি।

আমি: মন্দ কি?

রিশার : জীবনের তমস্-এর আসুরিক দিকটার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে জগতে বলীয়ান্ হওয়া যায় না। বোধ করি এই জন্যেই কর্মজগতে তিনি এত দুর্বল।

আমি : কর্মজগতে সবল বলতে আপনি ঠিক কী বোঝেন একটু খুলে বলবেন ? দুএকটা নমুনা দেবেন—আপনার মতে সবল মানুষ কে ?

রিশার (তৎক্ষণাৎ) : কেন—গান্ধি, অরবিন্দ।

ভ্লাদিমা : গান্ধি সম্বন্ধে কিছু বলুন না।

রিশার : আমেদাবাদে তাঁর সঙ্গে আমার প্রায়ই বাধত। মনে হ'ত শক্তিমান পুরুষ বটে, অথচ তাঁর সঙ্গে অত মিলে মিশেও কেমন যেন ধাঁধা লাগত। মনে হ'ত —তাঁকে যেন ঠিক চিনতে পারি নি। খটকা লাগত—এই কৃশকায় ছোট্ট মানুষটিই কি আজ সত্যিই ভারতের ছত্রপতি ? কিন্তু তাঁর নেই কল্পনা। বড় একরোখা। ঐখানে রবীন্দ্রনাথ জিতেছেন।

ভ্লাদিমা : একরোখা বলতে ঠিক কী বোঝেন আপনি বলবেন ?

রিশার (হেসে) : শুনুন তবে একটা কথা বলি চুপি চুপি। দেশে যখন নৈযুজ্যের বান ডেকে গেছে, আবেগ চারদিকে থই থই করছে, তখন একদিন অরবিন্দ আমাকে বললেন—দেখে নিও, গান্ধি তাঁর একগুঁয়ে অহিংসার আইডিয়ার পায়ে দেশকে বলি দেবেন।

মার্থা (খুশী) : একথাটা আমার খুব মনে ধরেছে।

আমি : কিন্তু আপনার মতটা আর একটু খুলে বলবেন ?

রিশার : আসল কথাটা এই যে, আসুরিক আখড়ায় আধ্যাত্মিক হ'তে যাওয়াটা যেমন খাপছাড়া, আধ্যাত্মিক আখড়ায় আসুরিক ধুমধামের বেলায়ও ঠিক তেমনি। এদের ক্ষেত্রই আলাদা, তাই দেবাসুরকে আলাদা করে দেখলে আর একটু প্রাঞ্জল হবে আমার ভাষ্য। পেরেক কাঠে বা মাটিতে বসাতে গেলে হাতুড়িই সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশি কাজ দেয়—নয় কি ? সেখানে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োগ হবে অপচেষ্টা। ঠিক তেমনি, কোনো বুদ্ধিমান মানুষের ওপর জোর খাটিয়ে কাজ হাসিল করার চেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে—তার বুদ্ধির কাছে দরবার ক'রে তাকে নিপুণ কর্মী ক'রে তোলা, যেহেতু এখানে আমাদের সাধনা মনঃশক্তির এলাকায়। তাই গান্ধিকে আমি বলতাম—রাজনীতির আখড়া হ'ল কুরুক্ষেত্র ওরফে আসুরিক—যেখানে বাঘে কুমীরে লড়াই মোষে ভালুকে ধ্বস্তাধ্বস্তি—ওখানে ধর্ম ? রামচন্দ্রঃ।

আমি : কিন্তু আপনি কি স্বীকার করেন না যে, আসুরিক শক্তির চেয়ে আধ্যাত্মিকতা অনেক সময়ে বেশি কাজ দেয় ?

রিশার : করি। কেবল, এ-শক্তির ফল রাতারাতি ফলে না, হাতে হাতে গুণে কি মেপে দেখানো যায় না যে, দুই আর দুইয়ে চার।

মার্থা : আর একটু খুলে বলবেন—ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি ?

রিশার : শোনো। জগতে খৃষ্টপ্রমুখ হাজার হাজার খ্যাত ও অখ্যাত মার্টার প্রাণ দিলেন কেন ? হত্যাকারীর অত্যাচার উৎপীড়ন রাতারাতি কমবে ব'লে কি ? তাঁরা এমন অবোধ ছিলেন না। অথচ রাতারাতি অত্যাচার কমল না ব'লেই বলা যায় না যে, তাঁদের বৃথা প্রাণ দেওয়াই সার। সত্যের জন্যে জেহাদে তাঁরা যে প্রাণ আহুতি দিলেন তার যজ্ঞতেজ জমা হ'য়ে রইল না কি মানুষের বুকে ? কিন্তু যখন জমা হ'তে থাকে তখন কাজ হয় না। আগে বারুদপর্ব—পরে, অনেক পরে লঙ্কাকাণ্ড, এই আর কি। এই হিসেবে দেখলে অহিংসার শক্তিও একটা প্রত্যক্ষ শক্তি—কে না মানবে ?

আমি : তাহ'লে মহাত্মাজিকে দুষছিলেন কেন ?

রিশার : দুষি নি ঠিক। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম– গান্ধি তাঁর অহিংসা কাজ যেভাবে হবে ভাবছেন সেভাবে সিদ্ধিলাভ হয় না—হ'তে পারে না। তাছাড় তাঁর মূল দীক্ষাটাই ভুল। তিনি ভাবেন অহিংসার শক্তির ফল প্রত্যক্ষ হবে দেখতে দেখতে। কিন্তু ধরো, যদি তিনি বলতেন খোলাখুলি যে, তিনি অহিংসাব্রতী হয়েছেন রাতারাতি দেশোদ্ধার করতে নয়, ভাবিকালের জন্যে এর তেজঃশক্তি জমিয়ে রাখতে—কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে সে জ্বলে উঠে আমাদের সব বন্ধন পুড়িয়ে দেবে—তাহ'লে তাঁর অহিংস অসহযোগে লোকে দলে দলে সাড়া দিত মনে করো কি ? সাড়ে পনেরো আনা মানুষ চায় নগদবিদায়। কবে কোন্ সুদূর কালের ক্ষেত-এ আজকের কর্মবীজের ফসল ফলবে ভেবে সে বীজ বুনতে এগোয় না। (থেমে) কিন্তু হ'লে হবে কী—একবার আমি যখন গান্ধি ও তিলকের তুলনা ক'রে বলেছিলা যে, তিলক যেমন দেশের জন্যে তাঁর আইডিয়াকে ছাড়তে রাজী ছিলেন, গান্ধি তেমনি আইডিয়ার জন্যে দেশকে ছাড়তে রাজী—তখন অনেকেই মুখ ভার করেছিলেন।

আমি (হেসে) : কেন ?

রিশার (হেসে) : উল্টোবুঝে—আর কেন ? লোকে ধ'রে নিল—আমি এ-তুলনা করছি কোনো গূঢ় দুরভিপ্রায়ে—দুজনের একজনকে ছোটো করতে চেয়ে—যদিও কাকে যে ঠিক ছোট করা হ'ল ঠাউরে না পাওয়ায় কী ভাবে রাগ করা উচিত তারা ভেবে পেল না। কিন্তু আমি সত্যিই কোনো কুমৎলবে বলি নি কথাটা। আমি দেখাতে চেয়েছিলাম—দুজনেই বড় ব্যথাবরণ করার দিক দিয়ে।

ভাদিয়া : কি রকম ?

বিশার : তিলকের মতন স্বভাবদার্শনিকের কাছে আইডিয়ার দাম খুব বেশি একথাটা আগে বেশ পরিপাটি ক'রে মনের ফলকে ছ'কে নাও। তাহ'লে বুঝতে পারবে—সেই প্রাণপ্রিয় আইডিয়াকেও দেশের জন্যে ছাড়তে তাঁকে কতখানি বেজেছিল—কেন না রাজনীতির কুরুক্ষেত্রে আইডিয়া বা আদর্শকে ছেড়ে পদে পদে রফায় আসতে হয়—নৈলে ও আখড়ায় কাজ করা অসম্ভব। তেমনি যে-গান্ধি দেশের জন্যে বার বার জেলে গেছেন—পরিবার, ধন, গৃহ, সুখ, স্বাস্থ্য কিছুরই প্রতি দৃকপাত করেন নি—চৌরিচৌরার একটা তুচ্ছ দাঙ্গার জন্যে অহিংসার আইডিয়ার খাতিরে দেশের জন্যে স্বাধীনতার আন্দোলনকেও তার স্থগিত করতে হ'ল এ-ই কি কম ব্যথা মনে করো? তবে অপরের ব্যথা আমরা ক'টুকু কল্পনা করি বলো? মানুষের ধর্ম দরদ নয়—বিচার।

(খানিকক্ষণ নিশ্চপ।)

দিলীপ : আর অরবিন্দ?

বিশার : সারা দুনিযাটা ঘুরেও অমনটি আর চোখে পড়ল না।

মাথা : কি রকম? কি রকম?

বিশার : আমি আপনাকে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি মাদাম যে, অরবিন্দ যদি আজ একবার বেরোন তাঁর বিজনবাস থেকে তাহ'লে শক্তির উদ্বেলতায় তিনি দেখতে দেখতে সবাইকে ছাড়িয়ে হ'য়ে দাঁড়াবেন দেশের মাথা। কিন্তু এত বড় প্রতিষ্ঠা প্রলোভন যে তিনি হাতে পেয়েও পায়ে ঠেললেন—আর ঠেললেন এমন একটা আদর্শের জন্যে যা বলতে মনে হয় পাগলামি, শুনতে মনে হয় হেঁয়ালি—এইখানেই তাঁর মহিমা তথা চুম্বক।

আমি : কিন্তু আমাদের দেশে কত যোগী বৈরাগীই তো পাগলামির টানে সর্বত্যাগী হয়েছেন দেখা যায়।

বিশার : যায়। কেবল মনে রেখো—তারা যদি ত্যাগী না হ'ত তাহলেই যে ভোগী বা কর্মী হ'তে পারত একথা সত্য নয়—হোমরাও চোমরাও হওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু অরবিন্দ ইচ্ছে করলে কী না হ'তে পারতেন? তিনি একাধারে কবি, ভাবুক, সমালোচক, দার্শনিক, দেশনায়ক, ধ্যানী, কর্মী, স্বপনী, ত্যাগী। জগতটাতে আমি কম দেখি নি নেড়ে চেড়ে। তাছাড়া আমি ভুক্তভোগী হ'যে হাড়ে হাড়ে জানি—দেহের মনের প্রাণের সমস্ত শক্তি একটা সুদূর আদর্শের জন্যে একমুখী রাখা কী প্রাণান্তিক সাধনা। এ-অসাধ্য সাধন করতে পারেন কেবল সেই মহাজন যিনি নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ বশে এনেছেন। এ চাট্টিখানি কথা নয়।

মার্থা : এ কে না মানবে বলুন? কেবল তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়—যদি

দয়া করে একটু খুলে বলেন। প্রশ্নটি সরল—যোগী অরবিন্দের সুদূর আদর্শটি ঠিক কী?

রিশার: মানুষকে আর মানুষ থাকলে চলবে না। তার মানুষী শক্তির লীলাখেলার পাট শেষ হয়েছে। এখন তাকে হ'তে হবে অতিমানব বা দেবতা—যে নামই দাও।

মার্থা: যে-নামই দিই?

রিশার: মানে—নাম দিয়ে কথা নয়। কথা হচ্ছে—জগতে যে-শক্তি এতদিন মানুষকে চালিয়ে এসেছে তার চেয়ে ঊর্ধ্বতর স্তরের শক্তি-সাধনা চাই যে-শক্তি পৃথিবীতে নেমে মানুষকে চালাবে তার তীর্থপথে।

মার্থা: কিন্তু এ কি সম্ভব?

রিশার (মৃদু হেসে): সম্ভব। না-হওয়াটাই অসম্ভব। প্রকৃতির যে-অব্যর্থ তাডনায় জড ধাতু প্রথম উদ্ভিদ হযে পরে পশু হয়ে শেষটায় মানুষের কোঠায় এসে ভিরুলো—সেই বিভ্রান্তিই আজ জীবের ঊর্ধ্বগতির অন্তরায়। কাজেই তাকে অনাগতের আবাহনে এগুতে হবে অতীতকে বিদায় দিযেই। না এগিয়ে তার নিস্তার নেই—যতক্ষণ না সে এর পরের পান্থশালায় পৌঁছচ্ছে। এরই নাম অতি-মানবতার সিদ্ধি বা মানবী প্রকৃতির রূপান্তর

ভাদিয়া: এ রূপান্তরের ফল কী দাঁড়াবে?

রিশার: একটা নতুন শক্তির খেলা সুরু হবে জৈবচেতনার ক্রমবিকাশে। এ-খেলা অনেকদিন যাবৎ বন্ধ আছে পাকা খেলোয়াড়ের অভাবে। আজ সেই পাকা খেলোয়াডকে গ'ড়ে তোলার ডাক এসেছে। এ-ডাক শুনেছেন এ-যুগে প্রথম শ্রীঅরবিন্দ—আর যে শোনে এ-ডাক তার সাডা না দিয়ে উপায় নেই। তাই শ্রীঅরবিন্দ বসেছেন মহাতপস্যায়। আবার বলি একটু সহজ ভাষায়, শোনো অবহিত হ'য়ে, যে-দৈবী শক্তি জডকে উন্নীত করল উদ্ভিদের আচ্ছন্ন বোধের স্তরে, উদ্ভিদকে টেনে তুলে নিয়ে এল জন্তুর প্রাণস্তরে, জন্তুকে উত্তীর্ণ করল মনঃশক্তিমান মানুষের স্তরে, সেই শক্তিই আজ মানুষকে তুলবে অতিমানবের কোঠায়—যেখানকার বাসিন্দারা মানুষ থেকে তত উঁচু—যত উঁচু আজ মানুষ জন্তুর স্তর থেকে।

মার্থা: মা ফোয়া! (বলিহারি:) কিন্তু একি সত্যিই সম্ভব?

রিশার: শুধু সম্ভব বললে কিছুই বলা হবে না মাদাম। বলুন—অবশ্যম্ভাবী। বলতে কি, জগতে আজ যে এত যুদ্ধবিগ্রহ হানাহানি দ্বেষাদ্বেষির ভূমিকম্প—এ-সবই আসলে সেই অতিমানবেরই সূচনা। অন্যভাষায়, আজকের মানুষের যন্ত্রণা হ'ল প্রকৃতির প্রসববেদনা অতিমানবকে জন্ম দিতে।

ভাদিয়া: আর একটু খুলে বলুন, থামবেন না।

রিশার : মনে আছে—১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার মাস দুই আগে অরবিন্দর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন যে, জগতে সব বিকাশের পথই রুদ্ধ হ'য়ে গেছে—মানুষ আজ যাপন করছে যেন এক কারাজীবন—অজ্ঞাতবাস। আমি বললাম : "তাহ'লে উপায় ?" অরবিন্দ বললেন : "যুদ্ধ, শ্মশান, হাহাকার, ধ্বংস নৈলে নতুন সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব।" আমিও ব'লে উঠলাম : "ঠিক যুদ্ধই তো চাই—চিরন্তন কুরুক্ষেত্রই পত্তন করবে নবতন ধর্মক্ষেত্রের। দুমাস বাদেই পৃথিবী কেঁপে উঠল মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্যে। শ্রীঅরবিন্দ ঠিকই ধরেছিলেন।

মার্থা (ক্লিষ্ট কণ্ঠে) : কিন্তু এতে কি ভালো হ'ল মসিয়ে ? য়ুরোপ যে ডুবল।

রিশার : কিন্তু ওদিকে যে এশিয়া উঠছে একথা ভুলছেন কেন ? রুষ চীন একজোট হচ্ছে—ভাবুন তো এর ভবিষ্যৎ প্রগতির কথা। একটা কথা মনে রাখবেন যে, য়ুরোপের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে গেছে—l'Europe est condamne.

মার্থা (বিষণ্ণ কণ্ঠে) : কী বলছেন, মসিয়ে ?

রিশার : কী বলছি ? বলছি যা প্রত্যক্ষ—অনস্বীকার্য। য়ুরোপে আজ ঘরে ঘরে কী অশান্তির আগুন জ্বলছে দেখছেন না ? কেউ কি কাউকে বিশ্বাস করে ? সবাই জানে—ফের যদি যুদ্ধ বাধে তবে ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না। তবু সবাই বাড়াচ্ছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র বারুদ বিমান। যদি লক্ষ্য হয় আকাশ তবে মাটি খুঁড়ে কূপের দিকে এগুলে কি লক্ষ্যসিদ্ধি হবে মনে করেন ?

ভ্লাদিয়া : আমরা কি তা-ই করছি।

রিশার : তাছাড়া কী বলুন ? গাছকে তার ফল দিয়ে বিচার করলে কি আর কোনো সিদ্ধান্ত সম্ভব ? গত যুদ্ধের পর কী দেখছেন, বলুন তো ? না la moitie d'Europe est balaye -অর্ধেক য়ুরোপ ঝেঁটিয়ে সাফ হ'য়ে গেছে—নয় কি ? আর একটা যুদ্ধ বাধলেই বাকিটুকু সাফ হয়ে যাবে। আমি তারই পথ চেয়ে রয়েছি।

ভ্লাদিয়া : পথ চেয়ে ? মানে, এই কি বাঞ্ছনীয় ?

রিশার : বাঞ্ছনীয় অবাঞ্ছনীয় প্রশ্নটাই এখানে অবান্তর। কথা হচ্ছে—মানুষকে চলতে হবে। সে না পারে অতীতের দিকে তাকিয়ে হায় হায় ক'রে কাল কাটাতে, না পারে কেবল বর্তমানের পুঁজিটুকুকে আঁকড়ে ধ'রে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা চালে চলতে। তাকে যে ঠেলে নিয়ে চলেছে ভিতরের ও বাইরের হাজারো দুর্নিরোধ্য শক্তি—সাধ্য কি সে থামবে ? তাই পথচলায় তাকে বারবারই উঠতে নামতে হয়। তাছাড়া রসাতল না থাকলে শিখরচারী হবার গৌরবই বা দাবি করব কেমন ক'রে, বলুন তো ? আমি তাই বলি প্রায়ই যে, যখন

য়ুরোপের অবক্ষয় নিশ্চিত তখন কী হবে তাকে টানাটানি ক'রে দুদিন জীইয়ে রেখে? বরং তাকে ঠেলে দেওয়া যাক ঐ রসাতলেরি দিকে, নৈলে শিখরচারী হ'তে দেরি হবে—য়ুরোপের অধঃপতন ঠেকানো যাবে না যাবে না যাবে না। তবে একটা শুভ চিহ্ন এই যে, য়ুরোপ বেশ হু হু ক'রে চলেছে পড়তে, ওদিকে এশিয়াও হু হু ক'রে আবার উঠছে। অতীত গৌরবকে কোলে ক'রে ব'সে থাকলে তো নিস্তার নেই, মনামি!

তেত্রিশ

বলাই বেশি—রিশারের অভ্যাগমের পরে আমাদের আসর বিলক্ষণ সর্গরম হয়ে উঠল। উনি দক্ষিণ ফ্রান্সে একটি মস্ত অট্টালিকা ভাড়া নিয়েছিলেন যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে। সেখানে কয়েকজন যোগার্থীও এসেছিল। কিন্তু টেঁকে নি আশ্রমটি। রিশার বুঝতে পারেন নি এহেন আশ্রমের দায়িত্ব, পান নি নিজের শক্তির সঠিক খবর। তাঁর ব্যক্তিরূপ ও বাক্‌চাতুর্যের মোহে প'ড়ে আসতেন শিষ্য শিষ্যারা, কিন্তু সব ছেড়ে বিজনবাস ("বিবিক্তদেশসেবিত্বং বিরতির্জনসংসদি") যে কী দুরূহ সাধনা দুদিনেই তার পরিচয় পেতেন তাঁরা হাড়ে হাড়ে। তবে স সব অবান্তর কথা থাক, স্মৃতিচারণের কোঠায়ই ফিরে আসি।

এখানে—নীসে—বিশারের এক প্রিয়শিষ্যার সঙ্গে আলাপ হ'ল। রিশারই আমাকে তাঁর ওখানে নিয়ে যান। অপরূপা লাবণ্যময়ী। মুখে যেমন মাধুর্য তেমনি দীপ্তি। আর সবার উপরে একটা আভা যেন থর থর ক'রে কাঁপছে—a Pambent light—যার নাম দেওয়া যেতে পারে স্বপ্নালুতা। বিবাহিতা—নাম মাদাম ক্রেস্পেল।

মাদাম ক্রেস্পেল রিশারকে শুধু ভক্তি করতেন না ছিলেন গুরুর অকৃত্রিম অনুরাগিনী। তাঁর মা-র সঙ্গেও আলাপ হ'ল। তৃপ্তি পেয়েছিলাম এঁদের সাহচর্যে।

এঁদের ওখানে একদিন গাইলাম। মসিয়ে বিশার পৌরোহিত্য করলেন। গান বেশ জমে উঠেছিল, শুনে সবাই উচ্ছ্বসিত। একদিন সমুদ্র তীরে মাদাম ক্রেস্পেলের সঙ্গে দেখা। বললেন: তোমার গানের নানা রেশ এখনো কানে রয়েছে।" পরে প্যারিসে এসেও এ-তরুণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেখানে মসিয়ে রিশারও এসে যোগ দিতে আমাদের সংসদে আনন্দের বান ডেকে গেল। সেখানে এক নাটকীয় ঘটনা ঘটল। বলা মন্দ কি?

মাদাম ক্রেস্পেলের ভাবভঙ্গি দেখে কোনোদিনো মনে হয় নি তিনি উত্তেজিত হ'তে পারেন। স্বভাবে এমন ধীর স্থির শান্ত শ্রীমন্তিনী আমি বেশি দেখিনি—বিশেষ ফ্রান্সে। কিন্তু সেদিন একটা কাণ্ড হ'ল।

মসিয়ে ও মাদাম ক্রেস্পেল, মাদাম ক্রেস্পেলের মা, পল রিশার ও দুটি ভারতীয় বন্ধুকে আমি Quartier Latin-র একটি মনোরম রেস্তরাঁ-য় নিমন্ত্রণ করেছিলাম সান্ধ্য ভোজে। আমি মাঝে, ডানদিকে মাদাম ক্রেস্পেল, বাঁদিকে তাঁর মা, সামনে টেবিলের ওধারে মসিয়ে ক্রেস্পেল ও আমার ভারতীয় বন্ধুযুগল

আসীন। পল রিশার একটু দেরিতে এসে ক্রেম্পেল-জননীর পাশেই বসলেন। জননী হঠাৎ বললেন (ফরাসী ভাষায়): "তোমাকে আজ বড় অস্থির মনে হচ্ছে কেন?"

মসিয়ে রিশারের গৌরবর্ণ মুখ লাল হ'য়ে উঠল: "অস্থির? সে কি!"

ক্রেম্পেল জননী: "আমাকে সে অস্থিরতার ঢেউ (vibrations) এসে লাগছে কী হয়েছে?"

মসিয়ে রিশার (তৎক্ষণাৎ): "তাহলে আমি চলি—je m'en vais.' ব'লেই নিষ্ক্রমণ—কেউ বাধা দেবার আগেই।

আমরা তো হতভম্ব! মেয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে: "তুমি ওঁকে কি রূঢ় কিছু বলেছ?"

মা তো থ: "রূঢ়! না তো!"

বলেই মাদাম ক্রেম্পেল হঠাৎ উঠে বেরিয়ে গেলেন, মসিয়ে ক্রেম্পেল স্ত্রীর পিছু নিলেন।

আমাদের মধ্যে গভীর অস্বস্তি ছেয়ে এল। খানিকবাদে পল রিশার ফিরে এলেন, কিন্তু একা—ক্রেম্পেল দম্পতির চিহ্নও নেই। মুখে তাঁর ঘনঘটা। একটু বাদে স্বামী এসে পল রিশারকে ফিস ফিস করে বললেন যে, তাঁর শিষ্যা অসম্ভব কাঁদছেন—প্রায় হিস্টিরিয়া। পল রিশার ও আমি উঠে গিয়ে তাঁকে এক ট্যাক্সিতে চাপিয়ে দিয়ে তবে যবনিকাপতন। Truth is stranger than fiction—একশোবার।

কিন্তু আশ্চর্য—পল রিশার তেমনিই উজ্জ্বল রসাল ঢঙে কথাবার্তা চালালেন সমানে। কেবল থেকে থেকে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন, যদিও ক্ষণতরে। নাটকের মত নাটক বৈকি।

চৌত্রিশ

মাদাম ক্রেম্পেল সংক্রান্ত ড্রামাটির খবর দিতেই পরের ঘটনা আগে বলেছি। তবে এ-অপরাধ আমি আগেও করেছি, পরেও করব। কবি নিরঙ্কুশ এই যা ভরসা।

নীসে ফিরে আসি।

পল রিশারকে আমরা ফের নিমন্ত্রণ করেছি। তিনি যথাকালে এসে হাজির—সৌম্য, দীপ্ত, নয়নানন্দ। মার্থা প্রায়ই বলত: "Il est une personalite radieuse, vraiment!" (উনি একটি দীপ্ত ব্যক্তিরূপ সত্যিই।)

আমাদের মাননীয় অতিথি নিরামিষাশী। টেবিলে কাঁটা চামচ ধ'রেই তীরন্দাজি সুরু। এবার নিশানা—আমিষ। বললেন: "বার্নার্ড শ-র সঙ্গে আমি একমত—পশুর শবদেহ খাওয়াটা—কী ক'রে খায় মানুষ?"

আমি: কিন্তু আজকাল তো প্রমাণ হয়ে গেছে যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে।

রিশার: Quel sottise! (কী বাজে কথা!) প্রাণ থাকা-না থাকা নিয়ে তো কথা নয়। কথাটা হচ্ছে হত্যাটা হচ্ছে কী ভাবে—স্বেচ্ছায় না অনিচ্ছায়, দায়ে প'ড়ে না ঝোঁক ক'রে? পথ চলতে, হাত নাড়তে, নিশ্বাস নিতে তো আমরা প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ জীবাণু বধ করছি। সেখানে দায়িত্বের প্রশ্নই ওঠে না—কারণ বাঁচতে হবে, বটেই তো। তাই যেখানে মারছি বাঁচতে হবে ব'লে, বা জীবাণুদের বধ করছি অজান্তে, সেখানে আপত্তি করলে চলবে কেন? কিন্তু তাই ব'লে কি এই সিদ্ধান্ত মঞ্জুর যে, যে-জন্তুই হাতের কাছে পাও তাকে পুড়িয়ে, ফুটিয়ে বা ভেজে খাওয়ার নামই মনুষ্যত্ব? বর্বরতা বলে আর কাকে? আর শুধু শব নয়—পশুর শব! ধিক্!

আমি (হেসে): তবে কি বলতে চান যে আমাদের পক্ষে মানুষের শব আহার করা কম নিন্দনীয়?

রিশার (সঘনে): একশোবার। মানে, পশুমাংস খাওয়ার চেয়ে নরমাংস-ভোজন কম বীভৎস।

মার্থা (শক্ পেয়ে): এ আপনার বিচিত্র ঠাট্টা, মসিয়ে!

রিশার (অম্লানবদনে): ঠাট্টা না মাদাম—যুক্তি।

ভাদিয়া: শুনি তার ঝংকারটা।

রিশার (চোখে দুষ্ট চাহনি): যাকে জীবদ্দশায় শ্রদ্ধা করি, আলিঙ্গন করি, চুম্বন করি তার মাংস যদি খেতে যাই তবে সেটা ভয়ঙ্কর হ'তে পারে, কিন্তু লজ্জাকর

না। কিন্তু যে-জন্তুকে আমরা তার জীবদ্দশায় চলি এড়িয়ে পারৎপক্ষে যার ছায়া মাড়াই নে, এমন কি যার নামে আমরা মানুষকে গাল দেই cochon (শুয়োর !) ব'লে, তার মৃত্যুর পরে তাকে গ্রহণ করা নয়, রসনায় মাখামাখি ক'রে রক্তে চালান দিয়ে মজ্জাগত করা—এ হেন স্বতোবিরোধ এক দেবত্ববিলাসী পশ্বাধমেই সম্ভব। তবে বলে না—les extrômes se touchent (একই বস্তুর দুই প্রান্ত পরস্পরের কাছে ফিরে আসে)। আমার ভয় হয় কি শুনবে? শেষের দিনে—au jour du jugement —পশুরা যখন হানা দেবে l'Homme de douleur, ব্যথার বিগ্রহ, যিশুর দরবারে তখন আমাদের এ-নিরপেক্ষতার সাফাইও থাকবে না যে, আমরা পশুমাংস খাই—নরমাংসও খাই। আমি কিন্তু সত্যিই cochons-দের ব্যথার ব্যথী তাই যখনই কোনো কশাইখানার পাশ দিয়ে যাই—টুপি খুলি।

ভ্লাদিয়া (হেসে): একথা মানি যে পশুমাংস খাওয়াটা কুশ্রী।

আমি: বার্লিনে আবার এক টলস্টয়ান বান্ধবীর মুখে শুনেছিলাম যে, টলস্টয় না কি বলতেন—পরে এমন দিন আসবেই আসবে যেদিন মানুষ পশুমাংস খেতে ঠিক তেমনি জুগুপ্সা বোধ করবে যেমন সে আজ করে নরমাংস খেতে।

এম্নি নানা সময়ে নানা রসাল ও ভাববার কথা। একদিন মাদাম ক্রেস্পেলের ওখানে আমার গানের পরে রিশার সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন। দুঃখ এই তাঁর অনেক কথাই স্মৃতি থেকে পিছলে গেছে, কিন্তু একটা কথা বলেছিলেন ভারি চমৎকার। বলি যতটা পারি গুছিয়ে।

রিশার বললেন: "তোমাদের সঙ্গীত হচ্ছে line´aire—রেখায়িত, ধারায়িত: কখনো চলে আবেগের নানারঙা জমির উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে শিখর-থেকে-নামা শুভ্র নদীর ম'ত, কখনো চলে কলোচ্ছ্বাসে দুকূলভাঙা প্লাবনে—কখনো শান্ত উষার স্বর্ণনৃত্যে—কখনো বা অশ্রুস সন্ধ্যার উদাস মন্থরভঙ্গে। তোমাদের মেলডি অপূর্ব তার এই আবেগময়ী রেখার ভঙ্গিমায়—তার তুলনা নেই নিজের রাজ্যে।

আমি: একথা আমিও বলি—রোলাঁকেও একবার বলেছিলাম। তিনিও মানেন—যেকথা তাঁর একটি চিঠিতে তিনি কবুল করেছেন—যে, য়ুরোপে মেলডির বিকাশ তেমন হয় নি হার্মনির অভ্যাগমের দরুণ।

রিশার: ঠিক কথা। কিন্তু এ-সম্পর্কে আরো একটা কথা ভাববার আছে: কেন হ'ল না এ-বিকাশ? ভেবেছ কি?

মার্থা: হার্মনির দিকেই আমাদের মন ঝুঁকল ব'লে আর কি?

রিশার: বটে। কিন্তু ঝুঁকল কেন মাদাম? ঝুঁকল এই জন্যে যে, মানুষ—মানে আমাদের সুরকারেরা—আবিষ্কার করলেন যে, কণ্ঠ হ'ল প্রকৃতির দান, তার ক্ষেত্র

সীমিত। মানুষ চিরদিন চেয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে হারাতে। যন্ত্রের সূক্ষ্ম কাঁপন, ধ্বনিসঙ্গতি, স্বরগ্রামের প্রসার, কলাকারুর বৈচিত্র্য কণ্ঠের চেয়ে অনেক বেশি—ভারিক্কি। কণ্ঠসঙ্গীত চরম উৎকর্ষে উঠেছে তোমাদের দেশে দিলীপ, তাই তোমাদের যন্ত্রসঙ্গীত দীন, কারণ সে খতিয়ে কণ্ঠসঙ্গীতেরই অনুবৃত্তি, স্বকীয় গৌরবে গরীয়ান্ নয়।

আমি: আপনার একথা খানিকটা সত্য। আমার মনে আছে ১৯২৪ সালে লক্ষ্ণৌয়ের এক সঙ্গীত কনফারেন্সে চন্দন চৌবে ব'লে এক সেরা ধ্রুপদী নাসিরউদ্দীন ও আল্লাবন্দে খাঁর আলাপ শুনে রেগে আগুন। বললেন আমাকে: "ওদের লজ্জা নেই রায় সাহেব! ওরা ভ্রষ্ট, নৈলে গাইয়ে হ'য়ে কিনা কণ্ঠে যন্ত্রের কাজ অনুকরণ করতে যায়? পতিব্রতা পরবে বারাঙ্গনার সাজসজ্জা? যাদের কণ্ঠ নেই তারা যন্ত্র বাজাক, কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীত হ'ল বাদশাহ—যন্ত্রসঙ্গীত তার হুকুমবরদার। মানে কণ্ঠ তাকে চালাবে কিন্তু তার ইশারায় চলবে না। জানেন তো সঙ্গীতরত্নাকরে কী বলেছে:

নৃত্যং বাদ্যানুগং প্রোক্তং বাদ্যং গীতানুবৃত্তি চ
অতো গীতং প্রধানত্বাদত্রাদাবভিধীয়তে।

অর্থাৎ কিনা, নৃত্য বাদ্যকে মেনে তালে তালে পা ফেলবে, বাদ্য চলবে কণ্ঠকে কুর্নিশ ক'রে। এককথায় কণ্ঠই হ'ল রাজা—যন্ত্র তার বান্দা। রাজা কবে বান্দার কথায় ওঠে বসে বলুন তো?"

মার্থা: চন্দন চৌবে কথাটা বলেছিলেন কিন্তু চমৎকার।

রিশার: কিন্তু কথাটা খাটে কেবল ঐ রেখায়িত মেলডির রাজ্যে, মনে রেখো। হার্মনির রাজ্যে আসতেই যাকে ইংরাজীতে বলে: "টেব্‌ল্ টর্ন্ট্ গেল"। কারণ সেখানে কণ্ঠের সাধ্য কী যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দেবে? তাই যন্ত্রসঙ্গীত সিম্ফনি—ধ্বনিজগতে আনল এক নতুন ডাইমেনশন। ভারতীয় সঙ্গীতকে যদি বলি দুই ডাইমেনশনের—ধরো চতুষ্কোণ square, তাহ'লে হার্মনিকে দিতে হবে তিন ডাইমেনশন কিউব-এর (cube) পদবী। কিম্বা বলা যেতে পারে—মেলডি যদি হয় বৃত্ত (circle) তাহ'লে হার্মনির উপমা—গ্লোব। কারণ ধ্বনির কল্লোল এভাবে শোভাযাত্রা করে নি আর কোনো সঙ্গীতে। হার্মনি এদিক দিয়ে মানুষের একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী কীর্তি। মানি—মেলডি অপরূপ সুরপরী, শ্রীমন্তিনী, তাকে অভ্যর্থনা করবেও অন্তরের আনন্দ-অর্ঘে। কিন্তু হার্মনি হ'ল বিরাট, অতিকায়, magistral—তার চোখে আকাশের ঔদার্য, নিশ্বাসে পারিজাত সৌরভ, হিল্লোলে দৈবী কল্লোল। তাকে দিতেই হবে সম্ভ্রমের প্রণামী।

এমনি ছিল তাঁর বাক্‌শক্তি। একজন একটি উপমা দিয়েছিল: এক চুম্বকের পাহাড়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল এক জাহাজ। যেই জাহাজ চুম্বকশৈলের কাছে

এসেছে তার সব পেরেক খুলে গিয়ে সেই পাহাড়ের অঙ্গে আসীন হ'ল। পল রিশার কথা বলা সুরু করলে ঠিক তেমনি উৎপ্রেক্ষা, উপমা, যুক্তি অলঙ্কার উড়ে এসে তাঁর রসনায় আশ্রয় নিত। এক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ-প্রতিভা ঝিকিয়ে উঠত এম্‌নি সহজেই। এঁরা আলাপীর উপরওয়ালা : কথকতার কিন্নর। পল রিশারেরই ভাষা চুরি ক'রে বলব—কথাবার্তায় আলাপ যদি হয় দুই ডাইমেনশনের, তাহ'লে কথকতাকে শিরোপা দিতে হবে তিন ডাইমেনশন। আলাপীর ম'ত আলাপী লাখে না মিলয় এক, কথকের মতন কথক কোটিতে গোটিক হয়।

পল রিশারের কথার ফুলঝুরি বা রংমশাল উপভোগ করতে করতে কেমন যেন একটা নেশা মতন আমাদের পেয়ে বসত, না তার চেয়েও বেশি—আবেশ। তিনি যা-ই বলতেন বলতেন এক অপরূপ ভঙ্গিতে। মার্থা একদিন অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে তাঁকে বলেছিল যে, তাঁর কথা শুনতে শুনতে তার মনে হয় Buffon-র বিখ্যাত সংজ্ঞা—le style c'est l'homme même—অর্থাৎ শৈলীই হ'ল মানুষের নিবিখ। রিশার যা-ই বলতেন তাঁর বলার শৈলীর প্রসাদে হ'য়ে দাঁড়াত শ্রবণীয় মননীয় অনুধাবনীয়। স্বভাবে জন্ম-যাযাবর। বলতেন কত ঘটা ক'রে—হিমালয়ে দুবৎসর কেমন একেবারে একলা ছিলেন; একবার কিভাবে ভালুকের বাহুবন্ধনে প'ড়ে তার ভায়রাভাই হয়েছিলেন; কেমন ক'রে বিনা পাসপোর্ট গিয়েছিলেন বসোরায়; প্যালেস্টাইনে গ্রীসে মিশরে কপর্দকহীন হ'য়েও পদযাত্রা করেছিলেন খৃষ্টশিষ্য হ'য়ে taking no thought of the morrow—কাল কী হবে সে-ভাবনা রেখে। যদিও, বলেছিলেন রিশার হেসে, তিনি ঠিক লিলিদের জাত নন কিছু অন্ততঃ খাওয়া চাই। বলতেন মিসরে তাঁর এক সুফী বন্ধুর কথা। তিনি ছিলেন বাইরে রাজনীতিক, ডিপ্লোমাট, কিন্তু মনে মিষ্টিক। Insouciance—নির্ভাবনার—গুপ্তবিদ্যায় রিশার তাঁর কাছেই দীক্ষা নেন। সুফী বন্ধু কখনো কিছু প্ল্যান করতেন না; ছিলেন চিরদিনই অচিন-পথের-উধাও পথিক—কখনো ভাবতেন না পাথেয়ের কথা; যুদ্ধের সময় তিনি কতবার দুরন্ত প্রাণসঙ্কটে পার পেয়েছিলেন এক অভাবনীয় করুণার আবির্ভাবে; কেমন ক'রে এক মহাদুর্যোগে তাঁর এক বন্ধু স্বপ্নে তাঁর আসন্ন সর্বনাশের খবর পেয়ে লক্ষাধিক ফ্রাঙ্ক পাঠান—এম্‌নি আরো কত চমকপ্রদ গল্প—শুনতে শুনতে সময়ে সময়ে সত্যিই ধাঁধা লাগত আমাদের যে, আমরা কি বিংশ শতাব্দীর মনোরমা নীসে এসেছি, না প্রাক্-খৃষ্ট আরব্যোপন্যাসের বাগদাদে? আর্টের একটা সংজ্ঞা রিশার প্রায়ই দিতেন l'art crée une illusion—আর্ট এক মায়ালোক সৃষ্টি করে ব'লেই তাকে আমরা বরণ করি—জীবনের নিরেট জাগ্রত অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতে। এ-নিরিখে তাঁর কথকতা ছিল প্রথম শ্রেণীর শিল্পমায়া।

এ তিনি পারতেন কারণ অঘটনে তিনি বিশ্বাস করতেন মনে প্রাণে। একবার

খৃষ্টদেবের মিরাক্‌ল্ প্রসঙ্গে মার্থাকে বলেছিলেন : "যা বুদ্ধির কাছে মনে হয় আষাঢ়ে গল্প—roman feuilleton—তা সত্যিই ঘটে প্রত্যক্ষ ঘটনালোকে, আর যেই ঘটে, দেখা যায় অসম্ভবের মধ্যেই সম্ভব লুকিয়ে ছিল। এ-অঘটনপটীয়সী মায়া স্বভাবস্থা থাকেন প্রাচ্যদেশে—পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবাদের মশাল তাঁর ছায়াময়ী ঝিকিমিকিকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছে। য়ুরোপে তাই মানুষ মিসটিক হ'য়ে বাঁচতে পারে না, এখানকার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদী পরিবেশে মিসটিক ফুল আফোটাই ঝ'রে যায়। তাই আমরা সর্বদাই সাবধান সন্ত্রস্ত—খৃষ্টের নির্দেশ "কালকের কথা ভেবো না" আমাদের এ-কান দিয়ে ঢুকে ও-কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রাচ্যের দোষ নেই বলি না, অনেক বিষয়েই সে পেছিয়ে আছে, কিন্তু এই মিসটিক আবহ সেখানে এখনো আকাশ বাতাস ছেয়ে। এইই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

মার্থা : মিসটিক বলতে আপনি ঠিক কী বোঝেন বলবেন ?

রিশার : মিসটিক সেই সুজন যে তার প্রাণের খোরাক সংগ্রহ করে অলক্ষ্য লোক থেকে—অথচ প্রত্যক্ষভাবে।

ভ্লাদিয়া : এমন লোক আপনি চাক্ষুষ করেছেন ?

রিশার : করেছি বৈকি—যদিও তাদের মধ্যেও রকমফের আছে।

মার্থা : যাদের আপনি দেখেছেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মিসটিক বলেন আপনি কাকে ? অরবিন্দকে ?

রিশারের মুখের সে-ভাব আমি ভুলব না। তিনি এতক্ষণ কথা বলছিলেন কলস্বরে—হঠাৎ একটা অন্য ছন্দ এসে পড়ল। তারপরে তিনি আবছা হেসেই গম্ভীর হ'য়ে মৃদুস্বরে বললেন : "তাঁর ঠিক সংজ্ঞা হয় না মাদাম। তিনি মিসটিকও বটে, নন‌ও বটে। আমার কাছে তিনি শিব (shiva)—দিভাঁ (divin) নরদেব।

তেমন মিড়ে তাঁকে আর কারুর সম্বন্ধে কথা কইতে শুনি নি। আর একদিন তিনি মার্থাকে বলেছিলেন : "আমি জীবনে কিছুই করি নি মাদাম, যা দেখাবার মতন। কিন্তু জানি—আমি অনেক কিছু করতে পারতাম।"

মার্থা : করেন নি কেন বলবেন ?

রিশার (ম্লান হেসে) : শুধু এই ভেবে—কী হবে ওসবে ? জীবনের ব্যর্থতা দীনতা তুচ্ছতা দেখে বহুবারই আমার আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা হয়েছে—কিন্তু নিজের অক্ষমতার জন্যে নয়। একথা ব'লে আমার শক্তিমত্তার সত্যতা প্রমাণ করা যায় না—কিন্তু হাতেকলমে ক'রে শক্তি বা কীর্তি জাহির ক'রেই বা কী হবে বলুন ? তবু একথা বলছি এইজন্যে যে, আমি বরাবরই জানতাম আমি অসামান্য। কখনো কারুর কাছে আমার মাথা নত হয় নি। নত হ'ল প্রথম অরবিন্দের কাছে। ওঁকে দেখে আমার প্রথম মনে হয় যে, এ-ই সেই লোক যে অনায়াসে পারে যা আমি বহু

চেষ্টা ক'রেও পারি নি। আর তিনি যা চাইছেন তা এমন চাওয়ার মতন ক'রে কেউ কখনো চায়নি। আজ একথা শুনলে লোকে হয়ত ভাববে আমার মাথা খারাপ'। কিন্তু ভারতবর্ষ বলে—দৈববাণী বেরোয় পাগল বা শিশুর মুখেই। শ্রীঅরবিন্দকে আমি বুঝতে পারি নি—অতলের তল কে কবে পেয়েছে বলুন?—কিন্তু যেটুকু বুঝেছি তাতে একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই: যে, শ্রীঅরবিন্দ অতিমানস আলোকে ডাক দিয়ে মানুষকে ঢেলে সাজাতে চাইছেন, আমাদের উত্তীর্ণ করতে চাইছেন এমন এক বিকাশের স্তরে যেখানে পৌঁছতে পারলে আমাদের কাছে বুদ্ধ খৃষ্ট শঙ্কর মণি সেণ্ট ফ্রান্সিসকেও মনে হবে গড়পড়তা। এই স্তরেরই তিনি নাম দিয়েছেন gnostic being বা অতিমানব।

জুাদিয়া: কিন্তু মানুষ কি কোনোদিন সত্যই অতিমানবের স্তরে উত্তীর্ণ হবে?

রিশার: হবে। তবে কয়েকটি সর্ত আছে।

মার্থা: যথা?

রিশার: একটা হচ্ছে—আমাদের মানবতাব গর্ব ছাড়তে হবে। যতদিন মানুষ সগর্বে ভাববে যে, জৈবলীলায় তার স্থান সকলের উপরে, ততদিন অতিমানবের চারাগাছ বাড়তে পারবে না এমন প্রতিকূল আবহে। তাই সব আগে চাই লজ্জিত হওয়া যে, আমরা মানুষ মাত্র: এইটে মনে রাখা যে প্রকৃতির উদ্বর্তনে মানবতা মাঝপথের একটা পান্থশালা (half-way house) মাত্র, তার বেশি নয়। এককথায়, অতিমানব হবার জন্যেই ভেঙে ফেলতে হবে মানবতার ছাঁচটি যেমন উড়বার জন্যে পাখী ভেঙে ফেলে ডিমের ছাঁচ। রবীন্দ্রনাথ, ওয়েল্‌স্‌, রোলাঁ এঁদের মুখে "আমরা মানুষ আমরা মানুষ" এই হাঁক যখন শুনি তখন লজ্জায় আমার যেন মাথা কাটা যায়। একমাত্র শ্রীঅরবিন্দকে দেখে আমি সান্ত্বনা পেয়েছি—এ-লজ্জা যে তাঁরও ভেবে গৌরব বোধ করেছি। ছি ছি, ভাবুন তো—গর্ব করছি আমরা কী নিয়ে? না, আমরা মানুষ! ধিক্! চোখে পড়বে আমাদের কবে—যে, যার জন্যে মানুষের বেঁচে থাকার ওকালতি করা চলে সে হচ্ছে তার মানবিকতাকে পাশ কাটিয়ে অতিমানবের তিলক পরতে চাওয়া। না না মাদাম, (উত্তেজিত) মানুষ আগে লজ্জা পেতে শিখুক যে সে আজো মানুষই থেকে গেল—আগে হারাতে শিখুক তার যা কিছু আছে—তবে পাবে সে তার জন্মস্বত্ব, হবে অতিমানব। আর এ যদি সে না পারে তবে এ-জীবন চিরদিন থাকবে এমনিই—তুচ্ছ খেলাঘর, বর্বরতার কাঁটাবন: C'est un nouveau Dicu qu'il faut adorer—আজ এক নতুন ঈশ্বরের পূজারী হ'তে হবে আমাদের।

আমি: আর একটু খুলে বলবেন?

রিশার : দেবতা সম্বন্ধে পশুর ধারণা ও মানুষের ধারণার মধ্যে তফাৎ আসমান জমিন। তেমনি ভগবানের সম্পর্কেও মানুষের আজ যে-ধারণা ভাবিকালের অতিমানবের ধারণার সঙ্গে তার মিল থাকতে পারে না।

মার্থা : কিন্তু—

রিশার : শুনুন আর একটু খুলে বলি। অতিমানবের চেতনার স্তর মানবিক চেতনা থেকে তত উর্ধ্বে যত উর্ধ্বে মানুষের চেতনা মর্কটের চেতনা থেকে। এখন, আদর্শ গড়ে কে ? চেতনাই তো। তাই আমরা ভগবানকে দেখি যে-ভাবে—যে-রসে রসিয়ে, যে-রঙে রঙিয়ে তাঁর অনবদ্যতার (perfection) ছক কাটি, অতিমানব সে-ভাবের ভাবুক নয় ব'লে সে-ছাঁচে তাঁর আদর্শ গ'ড়ে তুলবে না। কারণ মানবিক চেতনার কাছে যে-ভাগবত রূপ নিঁখুৎ মনে হয়, অতিমানবিক চেতনার কাছে তার সে রূপ রঙ-রস নিখুঁৎ মনে হ'তে পারে না। Vous Comprenez (বুঝেছেন কি) ?

মার্থা : কিন্তু মানুষের perfection এর আইডিয়ার তো আরো বিকাশ হ'তে পারে ?

রিশার : কিন্তু সে-ধারণার মধ্যে তার মানবিকতার আমেজ যে থাকবেই। মানুষ যতক্ষণ মানুষ থাকবে ততক্ষণ তার কল্পনাও তো থাকবে মানবিক। একটি কথা মনে রাখবেন : যেমন মর্কট মেজে ঘ'ষেই মানুষ দাঁড়ায় নি, তেমনি মানুষকে হাজার মাজলে ঘষলেও সে অতিমানুষ দাঁড়াবে না। অতিমানব হ'ল একটা আলাদা অনুভব, আলাদা ছন্দ—এককথায়, এমন নতুন বিকাশ যা মানুষের কাছে অভাবনীয়, অচিন্তনীয়। দুঃখ এই যে সে-বিকাশের পথ আজও খোলে নি।

ভ্লাদিমা : খুলবে কেমন ক'রে ?

রিশার : তা কেমন ক'রে বলব ? c'est l'inconnu—সে পথ যে অজানার। হয়ত রাতের পর নিশুত রাত কাটাতে হবে অন্ধকারে। হয়ত এ দুরভিসারে বহু তীর্থযাত্রীকে বহু স্খলনের দুঃখ সইতে হবে। হয়ত এ স্বর্গারোহণে দিনের পর দিন বহু বীরেরই দেহপাত হবে মধ্যপথে। এমনও হ'তে পারে—যেকথা রোলাঁ আজকাল বলছেন—যে, চেতনার মানচিত্র থেকে মানুষের খেলাঘরের ছবি একেবারে বিলুপ্ত হবে—যাতে সেখানে অতীতের সব সংস্কার থেকে মুক্ত এক নব সাম্রাজ্যে প্রকৃতি স্বচ্ছন্দে নব নির্মাণের ছক কাটতে পারেন। কে জানে ? প্রকৃতি হয়ত মানুষের কাঠামো গড়বার পর তার কাছে যা চেয়েছিলেন, তা না পেয়ে এতই নিরাশ হয়েছেন যে স্থির করেছেন আবার তাকে ঢেলে সাজাতে—বিকাশের পথ খোলা রাখতে চেয়ে। কিম্বা হয়ত এমনও হ'তে পারে যে, দেবতা আচমকা দেখা দেবেন কোনো অচিন পথে। কে বলতে পারে কোন পথে মানুষ অতিমানুষ হবে ? কেবল এইটুকু বলতে

পারি যে, এই মন্ত্র জপ করা চাই-ই চাই যে "এ নয়, এ নয়—মানুষের মানবিকতার পথে তার মুক্তি নৈব নৈব চ—মানুষ বিধাতার হাতে-গড়া তাঁর নিখুঁৎ বরপুত্র নয়, মানুষ বিধাতার আত্মপ্রকাশের ঊর্ধ্বপথে একটা সাময়িক পান্থশালার ম'ত।" এককথায়, চাই অনাগতের আবাহন, অমানবের আরাধনা। বলতে হবে: "Je ne crois a rien, mais j'ai confiance—চলতি কিছুতেই আমার আস্থা নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস অচলপ্রতিষ্ঠ।"

তাঁর এই ধরণের কথা তিনি এমন আশ্চর্য ভঙ্গিমায় বলতেন যে আমাদের মনের মধ্যে সত্যিই একটা কাঁপন জাগত, মনে পড়ত ফাউস্টে গেটের একটি বাণী:

Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil ;
Wie auch die Welt ihm das Gefuehl verteure,
Ergriffen fuehlt er tief das Ungeheure.
মানবিক প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অংশ—শঙ্কার স্পন্দন।
যতই বেদনা তাকে দিকে এ-জগৎ—প্রাণ তার
হয় ভয়ে অভিভূত বিরাটের বিপুল সম্ভাবে।

পঁয়ত্রিশ

কিন্তু পল রিশারের কথার মধ্যে থেকে থেকে কেমন যেন একটা বেসুর বেজে উঠত। এই বেসুর পরে আরো স্ফুট হ'য়ে উঠেছিল প্যারিসে মাদাম ক্রেস্পেলের হিষ্টিরিয়ার গর্ভাঙ্কে। এর ঠিক নামকরণ করা সম্ভব নয়, কারণ সুরেলা দীপ্তিও তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত অহরহ। কিন্তু তবু বলব—কোথায় যেন একটা বাদীসুরের অভাব ছিল যার জন্যে তাঁর আলাপ রাগিণী উচ্ছল হ'লেও নিটোল হ'তে পারত না। আমরা তিনজন মাঝে মাঝেই এ নিয়ে বলাবলি করতাম, কিন্তু তাঁর জীবনের ইতিহাস কিছুই না জানার দরুণ কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতাম না। শেষে একদিন হঠাৎ যেন সমাধানের কিনারায় এসেছিলাম তাঁর নিজের একটি কন্‌ফেশনে।

সেদিন সান্ধ্য ভোজনের পর আমরা ভ্লাদিয়ার ঘরে ব'সে মুগ্ধ হয়ে শুনছি পল রিশারের কথা আর ভাবছি আলাপকে এ ভাবে কলাকারুর কোঠায় উত্তীর্ণ করা—এ যে পারে সে আপনি পারে।

রাত তখন বারোটা হবে। বাইরে থেকে ভেসে আসছে চাপা সমুদ্রকল্লোল—কখনো বা এক আধটুকরো সুরেলা বেহালার রেশ বা বেসুরা মোটরের হর্ন।

সেদিন কেমন যেন আমার হঠাৎ মনে হ'ল—মানুষটি শুধু একলা নয়—ভাগ্যহীন, যার সব থেকেও কিছুই নেই কেন না নেই কোনো নিষ্ঠার মেরুদণ্ড। মনে হ'ল—তাঁর সব থেকেও যেন কোনো কিছুরই মূলধন নেই ; তিনি শক্তিসাধক অথচ সাধনার লক্ষ্য অহং ; প্রতিভাবান্ অথচ প্রতিভার লক্ষ্য সৃষ্টি নয়, চমক-জাগানো , প্রফুল্লকান্তি অথচ অন্তরে অগাধ শূন্যতা—অবসাদ—হতাশা।

সেদিন তাঁর প্রতি কথার ফাঁক দিয়েই যেন উঁকি দিচ্ছিল এক অনামা অবসাদ। যেমন যখন বলছিলেন জাপানের কথা। বললেন : জাপানের মতন জাত তিনি আর দেখেন নি—ওরা শুধু সংযমে সিদ্ধ তাই নয়, সংযমের এক উচ্চতর রূপের খবর পেয়েছে—সংযম আর সুমিতি, সুষমা আর শ্রী।

মার্থা : ওরা যে স্বভাবে সংযমী, জানি।

রিশার (গাঢ় কণ্ঠে) : কিছুই জানেন না মাদাম। ওদের জানা বড় শক্ত।

ভ্লাদিয়া :, কি রকম ?

রিশার : একটা আছে বাহ্য সংযম—যার খবর শুনে, প'ড়ে বা দেখে পাওয়া যায়। কিন্তু আর একটা সংযম আছে যার পরিচয় পেতে হ'লে ওদের অন্তরের অন্দরমহলে প্রবেশ করা দরকার। যে-জাপানী সংযমের কথা আপনারা শোনেন সে হ'ল ওদের বাইরের মিতাচার, শালীনতা। আমি বলছি ওদের সেই সংযমের কথা

যা দুর্লভ, যার অন্তর্বাণী হচ্ছে—"জগতের দুঃখ অজস্র—তোমার অধিকার নেই সে-দুঃখভার বাড়ানো। নিজের ব্যথা তাই অপরকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিও না—অপরকে দেবে শুধু আনন্দ সুখ হাসি—বেদনা দুঃখ অশ্রুহার নয়। শুনুন একটা দৃষ্টান্ত দেই, তাহ'লে হয়ত পরিষ্কার হবে আমি কী বলতে চাইছি।

জাপানে আমার একটি জাপানী বন্ধু ছিল—অন্তরঙ্গ। তাদের একটি মাত্র ছেলে। একদিন হঠাৎ খবর এল যে, সে বিদেশে মারা গেছে। দম্পতি চোখে অন্ধকার দেখলেন কারণ ছেলেটি ছিল তাঁদের নয়নমণি। সেদিন দুপুরে আমার খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। ওঁরা রোজ যেমন প্রফুল্ল তেমনিই প্রফুল্ল। নানা জাপানী ব্যঞ্জন খাওয়ালেন পরম সমাদরে। কত হাসি গল্প! একটিবার উল্লেখ পর্যন্ত না—সকালে কী খবর এসেছে। ওঁরা দুজনেই সন্ধ্যায় আত্মহত্যা করলেন হারিকিরি ক'রে। পরদিন ছোট্ট একটি চিঠি: 'বন্ধু, বাঁচতে আর সাধ নেই। তোমাকে বলি নি তুমি দুঃখ পাবে ব'লে।'

* * *

খানিক বাদে রিশারই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। বললেন: "হয়ত সব জীবনেরই শেষ অঙ্কে এম্‌নি ব্যর্থতা—কে জানে? আমারো যে কতদিন মনে হয়েছে আত্মহত্যা করবার কথা!"

মার্থা (চম্‌কে উঠে): আত্মহত্যা?

রিশার (ম্লান হেসে): মাদাম, মানুষ মরণকে বড় বেশি ভয় করে। কিন্তু কেন করে বুঝি না যখন জীবনের লক্ষ্যই গেছে হারিয়ে। বাঁচার অধিকার আছে কেবল তাদের যারা জানুক বা না জানুক মানে যে, জীবনের একটা লক্ষ্য আছে। শুনুন, আমার জীবনের যে কোনো লক্ষ্যই নেই এমন কথা বলতে চাই না—তবে কি জানেন? আমার জীবনে পথ আছে, নেই পাথেয়। কি-একটা ব্যর্থতার অন্ধকার জগদ্দল পাথরের মতন আমার বুকে চেপে ব'সে। আমি বাঁচতে চাই জীবনে আমার আসক্তি প্রবল ব'লে, শক্তির বিভূতি আমার কাছে লোভনীয় ব'লে। কোনো মহৎ লক্ষ্যে আমার যে আস্থা নেই তা নয়, কিন্তু সে-শিখরে পৌঁছবার সাধনা করতে আমি নারাজ। এ-ব্যর্থতার প্রতিষেধ কোথায় বলুন? আর তার চেয়ে দুঃখী কে—যার সব থেকেও কিছুই নেই?

আমরা চুপ ক'রে রইলাম। কী বলব?

রিশার (একটু পরে): তবু আমি বলব আমি শুধু শক্তির উপাসক নই, আমার মধ্যে তার চেয়ে বড় সম্পদ ছিল—দুর্বল প্রেমের তৃষ্ণা।

মার্থা: দুর্বল?

রিশার: প্রেমের চেয়ে দুর্বল কে? অথচ সেই জন্যেই কি সে বিশ্বরাজ নয়?

সে কি নিত্য বলে না—আমাকে বাঁচাও! অথচ তাকে বিনাশ করে এমন সাধ্য কার? প্রেমের এই যে অপলকা রূপ আমার অন্তর চায় তাকেই পেতে, লালন করতে, তার পরশমণির ছোঁওয়ায় সোনা হ'তে। রাজ্য তার জগৎজোড়া, অথচ শিশুর মতই সে ক্ষীণায়ু, নয় কি? ভগবানকে যখন শক্তিধর ব'লে ভাবি তখন ভুলে যাই তাঁর এ-প্রেমের স্বরূপ—যে দুর্বল অবজ্ঞাত অনাদৃত—তবু সে চিরজীবী তার দুর্বলতারই অপরাজেয়তায়—যেমন চিরজীবী শিশু। এমন কোন্ তৈমুর সীজর কুবলাই খাঁ আছে যে শিশুসৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযান ক'রে ঘরে ফিরতে পারে মত্ত কল্লোলে? পারে নাতো? কিন্তু কেন পারে না? কারণ মানুষ যেমন একদিকে চায় শক্তিদর্পে অভ্রভেদী হ'তে, আর একদিকে তেমনি চায় পেলবতার কোলে ঘাসের ফুল ফোটাতে। সে শুধু উদার সোনালি শিখরমালাই নয়, কলির বুকে লাজুক গন্ধও বটে। সে শুধু দৃপ্ত দিগ্বিজয়ীই নয়, ঘুমকাতুরে পাখীও বটে। সে শুধু তুফান-তারক সিন্ধুনাবিকই নয়, মায়ের আঁচলধরা আঁধারভীরু শিশু—একে ওকে তাকে মা ব'লে আঁকড়ে ধরে—মা নৈলে সে বাঁচে না ব'লে। ভগবানকে আমি দেখি এমনিই পেলব দুর্বল রূপে। দুর্বলতারও প্রতিমূর্তি তিনিই তো—নইলে দুর্বলতা কেন এত মন টানে। প্রবলকে দেখলে আমাদের মন ভয় করে কিন্তু নিঃস্বকে দেখলে আমাদের হৃদয় বলে: "আহা!" Our Sweetest Songs are those which tell of saddest thoughts—কবির এ-বাণী বুকে বুকে এমন কাতর সুরে চির-আশার বাণী জাগিয়ে তোলে কেন? বিশ্বের লাঞ্ছিত নিরন্ন সর্বহারাদের জন্যেই প্রেমের অবতারদের যুগ যুগ ধ'রে এমন নিরবসান কান্না কেন?

শুনতে শুনতে আমার মনে পড়েছিল শ্রীঅরবিন্দের অনুপম কবিতা WHO-র দুটি চরণ:

> The hand that send Jupiter spinning through Heaven
> Spends all its cunning to fashion a curl!
> (যে-কর হানে ভয়াল বজ্র নভে—সে-ই তার অনধীর
> অতুল) কারুকলায় চূর্ণালকের রচে মঞ্জুহার।

সত্যিই রিশারের সেদিনকার গভীর বিষাদের সুর আমার কাছে পেয়েছিল অবিস্মরণীয় মান। বহুদিন পরে পড়ি তাঁর Les Dieux বইটি। তার এক জায়গায় দেখি তিনি লিখেছেন এই কথাটি আভাষে:

"N'est ce point toujours dans les choses faibles, méprisés du monde, qu'il plaît aux suprêmes puissances de se reveler?"

> ম্লান বলহীন যারা, সর্বহারা অনাদৃত ভুবনে সবার
> শক্তিরাজ চান সেথা উদ্ভাসিতে সর্বোত্তম বিভূতি তাঁহার।

তাই কি আমাদের বিশ্বরাজ এসেছিলেন যশোদার কোলে অসহায় শিশু হ'য়ে যে পেলব ব'লেই এমন প্রেমাস্পদ (lovable), দুর্বল ব'লেই দিগ্বিজয়ী (invincible) ?

সেদিন রাত্রে পল রিশারের এই ভাবটি ফলিয়ে তুলতে একটি সুদীর্ঘ কবিতা লিখেছিলাম—এখানে পরিবেষণ ক'রে এ-অধ্যায়টির সমাপ্তি টানি। কবিতাটির নাম দিয়েছিলাম :

প্রেম—দেবশিশু দিগ্বিজয়ী

কথা কও কোন্ সুরে তুমি শিশু, হৃদয়নিভৃতে
স্বপনপসারী,
বিনির্মল কুসুমবিহারী ?
জাগরের কণ্টককান্তারে তুমি চাও না নামিতে,
এ-ই কি তোমার রীতি ?
চাও কি বিদায় দিতে ধরণীরে স্বর্গের অতিথি ?

না না, কভু নয়, প্রাণব্রজেশ্বর যেথা গায় গান,
তুমি তার রাখিবে না মান ?
তোমাকে যে ডাকে প্রতি ধূলিকণা,
আঁকিতে তোমার আল্পনা
ডাকে পুষ্পমালা বনবীথি
তোমায় অতিথি ?
মলয়সমীরে বাজে তোমার মধুর
অলক্ষ্য নূপুর।
সন্ধ্যাদেবালয়ে জ্বালে নক্ষত্রকামিনী
তোমারি দীপালিস্নিগ্ধ আলোকবাহিনী।
প্রজাপতি পাখনায়,
ময়ূরের তনুভয়ে,
আফোটা ফুলের প্রতি দলে
তোমারি হাসিপ্রসাদ চলে।
অনিন্দিত কান্তি তুমি
শিশু, প্রেম, আনন্দের জন্মভূমি !

প্রতি অন্তরের নম্র লাজুক দীপিকা
তোমারি কল্যাণী শিখা
গোপন সঞ্চারী
হে দেবদিশারি!
সীমায় তোমার ইন্দ্রজালে
তুমি প্রতি চরণের তালে
মর্ত্য জীবনেরে অমর্ত্যের মন্ত্র দাও
করো তারে অকূল-উধাও।

প্রেম, দেবশিশু, চিরজীবী
বলে: "ওরে, কে আমাকে কোলে ঠাঁই দিবি?
আমি যার
সে আমার।
দেখ্—আমি বিনামূল্যে বিকাতেই চাই,
তবু কেহ চায় না আমায়
একান্ত আরাধনায়,
তাই বারবার এসে বারবার ফিরে ফিরে যাই।"
বলে শিশু: "শিখর সঞ্চারী হ'য়ে আমি
রাজি প্রতি অন্তরের দিব্য অন্তর্যামী
আরাধ্য দেদীপ্যমান,
তবু পলে পলে হই খান খান
তৃণের আঘাতে,
হাসিতে ঘুমায়ে ফিরে জাগি অশ্রুকণ্ঠীর বিষাদে।
রুদ্র কাপালিক যবে সুন্দরে হানিতে শেল শক্তিশবাসনে বসে সুখী,
বীর্যকামী অভিচারে ধুমায় শ্মশান রক্ত চিতা জ্বালামুখী।
সেই দৃপ্ত সিংহনাদে হায়
বারিদে বিজলি সম আমি, শিশু, মিলাই ব্যথায়।
আমি যে অনর্থ ভীরু কোমল অতিথি,
বিধুরের বিরহীর স্বপ্ন—হারানিধি।
আমার নয়ন তৃষ্ণা
অনিমিষা
পথ চেয়ে রয়—কোন্ সুলগ্নে সে-বাঞ্ছিতা মাধুরী

দেখা দেবে নিরুপমা
পূজারিণী, মর্ম্মমণি রমা
পুষ্পশেজে রচি' শান্তিপুরী,
পরশমণির ম'ত স্পর্শে তার করি স্বর্ণায়িত
যা কিছু ব্যথিত, অনাদৃত,
যা কিছু হারায়ে সব সুখের সম্বল
ঝরায় বিষাদে আঁখিজল :
সে যদি না দেয় দেখা, আমি স'রে যাই শিশু, আদর কাঙাল,
নিষ্ঠুরের অভিঘাতে কাটে যে আমার ছন্দ তাল।"

বলে শিশু : "তবু আমি
নিখিলের স্বামী
সঙ্গীতের জাদুবলে স্থবিরে ফিরায়ে আনি যৌবনের জোয়ারের পানে,
জনমে জনমে জয়পরাজয়ে মানে অপমানে.
আমি চিরদিন সর্বজয়ী,
মৃন্ময়ীর রাজ্যে তাই প্রকৃতি চিন্ময়ী
রচে অশ্রুহাসি-জলধনুরাগে প্রেমের নিলয়,
ঝটিকায়ও যে অকুতোভয়,
দহে না শিখায়, ভেসে যায় না প্লাবনে,
করি আমি-যে স্মৃতিচারণে
যুগে যুগে
মধুময় মিলনের অঙ্গীকার বিরহের বুকে।"

বলে শিশু : "যবে দর্পভরে
আমাকে অসুরচমূ নিষ্পেষিত করে
হিংসাদ্বেষ অভিযানে তার,
এ-বসুন্ধরায় ছায় নীরন্ধ্র আঁধার।
সে-দুর্লগ্নে শুভব্রত ভাঙে,
শুধু মত্ত আস্ফালন রাঙে
পিঙ্গল নিষ্ঠুর ঘনঘোর—
যতদিন আমার অঘোর
তারকামুরলী
না ঝরায় ধ্রুববাণী আবার উচ্ছলি'—

যার অভিসারে
অকূল পাথারে
বাহে তরী চিরদিন দুরাশী পথিক
নির্ভীক প্রেমিক।"
মরণে বিজয়ী তুমি, জীবনে নির্জিত যুগে যুগে, দেশে দেশে
তবু ভালোবেসে
উদ্‌ভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে ফিরে ফিরে আসো হে নিরালা,
হাতে লয়ে মাঙ্গলিক মঞ্জু দীপমালা—
ক্ষণে ক্ষণে যে-নিভন্ত দীপ
জ্বালেন প্রাণমন্দিরে ফিরে ফিরে শিব
শান্ত আশীর্বাদে যাঁর লীন হয় দুঃখ শোক তাপ,
ধূলিধামে হয় আবির্ভাব
মরিয়াও যে-আশা মরে না,
ঝরিয়াও যে-ফুল ঝরে না,—
নাম যার প্রেম—শিশুসম যে দুর্বল,
তবু যার মহিমা অগাধ নির্বিচল,
কালজয়ী, চিরন্তন,
ধরণীর প্রতি অণুবুকে নিত্য কাঁপে যার অসাঙ্গস্পন্দন ॥

ছত্রিশ

ভ্লাদিয়া ও মার্থার সঙ্গে আমার প্রীতিবন্ধন যেন আরো দৃঢ় হয়েছিল পল রিশারের আবির্ভাবে। ভ্লাদিয়া এরপরে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আমার কাছে আরো মন দিয়ে শুনত—সে কত কথা: তিনি কীভাবে বিপ্লবী হয়েছিলেন অধ্যাপকের নিরাপদ পদ ছেড়ে, কীভাবে চন্দননগর যান দৈবী স্বর শুনে কীভাবে জেলে কৃষ্ণ তাঁকে গীতার সনাতন ধর্ম প্রচারের ভার দেন···এইসব। কেবল দুঃখের বিষয়, তখন আমি শ্রীঅরবিন্দের "পূর্ণযোগ" সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। কেবল ওদের বলতাম তাঁর যোগ আত্মকেন্দ্রিক নয়—বিশ্বমানবিক। সিন্থেসিস অব যোগে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন:

"We must bear the burden of others in divine self-interest." শুনে মার্থা তো একেবারে গদ্‌গদ। বলল: "এই-ই তো চাই দিলীপ। দিব্যশক্তিকে যদি সত্যিই কেউ ডাক দিতে পারে তবে দেবে তো অন্ধ অবোধ দুঃখী মানুষেরই ভার নিতে।" ভ্লাদিয়া আরো বলত: "য়ুরোপের এসেছে অবক্ষয়ের যুগ—পল রিশারের কথা খুবই ঠিক—এর পরের যুগে মানুষের প্রগতি হবে প্রাচ্যের অভ্যুত্থানে।" তবে প্রাচ্য বলতে ভ্লাদিয়া বুঝত ভারতকে। বলত: জাপান বা চীনের সাধনা হ'তে পারে সামাজিক বা রাজনৈতিক, কিন্তু মানুষের দুঃখনিবৃত্তি হ'তে পারে কেবল আধ্যাত্মিক চেতনার পূর্ণ উন্মেষে।"

ভ্লাদিয়া ও মার্থার কাছে আমার আর একটি ঋণ স্বীকার ক'রেই এ-অধ্যায়ের সমাপ্তি টানব। ওদের দৌলতেই প্রাগে ও হাঙ্গেরিতে আমি ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে ভাষণ দিয়েছিলাম এবং সেই সূত্রে বহু ভাবুক ও রসিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

এর পরের অধ্যায়ে আমি পণ্ডিচেরি থেকে কেবল ভ্লাদিয়াকেই চিঠি লিখতাম কারণ মার্থার সঙ্গে ওর বিবাহচ্ছেদ হওয়ার, পর মার্থা নিরুদ্দেশ হয়েছিল। ভ্লাদিয়া আনা লিসাকে বিবাহ ক'রে সুখী হয়েছিল, কেবল ওর একটি আশা পূর্ণ হয় নি: ও ভারতে এসে যোগসাধনা করতে চেয়েছিল কিন্তু ভগবান্ ওকে টেনে নিলেন। গত বৎসর মীরা লিখেছিল: "গতকাল পিতৃদেব আমাদের ছেড়ে গেছেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁর মুখের সে-আশ্চর্য শান্তি যদি আপনি দেখতেন মুগ্ধ হ'তেনই হ'তেন। আপনার কাছে প্রার্থনা: তাঁর উদার আত্মার জন্যে আপনি ও ইন্দিরাদিদি প্রার্থনা করবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আপনার কথা বলেছেন।"

তার আগে কেবল একটি ঘটনার কথা বলি—যদিও এটি আসলে অঘটন।

ইন্দিরার ভাবনৃত্য দেখে ভ্লাদিয়া মুগ্ধ হয়েছিল রোমে ১৯৫৩ সালে, সেকথা আমার "দেশে দেশে চলি উড়ে"—তে লিখেছি। ওর মনটা ছিল স্বভাবে অন্তর্মুখী,

মার্থার বহির্মুখী। তাই হয়ত ওদের বেবনতি হয়েছিল। কিন্তু সে-অবান্তর প্রসঙ্গে ফল কি? যে-অলৌকিক ঘটনাটি ওকে সচকিত ক'রে তুলেছিল তার কথা বলি। ও ইন্দিরাকে রোম থেকে লেখে—ইন্দিরার জন্মদিনে—২৬.৩.৬৫ তারিখে (এই-ই ওর শেষ পত্র):

Chere Indira,

Cette nuit tu es venue dans mon rôve et tu m'as dit: "C'est mon jour de naissance—penses à moi et tu penseras à Mira." Et je pense avec une intensité profonde à toi, chère Indira, et si c'est vrai que c'est ton jour de naissance, tous nos sentiments de joie spirituelle se réunnissent dans nos coeurs et chantent un hymne de toi—à toi! Et ta déesse Mira nous fait une bénédiction car notre fille s'apelle aussi Mira—et elle est tout pour nous...Elle a besoin de toi et ta bénédiction...Nos prières vont vers toi et ta déesse à travers la lointaine qui nous separe, mais dans le coeur je sens bien proche...Nous t'embrassons, chere Indira.

Tes devoués Vladia et Anna Lisa.

Mon cher Dilip,

C'est vraiment une pensée miraculeuse que tout d'un coup Indira m'a apparu et sur la table ce matin je trouvai son nom écrit dans mon livre—et un rêve m'inspira: "Écris à Indira—c'est son jour." Cher Dilip, je sens une nostalgie incroyable de vous deux et je voudrais bien tout laisser et venir chez vous—prier avec vous, chanter avec vous—vivre finalement une vie spirituelle...Priez pour nous, chers amis aimés! Je t'embrasse mon cher Dilip. Je sens dans l'air un parfum magnifique—n'est ce pas le parfum des mains d' Indira?

Ton Vladia

(প্রিয় ইন্দিরা, আজ রাতে তুমি আমার স্বপ্নে এসে বলেছিলে: আজ আমার জন্মদিন, তুমি আমার ও মীরার কথা চিন্তা কোরো। আমার চিন্তা নিবিড় হ'য়ে উঠল তোমার কথা ভাবতে। যদি একথা সত্যি হয় যে, আজ তোমার জন্মদিন, তাহ'লে আমাদের সকলেরই সানন্দ উচ্ছ্বাস তোমার গুণগান

করবে—তোমার উদ্দেশে পাঠাই সে-স্তব। তোমার দেবী মীরা যেন আমাদের একমাত্র কন্যাকে আশীর্বাদ করেন—তারও নাম মিরা। তোমার আশীর্বাদ তার বড় দরকার। আমাদের প্রার্থনা তোমার উদ্দেশে পাঠাই, ব্যবধান শুধু বাইরে, অন্তরে আমরা অন্তরঙ্গ। তোমাকে আমাদের প্রীতিসম্ভাষণ পাঠাই। ইতি।

তোমার স্নেহাধীন ভ্লাদিয়া।

প্রিয় দিলীপ, এ সত্যি এক অঘটন যে ইন্দিরা হঠাৎ আমার কাছে এল, আর আমার টেবিলে আমার একটি বইয়ে তার নাম লেখা দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে এক স্বপ্ন আমাকে আদেশ করল: "ইন্দিরাকে লেখো এক্ষনি, আজ তার জন্মদিন।" দিলীপ আমার মন কী যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে তোমাদের জন্যে! আমার মনে হচ্ছে—এখনি সব ছেড়ে তোমাদের কাছে চ'লে যাই—তোমাদের সঙ্গে প্রার্থনা করতে, গান গাইতে, ধর্মজীবন বরণ করতে। আমাদের জন্যে প্রার্থনা কোরো প্রিয় বন্ধু। তোমাকে আমার স্নেহসম্ভাষণ পাঠাই। হাওয়ায় এক অপূর্ব সৌরভ পাচ্ছি—এ কি ইন্দিরার হাতের সৌরভ নয়? ...তোমার ভ্লাদিয়া।

সাঁইত্রিশ

ভ্লাদিয়া আমার জীবনে এসেছিল শুধু কন্টিনেণ্টাল সংস্কৃতির প্রতীক হ'য়েই —য়ুরোপের ধর্মোৎসাহের প্রতীক হয়েও বটে। মার্থার মধ্যেও ছিল ধর্মোৎ-হের আভা, নিষ্ঠা ছিল না ভ্লাদিয়ার মতন। তাই এ-আভা তার মনে লো হ'য়ে উঠতে পারে নি যেমন উঠেছিল ভ্লাদিয়ার মনে। হয়েছিল কি, র্থার তীক্ষ্ণধী ঐহিক মন ছিল মূলত বিচারপ্রবণ, তাই পদে পদে হিসেব রে দেখতে চাইত—ধর্মের কাছে কী পাওয়া যায় কতদূর পর্যন্ত। রাষ্ট্র সমাজ নবপ্রীতি (রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানববাদ) তার মন টানত পদে পদেই। ফরাসী স্কৃতির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ ছিল সে। যেমন প্রিয়দর্শনা তেমনি বাকপটু, খানেই যেত চারদিকে মৌমাছির দল প্রকট হ'ত। কাউণ্টেসের মেয়ে হয়ে দ্র ভ্লাদিয়াকে বরণমালা দিয়েছিল, কাজেই বলা চলে না—প্রেমে আদর্শবাদ কে আকর্ষণ করত না। কিন্তু হয়েছিল কি, তার মন নানা আদর্শের ডাকে ডা দিত, তাই বাধত তার সঙ্গে ভ্লাদিয়ার। এককথায়, শান্তি পেত না সে কানো একটিমাত্র আদর্শকে আঁকড়ে ধ'রে। এ নিয়ে তাকে আমি জেরা বলে সে বলত—সে শান্তি চায় না, চায় গতির পথে প্রগতি তার মানে -ই হোক।

ভ্লাদিয়া ছিল ঠিক উল্টো: মনেপ্রাণে ঐকান্তিক, ধর্মভীরু। রুশভাষা সে ানত। রুষ মুজিকদের (কৃষাণ) মিসটিসিস্‌ম তাকে মুগ্ধ করত। টলস্টয়ের শষ জীবনে খৃষ্টভক্তির অভ্যুদয়ের কথা বলতে সে উজিয়ে উঠত। বলত ার্থাকে এইই তো চাই, ধর্মে নিষ্ঠা। এখানে তার সঙ্গে আমার গভীর মিল ছল বলে তার বন্ধুত্ব আমার কাছে এমন অমূল্য হয়ে উঠেছিল।

তার মাধ্যমে আমার আর একটি লাভ হয়েছিল—নানা আদর্শবাদী পণ্ডিতের ংস্পর্শে আসা। এঁদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে কিছুটা বন্ধুত্ব হয়েছিল প্রাগেই: র্মন প্রাচ্যবিৎ অধ্যাপক উইণ্টারনিট্‌স (Winternitz) ও চেক প্রাচ্যবিৎ অধ্যাপক লেসনি (Lesny)। তিনি পরে যখন কলকাতায় আসেন তখন আমি াঁকে নিমন্ত্রণ করি থিয়েটার রোডে—আমার মাতুলালয়ে—অতিথি হ'তে। িনি সানন্দেই দুতিনবার আমাদের আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন। শুধু তিনি া, আরও অনেক কন্টিনেণ্টাল অতিথি—যথা ফ্রাউ ফ্রীদা হানস্‌উইর্ত দাস সুইস) অধ্যাপক বেনোয়া ইত্যাদি। (কৃষ্ণপ্রেম ওরফে রোনাল্ড্‌ নিক্সন ও

একবার আমার কাছে ছিল সাত আট দিন—কিন্তু সেকথা আমার Yogi Krishnaprem বইটিতে উল্লেখ করেছি।)

অধ্যাপক লেসনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় প্রাগেই। তিনি আমার একটি মস্ত উপকার করেছিলেন পরে—ত্রিস্তিসি পোর্টে। সেকথা পরে বলছি। প্রফেসর উইণ্টরনিট্‌স্ (বিশ্ববিশ্রুত প্রাচ্যবিৎ—Orientalist) আমাকে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিলেন আমার গান শুনে। তাঁকেও থিয়েটার রোডে ডাকব ভেবেছিলাম আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে। কিন্তু তিনি শান্তিনিকেতনে ও অন্যত্র বক্তৃতাদি দিতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে হ'য়ে ওঠে নি। তবে একদিন ভারি মজা হয়েছিল। আমি তাঁকে চা-য়ে নিমন্ত্রণ ক'রে ভুলে কোথায় চ'লে যাই। তিনি বিকেল বেলা পাঁচটায় এসে বাড়িতে কেউ কোথাও নেই দেখে আমার পরিচারক শম্ভুকে ডেকে চা রুটি কেক সন্দেশাদির সদ্ব্যবহার ক'রে লিখে রেখে যান: "Ihre Gastfreiheit und Nachmitagstee waren fablehaft—Gott sei dank!" অর্থাৎ "আপনার আতিথ্য তথা বৈকালিক চা অপূর্ব—ভগবান্‌কে ধন্যবাদ!" আমার মেজমামা এ-চিঠিটি সুভাষকে দেখান। শুনে সুভাষের সে কী হাসি! এর পরে প্রায়ই আমাকে বলত শাসিয়ে: "তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল আমার বৌদিকে ব'লে রাখি যেন উনুন নেভানো না হয়।" কাণ্ডটা শুনে অনেকেই হেসে কুটি কুটি হ'তেন বলেই ব্যাপারটার উল্লেখ করলাম।

কিন্তু যা বলছিলাম। বার্লিনে আমার রুষ ও জর্মন বন্ধুবান্ধবীর সাহচর্যে স্বাদ পেয়েছিলাম রুষ ও জর্মন সংস্কৃতির। ব্লক পরিবার, এর্ন্‌ পরিবার ও মার্থার মাধ্যমে ফরাসী সংস্কৃতির। শহীদ ও ফ্রাউ ফিসিঙ্গারের মাধ্যমে বহুভাষী সংস্কৃতির। বার্লিনে এক তুর্কী বন্ধুর প্রজাপতিপনার মধ্যে দিয়ে বেপরোয়া সংস্কৃতির। সে ছিল সত্যিই কন্দর্পকান্তি। তাই রতিদেবীরা দলে দলে তার পিছু নিতেন। কার সঙ্গে সে না নাচত ও লালপানি সেবন করত। রসবোধও ছিল তার সহজাত। তাই হয়ত আমার সঙ্গে ভাব করার পরেই একদা সে টুপি খুলে বাকায়দা অভিবাদন ক'রে বিদায় নিল, ব'লে: Mon cher, votre socie´te´ n'est point renconfortant, car un moraliste de´courage done le papillon." অর্থাৎ তোমার সখ্যে সুখ নেই ভাই, নীতিবাদী কবে প্রজাপতির দরদী হয়?

ভ্লাদিয়া ছিল অন্য স্তরের মানুষ। যেমন মহৎ, তেমনি স্নেহশীল, তেমনি আদর্শবাদী। আমাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। আজকাল অনেকে বলেন শুনি—ধর্ম কী এমন সম্পদ দেয় মানুষকে—শুধু কুয়াশার আনন্দ ছাড়া আর কী মেলে তার তহবিলে? এর উত্তর মিলবে ভ্লাদিয়ার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের দৃষ্টান্তে।

তার শেষ নিঃশ্বাসেও সে আমার নাম উচ্চারণ করেছিল—লিখেছিল তার আদরিণী কন্যা মিরা। কিন্তু কেন করেছিল? ধর্মীয় আলাপ-আলোচনায় সে হিন্দু ভারতের কাছ থেকে অনেক কিছু পেত ব'লেই না! আজও মনে পড়ে—ভারতের সাধু সন্ত গীতা মহাভারতের অমৃতবাণী সে কী সাগ্রহে পান করত—বিশেষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দের। য়ুরোপে ধর্মালোচনায় এত আনন্দ আর কোথাও পাইনি।

আটত্রিশ

কন্টিনেণ্ট বলতে আমরা সচরাচর নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ককে ধরি না। বার্লিনে আমার এক নরওয়েজিয়ান ধনিকন্যার সঙ্গে আলাপ হয়। সে আমার নাম শুনে মুগ্ধ হ'য়ে নিমন্ত্রণ করল নরওয়েতে তাদের অতিথি হ'তেই হবে ও গান গাইতে হবে ক্রিষ্টিয়ানিয়ায়।

সুকুমারী যেমন সুন্দরী তেমনি সুশীলা। তার উপর নরওয়ের নিমন্ত্রণ—land of the midnight sun! মারি করেলির থেলমা ছিল আমার অতি প্রিয়। নরওজিয়ান বালার মধ্যে আমি দেখতাম থেলমাকে। তাই তাকে থেলমাই বলব।

থেলমা বলত সগর্বে: 'য়ুরোপে টিরল সুইৎজর্লণ্ড ইতালি যাও, মিলবে সুন্দর দৃশ্য তথা সংস্কৃতি। কিন্তু নরওয়ে ফিওর্ডের সৌন্দর্য—সে যে কী, না দেখলে য়ুরোপের ভূস্বর্গ দেখা হবে না। ইতালিতে বলে: "See Naples and then die." আমি নেপল্‌সের জায়গায় বসিয়ে দিতে চাই নরওয়ে।"

ছিলাম তাদের অতিথি হয়ে পরমানন্দে। কিন্তু ফিরতে হ'ল এ-সৌন্দর্যের রাজধানী ছেড়ে গদ্যময় জর্মানি।

একটি ঘটনা ভুলতে পারিনি আজো। থেলমা আমাকে নিয়ে গেল একদিন এক দরিদ্র কৃষাণের বাড়ি! কাঠের ছোট্ট কুটির—ফিওর্ডের ধারে। দরিদ্রের মাথা গুঁজবার ঠাঁই, কিন্তু আমার মনে হ'ত আমি এখানে পরমানন্দে সমস্ত ছুটিটাই কাটাতে পারি—যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তেমনি নয়নানন্দ নিলয়! কেবল মনে হ'ত সুদীর্ঘশ্বাসে আমাদের কৃষাণদের কুটিরের কথা।

কোথায় ওরা আর কোথায় আমরা? তবে ভরসার কথা এই যে, জগতে অন্ততঃ আজ পর্যন্ত মানুষ অন্ন বস্ত্রের অভাবে দুঃখ পেলেও ভগবানের করুণায় বিশ্বাস হারায় নি—এমন কি বলশেভিক রাশিয়ায়ও আবার গির্জা খোলা হয়েছে ও বিশ্বাসীরা গিয়ে ডাকছেন তাঁকে যাঁর কৃপায় শুধু শান্তির নয় অন্নবস্ত্রেরও ব্যবস্থা হ'য়ে এসেছে আবহমানকাল। তবে একথা প্রমাণ করা যায় না দুই আর দুই চার-এর অঙ্কপাতে বাস্তব দৈন্যের দুঃস্বপ্নকে মায়া ব'লে পাশ কাটিয়ে।

ক্রিষ্টিয়ানিয়া থেকে গেলাম সোজা সুইডেনের অপূর্ব জলনগরী স্টকহল্‌মে। এ-শহরটিকে অনেকে বলেন ভেনিসের যমজ ভাই। তফাৎ এই যে, স্টকহল্‌মে কোথাও অপরিচ্ছন্নতার লেশও নেই—যেখানে ভেনিসের সর্বত্রই অব্যবস্থা। তবু আমার কাছে ভেনিসই বরণীয়া—যার জুড়ি নেই। পরিচ্ছন্নতা আর রূপশ্রী সুষমা সমার্থক নয়!

সুইডদের আতিথেয়তার গুণগান শুনেছিলাম লোকমুখে। এবার চাক্ষুষ করলাম সানন্দে কয়েকটি সুভদ্র পরিবারে স্নেহময় আতিথ্যে। তবে স্টকহলমের কথা আমি ফলিয়েই লিখেছি আমার "তরঙ্গ রোধিবে কে" উপন্যাসে। তাই সে সব কথার পুনরুক্তি করা বাহুল্য হবে।

কেবল একটি কথা বলি যা মনে গেঁথে আছে। থেলমা আমাকে স্টকহল্মের একটি মনোরম বোর্ডিং-হাউসের ঠিকানা দিয়ে গৃহকর্ত্রীকে লিখেছিল আমার দেখাশোনা করতে। স্টেশনে গৃহকর্ত্রী স্বয়ং এসে আমাকে বন্ধুবরণ করলেন সাদরে। বললেন তার নিলয় কাছেই—তিন মিনিটের পথ। পদব্রজেই চললাম, এক মুটে আমার সুটকেশ মাথায় ক'রে চক্ষের নিমেষে অন্তর্ধান। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, গৃহকর্ত্রীকে বললাম: "ওকে জানেন তো?" গৃহকর্ত্রী জর্মনে বললেন হেসে: "কোনো ভয় নেই মাইন হের! সুইডেনে চোরচক্রীরা নির্বংশ হয়েছে। আপনার খোলা সুটকেশ যদি রাস্তায় রেখে যান—কোনো পথিকই ছোঁবে না।"

সেখান থেকে কোপেনহেগেনে এক স্নেহময়ী ডেন সুভদ্রার আতিথ্য গ্রহণ ক'রে দুদিন কাটিয়ে সুন্দরী স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে অবতীর্ণ হলাম জর্মন কমরীরদের জাঁকালো রাজ্যে—হাম্বুর্গে। হা অদৃষ্ট! ভূস্বর্গ থেকে একলাফে নামতে হ'ল কিনা অসহকল্লোল স্বপ্নবর্জিত অশ্রান্ত ব্যস্ততার রাজ্যে যেখানে শুধু বিজ্ঞানের জয়জয়কার!

উনচল্লিশ

প্রাগ থেকে যখন হাঙ্গেরি যাই তখন আমার সেখানকার ভাষণের সব বন্দোবস্ত জুলাদিয়াই ক'রে দিয়েছিল। এমন কি সেখানে যে রাজার হালে ছিলাম সে তারই দৌলতে বলা চলে। সেখানে আমি হ্যাট ছেড়ে পাগড়ি ও ধুতি প'রে বক্তৃতা দিতাম। ফলে সে কী কাণ্ড! আমার নাম র'টে গেল "প্রিন্স রয়।" হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় ওরা কী বলত জানি না তবে যাদের সঙ্গে জর্মনে আলাপ করতাম তারা ডাকত Prinz Dilip! ফরাসীভাষীরা প্র্যাঁস রোয়া (Prince Roi) কেবল মেয়েরা সবাই নিরাশ হ'ত আমি নাচি না ব'লে। অনেকেই আমার নৃত্যগুরী হ'তে চেয়েছিলেন কিন্তু সুভাষকে কথা দিয়েছিলাম যে।

ওখান থেকে গেলাম নেপ্‌ল্‌স। নেপ্‌ল্‌সের অজস্র ছবি দেখে ক্লান্ত হ'য়ে ছুটলাম টালসামলাতে ক্যাপ্রি দ্বীপে। সব ক্লান্তি মুহূর্তে উবে গেল। সে কী অপরূপ দ্বীপ, মরিমরি! ইতালিয়ানে কিছুটা আলাপ করতে পারতাম ব'লে অসুবিধা হয় নি। কিন্তু ইতালিতে বন্ধু লাভ হবার আগেই দেশে ফিরতে হ'ল ১৯২২ এর নভেম্বরে। অক্টোবরের শেষে তার এল মেজমামার কাছ থেকে—আমার মাতামহের সাংঘাতিক অসুখ, তিনি বারবার আমার নাম করছেন।

ইতালিয়ান শেখায় আমার দ্রুত উন্নতি হচ্ছিল, কিন্তু বাধা প'ড়ে গেল। তার করতে উত্তর এল: মাতামহ কেবল আমার নাম করছেন। এর পরে আর দেরি করা চলে না। ব্রিণ্ডিসি থেকে লয়েড ট্রিয়েস্টিনোর প্রথম শ্রেণীতে একটি বার্থ রিজর্ভ ক'রে দিল কুক কোম্পানি। আমি ফ্লোরেন্সে একদিন কাটিয়ে রোমে পৌঁছলাম। সাত আটদিন বাদে জাহাজ ছাড়বে ব্রিণ্ডিসি থেকে। রোম থেকে ব্রিণ্ডিসি যাব রোমে দুদিন ঘুরে ফিরে। সেখানে নামলাম ট্রেনে এক স্বর্ণোজ্জ্বল সুপ্রভাতে।

কিন্তু আপ্তবাক্য কাটবে কে? "চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" —সুদিনের পরে এল দুর্দিন—শুক্লপক্ষের পরে কৃষ্ণপক্ষ। একে বন্ধুহীন অবস্থা—রোমে কাউকেই চিনি না। তার উপরে রোমে নামতেই এক গাঁটকাটা আমার পাসপোর্ট (পাসপোর্টের মধ্যে পাঁচটি পাঁচ পাউণ্ডের নোট সমেত) হরণ ক'রে যাকে বলে আমাকে পথে বসালো—অক্ষরে অক্ষরে। আমি চক্ষে অন্ধকার দেখলাম। পকেটে মাত্র পাঁচসাতটি লিরা। উপায়?

কিন্তু "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"—আমার মনে পড়ল অলডাস হাক্সলির এক আত্মীয়ার কথা—মিসেস নেতি হাক্সলি রোলার। তিনি লুগানোতে আমার গান শুনে সোচ্ছ্বাসে বলেছিলেন তাঁর "রোমান" বন্ধুবান্ধবীকে শোনাতেই হবে—তাই তাঁর

সঙ্গে যেন নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয় দেখা করি রোমে। স্টেশনে খবর নিয়ে জানলাম তাঁর হোটেল কাছেই—ট্রামে দুমিনিটের পথ। সুটকেস হাতে ট্রামে উঠলাম, ট্যাক্সি নিতে সাহস হ'ল না—যদি শ্রীমতী বেরিয়ে থাকেন বা রোমে না থাকেন তবে ট্যাক্সিভাড়া দিতে হয়ত হাতঘড়ি বা কোট প্যাণ্ট বন্ধকী দিতে হবে। অথ সুটকেস হাতে বিষণ্ণমুখে শ্রীমতীর হোটেলে পৌঁছলাম।

শ্রীমতী আমাকে দেখে উল্লসিত। দুঃখের পর সুখ—চক্রাবর্তনে।

"এসো এসো 'কান্তাতোরে*! বেনভেনুতো!'† আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে তার করবে। এখানে কত লোককে ব'লে রেখেছি—আমার এখানেই আসর জমাতে হবে'—ব'লেই থেমে: "কিন্তু কী ব্যাপার? 'পের্কে আব্বাত্তুতো'?"‡

আর কেন? সলজ্জে বললাম উচ্ছ্বসিতাকে আমার দুরবস্থার কথা। শেষে বললাম: "তার ক'রে টাকা আনাব সে-পথও বন্ধ, পকেটে মোটে তিনচারটি লিরা।"

তিনি শুনে হেসে কুটি কুটি: "তোমার বন্ধুরা তোমাকে সাবধান ক'রে দেয় নি? রোম শুধু ইতালির 'কাপিতালে'‡ নয়, গাঁটকাটাদেরও 'কাপিতালে'।" (শ্রীমতী প্রায়ই ইংরাজীর মধ্যে ইতালিয়ান বুকনি পেশ করতেন যেমন আমরা করি বাংলার মধ্যে ইংরাজী।)

অতঃপর বললেন: "সব ব্যবস্থা আমি করছি, ভেবো না বন্ধু! 'করাজ্জিও'!"‡ ব'লে আমার হাতে দুশো লিরা গুঁজে দিয়ে তাঁর পাশেই একটি ঘরে আমার সুটকেস রাখলেন। বললেন: "আমার কাছেই থাকো।"

মাথা গুঁজবার জায়গা তো হ'ল কিন্তু তারপর? বান্ধবী হেসে বললেন: "এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ। এবার আপনাকে পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করতে হবে রোমের বৃটিশ কন্সালের দরবারে। রসুন রসুন—আমি জানি কনসালকে, তাঁকে কথাও দিয়েছি আপনার cantico (ভজন) শোনাব, তথা আপনি হ'লেন uccello canoro (গানের পাখী)। কেবল মুস্কিল এই যে, তিনি আপনাকে নতুন পাসপোর্ট দিতে পারবেন না যদি না কোনো বৃটিশ প্রজা আপনার garante (জামিন) হয়। তবে আমি যার বান্ধবী কনসালও তাঁর বান্ধব হবেন সানন্দে—আমারি attestato-র প্রসাদে। তাই অমন মনমরা হ'য়ে থাকবেন না--coraggio! (প্রফুল্ল হোন)।"

"তাঁর আপিস কখন?"

"ব্যস্ত হবেন না। এ তো দুমিনিটের কাজ, caro mio!" ব'লেই টেলিফোন:

---

* Cantatore—গায়ক † Benvenuto--স্বাগতম্

‡ Perche abbattuto—বিষণ্ণ কেন? ‡ Capitale—রাজধানী

‡ Coraggio!—Cheer up c প্রফুল্ল হও।

"হ্যালো!...হ্যাঁ মিসেস রোলার। আপনাকে একটি উপকার করতে হবে সেই গানের পাখী-র যাঁর কথা আপনাকে বলেছি। তিনি রোম স্টেশনে নেমে গানের সুর ভাঁজছিলেন তাই লক্ষ্য করেন নি গাঁটকাটা তাঁর পিছু নিয়েছে। আমার এখানে আসবার আগেই তাঁর পাসপোর্ট উবে গেছে।...কী? হ্যাঁ হ্যাঁ—তবে গানের পাখীর সুপারিশ আছে প্রচুর। খোদ রোমা রোলাঁ তাঁর বন্ধু।...কী? আচ্ছা, আপনার ওখানে তাঁকে এক্ষনি নিয়ে যাচ্ছি—যা যা সই করবার আছে করাতে।"

গেলাম কনসাল সাহেবের ওখানে। তিনি সব শুনে এক গাল হেসে বললেন: "কালই পাসপোর্ট পাবেন—কেবল ফের গাঁটকাটাকে আর লোভ দেখাবেন না পথ চলতে সুর ভেঁজে · হা হা হা।"

বান্ধবী তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন পরদিন সন্ধ্যায় গান শুনতে। বললেন "গান শুনলে বুঝবেন he is worth his weight in gold--তাই তো গাঁটকাটাও চিনতে পেরেছে—খিল্ খিল্ খিল্।"

অতঃপর আমি তার করলাম আমার এক ইংরাজ বন্ধুকে--যাঁর ওখানে আমি ছিলাম—পরে ইংলণ্ডেও তার আতিথ্যে ও দাক্ষিণ্যে মুগ্ধ হয়েছিল। তিনি আমাকে কিছু টাকা পাঠালেন। ভ্লাদাও কিছু পাঠালো। লণ্ডনের লয়েড ব্যাঙ্কে আমার শতাধিক পাউণ্ড ছিল, কিন্তু আমি ব্রিন্দিসি (Brindisi) গিয়ে লয়েড ত্রিয়েস্তিনো কোম্পানীকে ৮০ পাউণ্ড চেক দিয়ে জাহাজে উঠব ঠিক ক'রে সে টাকা আনাই নি। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়--বলে না? ইতালীতে হাতে বেশি না রাখাই ভালো। কিন্তু হা হতোহস্মি—না, যথাপর্যায়েই বলি।

জাহাজের কর্তৃপক্ষ খবর পাঠালেন—জাহাজ ছাড়বে আরো চার পাঁচ দিন বাদে। তখনো উড়োজাহাজের জন্ম হয় নি তো তাই চুপটি ক'রে রইলাম ব'সে'--যদিও 'মুখটি ক'রে ভার' নয়। কারণ দেখতে দেখতে বন্ধু জুটে গেল—শ্রীমতী রোলারের কল্যাণে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে ভারিক্কি বন্ধু ছিলেন নিশ্চয়ই অধ্যাপক ফর্মিকি (ওরিয়েন্টালিস্ট) ও অধ্যাপক তুচ্চি। (তুচ্চি পরে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, কলকাতার আমাদের ওখানেও এসেছিলেন)।

ফর্মিকির কাছ থেকেই আমি প্রথম শুনি উপনিষদের মহিমার কথা—দুতিনবার। বলতে বলতে তাঁর মুখচোখে সত্যিই আলো জ্ব'লে উঠত। আমাকে কত কথাই যে বলতেন ভারতের উপনিষদ ও দর্শনের সম্বন্ধে। তবে সেকথা কোথায় যেন লিখেছি তাই সংক্ষেপেই বলি। (ব'লে রাখি—তখনো আমি উপনিষদ

পড়ি নি—মোল্লার দৌড় মশজিদ পর্যন্ত, আমার—গীতা) তিনি বললেন: "খৃষ্টদেবের বাণীর মধ্যে প্রেম আছে কিন্তু জ্ঞান যে চায় তাকে যেতে হবেই হবে উপনিষদের কাছে।" বৌদ্ধ দর্শনের কথা তিনি বলেছিলেন কি না মনে নেই, আরো এই জন্যে যে বৌদ্ধধর্মকে আমার চিরদিনই বড় বেশি নীরস ও গুরুগম্ভীর মনে হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শন পরে কিছু পড়ি আনন্দ কুমার স্বামীর লেখায় কিন্তু মন সাড়া দেয় নি যেমন দিয়েছিল উপনিষদের বাণীতে—বিশেষ ক'রে ঈশ, কঠ, কেন ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অপরূপ ঝঙ্কারে। ফর্মিকি যা বলেছিলেন তার মর্মবাণীটি এই যে ধর্মের সঙ্গে দার্শনিক জ্ঞানবাণী না থাকলে সে-ধর্ম হ'য়ে দাঁড়ায় অনেক সময়েই ভাববিলাস। উচ্ছ্বাস আবেগ সবই ভালো কিন্তু ঐ সঙ্গে যদি জ্ঞানের আলো না থাকে তবে চলার পথে প্রায়ই হোঁচট খেতে হয়। আমাকে শেষে যে-অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন সে অবিস্মরণীয়: "তুমি ভারতের সন্তান, অমৃতের পুত্র একথা ভুলো না। আর ভারত মানেই বেদ—উপনিষদের মৃতসঞ্জীবনী অমৃত।"

তখন আমার সম্বল খুবই কম তাই অধ্যাপক ফর্মিকির বাণীর ঠিক মর্মজ্ঞ হ'তে পারি নি। কিন্তু পরে যখনই উপনিষদ পড়তে পড়তে মন আমার দুলে উঠত মনে হ'ত তাঁর উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন। শেষ দিনে একটি কথা বলেছিলেন তিনি: "ভুলোনা বন্ধু, তুমি সেই দেশে জন্মেছ যেদেশের মহীয়সী মৈত্রেয়ী বলেছিলেন সে কবে: 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্?' এটুকু আমি ডায়রিতে টুকে রেখেছিলাম—পাছে ভুলে যাই এই ভয়ে।

এবার তুচ্চির কথা বলি। অদ্ভুত পাণ্ডিত্য। ১৭।১৮টি ভাষা জানেন তিনি এমন কি রুষ চীন ও তিব্বতী ভাষাও!! তখন তাঁর বয়স ত্রিশের বেশি নয়। শুধালাম: "এত পড়লেন কী ক'রে?" তিনি বললেন যেদিন বারো ঘণ্টার কম পড়েন সেদিন তাঁর মনে হয় বৃথা গেছে।

দুঃখের বিষয় এহেন মহাপণ্ডিতের বিবাহিত জীবন সুখের হয় নি। তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলেন আর একজনের সাদর আহ্বানে। কলকাতায় পরে শহীদ একদিন বলেছিল: "ললনা ছলনাময়ী হয়েছিলেন সম্ভবত এই জন্যে যে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ না ক'রে জ্ঞানালাপ করতে উঠে প'ড়ে লেগেছিলেন।"

চল্লিশ

রোমে অনেক কিছুই দেখার ছিল। কিন্তু ভ্যাটিকান ও সেণ্ট পিটার্স গির্জা ছাড়া কোনো স্থাপত্যই আমার মন টানে নি। তবে আমার দোষ ছিল না, কারণ আমি পরপর দুতিনটি তার ক'রেও আমার মাতামহের খবর না পেয়ে মুষড়ে পড়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম মেজমামা আমাকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ দেন নি ইচ্ছে ক'রেই।

রোমে চার পাঁচদিন থেকে ব্রিণ্ডিসি গিয়ে আমি ফের অথই জলে। আমার রেস্ত প্রায় সবই খরচ হয়ে গিয়েছিল। তবে লয়েড ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটব, ভাবনা কি?

আর ভাবনা কি! কেরাণীপ্রবর বললেন: "আমরা অপরিচিতের চেক নিই না, নগদ টাকা না দিলে আপনাকে জাহাজে উঠতে দেওয়া হ'তেই পারে না।"

ফের সেই বন্ধুভাগ্য! অধ্যাপক লেসনি সেই জাহাজের যাত্রী। শুনে বললেন: "এ জন্যে ভাবছেন কেন?" ব'লেই (৮০ পাউণ্ড বুঝি) ভাড়া দিয়ে দিলেন। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

জাহাজে উঠে দেখি গগন বিহারী মেতা। তিনি লণ্ডনে আমার গান শুনেছিলেন দুতিনটি আসরে। জাহাজে উঠে আমার মুখে রাসেলের সঙ্গে আমার লুসানোতে দেখা হয়েছিল শুনে বন্ধুবর উল্লসিত। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পান করতাম "শ্রীশ্রীরাসেলেব কথা অমৃতসমান"।

কিন্তু তখনো ফাঁড়া পুরোপুরি কাটে নি। বম্বেতে সে-সময়ে আমার জানাশোনা কেউই ছিল না যার কাছে বম্বে থেকে কলকাতা ট্রেনভাড়া ধার করা যায়। লেসনির কাছে তো ফের হাত পাতা সম্ভব নয়। শেষে ভেবেচিন্তে গগনবিহারীকেই বললাম সব খুলে। তিনি একগাল হেসে বললেন: "এইজন্যে মুখে ঘনঘটা? আলো ফিরিয়ে আনুন—আমি আপনাকে কলকাতার ট্রেনে বসিয়ে তবে জলগ্রহণ করব।"

লেসনি বম্বেতে নেমে গেলেন এলিফ্যাণ্টা গুহা দেখতে। আমি গেলাম রেল স্টেশনে। আমাকে বম্বে মেলে চড়িয়ে দিয়ে গগনবিহারী বললেন: "আমি সম্ভবত এ মাসের শেষে কলকাতা যাব তখন দেখা হবে।" ব'লে আমার হাতে আরো পঞ্চাশটি টাকা জোর করে গুঁজে দিলেন। সংসারে গাঁটকাটা আছে বৈকি—কিন্তু গগনবিহারীও তো বিদ্যমান।

ভাগবতের একটি শ্লোকে আছে :

পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতং···
জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতো বনে
পথেও যদি হারাই কিছু কভু
পাবই ফিরে তোমার করুণায়।
বনেও পথ হারাই যদি প্রভু,
মিলিবে দিশা তোমার আঁখিভায়।

একচল্লিশ

য়ুরোপে সবশুদ্ধ প্রায় সাড়ে তিনবৎসর কাটিয়ে ফিরলাম দেশে কী ভাবে সহৃদয় পাঠক পাঠিকা যদি কল্পনা করতে একটু চেষ্টা করেন তবে তাঁকে বলতেই হবে: "আহা!"

আহা ব'লে আহা! না একটা ডিগ্রি, না কোনো সরকারী সুপারিশ। ভাগ্যক্রমে মাতুলালয়ে অনাদৃত হইনি। কিন্তু এ ও জানি যে, আমার অভিভাবক মেজমামার ভাবনায় রাতে ঘুম হ'ত না। কী করবে এ-ছেলে? 'বুদ্ধি বিদ্যা রূপ স্বাস্থ্য বংশ সব থেকেও কোনো খুঁটিই যে নাস্তি! কী ক'রে দাঁড়াবে? য়ুরোপে সাড়ে তিন বৎসরে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ ক'রে কীর্তিমন্ত ফিরে এল কি না খালি হাতে! সে-সময়ে কোনো কৃতী যুবক সঙ্গীতকে বরণ করবার কথা ভাবতেই পারত না। গান বাজনায় মাতে কেবল বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ছেলে—এইই তদানীন্তন বঙ্গসংস্কৃতির সুচিন্তিত রায়। বেশ মনে আছে এক ওস্তাদকে খুঁজতে গিয়ে গল্লিকা-ধূমান্ধকার আসরে ক্লিন্ন সতরঞ্চিতে বসতে হয়েছিল—ওস্তাদের বৈঠকখানায়। তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম গান গাইতে। তিনি এসে গেয়ে আমাকে মুগ্ধও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাগাল পেতে হ'লে কোনো সুভদ্র ঘরে যাওয়ার উপায় ছিল না। কেবল এই এক সান্ত্বনা যে, মহাভারতে আছে: "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"—নারী হ'ল রত্নপ্রভা —যে-পরিবেশেই থাকুক না কেন আহরণীয়। স্ত্রীরত্ন—বিকল্পে ওস্তাদরত্ন।

আমি বলছি ১৯২২ সালের কথা। তখন কেউ ভাবতেই পারত না কোনো ভারতরত্ন বড় চাকরে উকিল বা ডাক্তার ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে। এ-প্রশ্ন নিয়ে আমি বিশদ আলোচনা করেছি আমার প্রথম উপন্যাস—"মনের পরশ"-এ—যার নাম দিই দ্বিতীয় সংস্করণে "ভাবি এক হয় আর।"

এ-আলোচনায় আমি কোথাও আদর্শবাদের মান রাখতে বাস্তববাদের (realism) মানহানি করি নি। তাই সংক্ষেপে বলা চলে—আমি যেভাবে ফিরেছিলাম তার "বরদাত্রী" ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "অলক্ষ্মীই" বটে। ("অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী")

অবশ্য গৃহে অন্নসংস্থানের অভাব ছিল না। মেজমামা ও মেজমামিমা আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। ধনী দিদিমারও ছিলাম আমি নয়নমণি। কাজেই কন্যাদায়গ্রস্ত ধনী পিতারা একের পর এক আমাকে বরণ করতে চাইছিলেন। কিন্তু আমি মনে মনে কেবল শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ডাকতাম: "দেখো ঠাকুর, ফাঁসিয়ে দিও না—লোভের পাকে ফেলে স্ত্রীরত্নকে ডাক দিতে বাধ্য ক'রে। সুন্দরী বধূবরণ করব

মনে মনে এ-ইচ্ছা ছিল ষোলো আনাই। কিন্তু ঐ যে বললাম, পথ আগলে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের করুণা। কিন্তু এ নিয়ে আর বেশি কিছু বলার দরকার দেখি না শুধু এইটুকু ছাড়া, যে আমি পণ নিয়েছিলাম যদি স্ত্রীরত্ন আহরণ করিও তবে তারই জন্যে করব—তার যৌতুকের জন্য নয়—অর্থাৎ বিবাহে শ্বশুরকে রেহাই দেব কন্যাদানের সঙ্গে ধনদান থেকে। না, আরো একটি কথা আছে: আমি জানতাম (মন আমার নিরন্তরই বলত):

ওরে উদাসী অবোধ চিত্ত।
তুই চল্ তাঁর বল করি সম্বল
না চাহি স্বার্থ কি বিত্ত।
যদি আসে প্রলোভন পথ-বাঁকে
তুই প্রার্থনা কর্, বল্ তাঁকে:
"নাথ, আমি যেন চাই জীবনে মরণে
তোমারি চরণ নিত্য।"

কিন্তু এ তো সমস্যার মাত্র একটি দিক। আর একটি সমস্যা—কী করি? কর্মে আমার আসক্তি প্রবল, চুপ ক'রে ব'সে থাকা বিলাস-প্রাসাদে—এ তো সম্ভব নয়।

সমাধান এল সঙ্গীতপ্রেম থেকেই যে ছিল আমার প্রথম প্রেম: স্থির করলাম—চুটিয়ে গান শেখা যাক। শুধু শেখা নয়, গানের খবর নেওয়া—সারা ভারত টহল দিয়ে। অর্থাৎ শুধু গুণী হওয়া নয়—যার নাম musician—সেই সঙ্গে হ'তে হবে সঙ্গীতকোবিদ, musicologue.

সুরু হ'ল আমার সফর—দিনের পর দিন মাসের পর মাস। সারা ভারত চক্র* দিতে দিতে সঙ্গীতে নিত্য নব আনন্দের আবিষ্কারে মন মেতে উঠল।

* আমার জীবনের এই সঙ্গীতসাধনা পর্বের ইতিহাস আমি লিখেছিলাম ১৩২৫ সালে "আমার ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকায়।" দ্বিতীয় সংস্করণে এর নামকরণ করি শুধু—"ভ্রাম্যমাণ।"

বিয়াল্লিশ

এ সময়ে গানের একটি গভীর আলো আমার মন ছেয়ে থাকত। এ-আলো আমার অন্তরে গীতিচর্চায় নামে নি—নেমেছিল আকাশ-থেকে নামা বৃষ্টিধারার ম'ত—যেমন মধুচ্ছন্দ তেমনি চমকপ্রদ। নানা ওস্তাদের কাছে গানের তালিম নিতাম ঠিকই—কিন্তু গানের সঙ্গে আমি যেন আবাহন করতাম তাঁর করুণা যিনি "দাঁড়িয়ে থাকেন গানের ওপারে" যিনি চির বরণীয় হ'লেও চিরপলাতক—ছুঁয়ে ছুঁয়ে যান, কিন্তু ধরা দেন না। এ-বিচিত্র অনুভূতির কী নাম দেব জানি না। সময়ে সময়ে স্পষ্ট অনুভব করতাম এক বৈদেহী আবির্ভাব—অথচ দেহানুভূতির চেয়ে চতুর্গুণ প্রত্যক্ষ। এই আবির্ভাবই ক্রমশ আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল শিল্পধাত্রী গীতিকা থেকে করুণাপ্রার্থী ভজনে বাউলে কীর্তনে। ওস্তাদি সঙ্গীত আমার ভালো লাগত তখনো, এখনো লাগে—কেবল তার মাধুর্যের মধ্যে পাই না সেই তৃপ্তি যা জীবনের সব অপ্রাপ্তির ক্ষতিপূরণ করে। রবীন্দ্রনাথের সেই বিরহিণী নারীর মতন অন্তর এ ও তা চায় কিন্তু পেলে দেখে মন ভরে না। এম্নি ক'রে একটু একটু ক'রে এক আবছা তৃষ্ণা মনে জেগে উঠল: গান বিধাতার একটি শ্রেষ্ঠ দান নিঃসন্দেহ, কিন্তু প্রেমের মতন গানেরও স্তরভেদ আছে। যাঁরা বলেন শুধু সুরের অনবদ্যতা এমন নিটোল আনন্দ পূর্ণিমার আবাহন করতে পারে যার আলোয় চিত্তাকাশে তমসার চিহ্নও থাকে না তাঁদের আমি বলতে পারি সত্যের মর্যাদা রেখে যে, এ-পূর্ণিমাকান্তি একদা আমাকেও মুগ্ধ করেছে। কিন্তু চলার পথে এ সুষমাকেও আমার বিদায় দিতে হয়েছে যেমন উপরে উঠতে হ'লে প্রতি পৈঠায় আরূঢ় হ'য়েও তাকে বিদায় দিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথিকা: কাঠুরেকে এক সন্ন্যাসী এসে বললেন—এগিয়ে যা, এগিয়ে যা। সে প্রথম একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দনবন। দারিদ্র্য তার ঘুচল চন্দন কাঠ বেচে। তারপর একদিন তার হঠাৎ মনে বেজে উঠল সন্ন্যাসীর নির্দেশ: এগিয়ে যা। সে আরো এগিয়ে দেখে রূপার খনি। কিন্তু সেখানেও বাঁধা পড়া সম্ভব হ'ল না ঐ একই নির্দেশে: আরো এগিয়ে দেখে সোনার খনি···হীরার খনি···

কিন্তু ততঃ কিম্? তারপরে কী? কে জানে! মন কিছুই নিশ্চিত জানে না, অথচ না জেনেও জানে একটি কথা: যে,

> "আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে
> তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
> যুগে যুগে পূর্বাচলে আলোকে আলোকে
> ভাষার অতীত তীরে—
> কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।"

তেতাল্লিশ

এ-ধরণের কথা তাঁদের কাছে কবিত্ব ভাববিলাস স্বপ্নচারণ···মনে হবে যাঁরা এ-ডাক শোনেন নি। কিন্তু যে একবার শুনেছে এ-অকূলবাঁশির ডাক তার আর নিস্তার নেই—তাকে প্রতিপদে সব বন্ধন কেটে এগিয়ে যেতেই হবে মুক্তির অভিসারে ভক্তিকে পাওয়ার মতন ক'রে পেতে।

এ-ভাব আমি শুনেছিলাম ছেলেবেলায়ই বটে, কিন্তু তারপর হাজারো বাসনার সোনার হরিণ আমাকে বারবার পথভ্রষ্ট করেছে—যদিও লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে নি কেন না এ চ্যুতিও পদেপদেই আমাকে নব অভ্যুত্থানের প্রেরণা দিয়েছে—আমার সাধনার গুণে নয়, তাঁর করুণার অঘটনে—যিনি আমাকে সবকিছু দিয়েও ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন সোনালি মোহ থেকে। ওকে বৈরাগ্য নাম দিলে হয়ত বোঝানো একটু সহজ হবে আমি কী বলতে চাইছি। কিন্তু বৈরাগ্য বলতে আমরা সচরাচর যে-সংসার বিতৃষ্ণা বুঝি সে-বৈরাগ্য আমাকে অচিন পথের উদাসী পথিক করে নি। কারণ আমার বরাবরই মনে হয়েছে—বৈরাগ্য বা ত্যাগের সত্য আমাদের মনপ্রাণকে বল দিলেও পাথেয় দেয় কেবল প্রেম। সেই প্রেম আমার হৃদয়ে এসে জাঁকিয়ে বসল—যেদিন প্রথম শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করলাম পণ্ডিচেরিতে ১৯২৪ সালে। না, অত্যুক্তির রগ ঘেঁষে গেছি। প্রেম নয়—ভক্তি। প্রেম এসেছিল পরে, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে স্থায়ী হয়ে যখন তাঁর প্রতি মন উন্মুখ হয়েছিল তখন। ১৯২৪ সালে মনে হয়েছিল যেন সমস্ত ঘরটা আলো হয়ে উঠেছে তাঁর জ্যোতির্ময় উপস্থিতিতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন আমার প্রথম গুরু—চিরকালের ধন। কিন্তু সেদিন মনে হ'ল—যেন প্রথম গুরু আমার ভার দিলেন দ্বিতীয় গুরুকে। যোগদীক্ষায় এ-রীতি শাস্ত্রসম্মত। তবে যদি অশাস্ত্রীয় হ'ত তাহ'লেও আমি বলতাম যে, ১৯২৪ সালে শ্রীঅরবিন্দকে দেখবামাত্র আমার মনে হয়েছিল—তাঁকে আমার অন্তর গুরুবরণ করতে পারে। বেশ মনে আছে—শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম করবার সময় আমার কানে বেজে উঠেছিল যে, তিনি উপনিষদের ঋষির সগোত্র, তাঁর আলোভরা চোখ যেন গাইছে:

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" (কঠ)

সে-মহিময় দেবদেবে জানি আমি—
বর্ণ যাঁহার সূর্যপ্রভ নিত্য-আসীন যিনি
অজ্ঞান-তমসার যবনিকা পরে হৃদয়ের স্বামী

কিন্তু হ'লে হবে কি, সঙ্গে এক বিষম ভয় আমাকে পেয়ে বসল : যদি অচেনাকে বরণমালা দেওয়ার পরে শরণ চাইতে না পারি—তাহ'লে দুর্গতির সীমা থাকবে না যে! শুধু দুর্গতি নয়—লজ্জা!

পিছিয়ে গেলাম। হায় রে, এরই তো নাম মায়া—মোহ। অন্তর আমার জানত যে, চাইলে পাবই পাব—Who seeketh findeth—কিন্তু বেয়াড়া মন বাদ সাধল—বলল "অকূলে কূল মেলে এ তো কেবল জনশ্রুতি। অন্তত: তুমি যে পাবে তার জামিন হবে কে?"

তারপর চলল অশ্রান্ত দ্বন্দ্ব - দোটানার যন্ত্রণা। আমি বিলাসের কোলে মানুষ—ভোগে শুধু দুর্ভোগই তো পাই নি। আমার অজস্র প্রাণশক্তি সব কিছু থেকেই রস আহরণ করত এ তো কথার কথা নয়, প্রত্যক্ষ সত্য।

কিন্তু ক্রমশ যতই অকূল বাঁশির সুর একটু একটু ক'রে প্রবল হয়ে ওঠে, ততই ভোগের অতৃপ্তিকর সুর আসে নিস্তেজ হ'য়ে।

সংসারে আনন্দ পাচ্ছি না আর তেমন, এমন কি গান-যে-গান তাও কই আর তো তেমন রসাল মনে হয় না—এ সত্যটি আবিষ্কার ক'রে এতই ভয় পেয়ে গেলাম যে সংকল্প করলাম এ-উদাসী ভাবকে বেশি প্রশ্রয় না দিয়ে সঙ্গীতের আদর্শকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরব। যোগার্থীর পথে বাধা আসে নানা ছদ্মবেশে। আমার পথে এল আমেরিকা থেকে নিমন্ত্রণ : সেখানে গিয়ে এডিসনের লং প্লেইং রেকর্ড করবার সাদর আহ্বানে মন সাড়া দিল। সুভাষ উৎসাহিত হ'য়ে উঠল কারণ আমার বৈরাগী ভাবকে সে নেকনজরে দেখত না। কিছুদিন আগে তার সহকর্মী শ্রীঅনিলবরণ রায় পণ্ডিচেরি চলে যাওয়াতে সে বড়ই ক্ষুব্ধ হয়েছিল। আমাকে ধরল—"যাও আমেরিকা। এমন স্বর্ণসুযোগ ছেড়ো না।"

আমাকে সে য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটুটে বিরাট সভা ক'রে মাল্যচন্দন দিয়ে অভিনন্দিত ক'রে জাহাজে চড়িয়ে দিল। গেলাম নীস।

কিন্তু নীসে পল রিশার ফের শ্রীঅরবিন্দের গুণগান করতে মন আমার ফের দুলে উঠল। কোথায় যাচ্ছি, কী করতে? এডিসন কোম্পানীর নিমন্ত্রণে লং প্লেইং রেকর্ড ক'রে যশোমান? কিন্তু গান ক'রে যশস্বী তো হয়েছি তাতে কি মন ভরেছে? কী? মোটা অঙ্কের অর্থলাভ? কিন্তু ব্যাঙ্কে অর্থ তো আমার যথেষ্ট আছে, তাছাড়া দেশে গান গেয়েও তো যথেষ্ট টাকা রোজগার হ'তে পারে। ভাবতে ভাবতে চিত্তগ্লানিতে মন আমার কালো হ'য়ে গেল : যে-আমি আদর্শবাদের ঝিগির তুলে বড় বড় কথা বলি সে-আমি কিনা যাচ্ছি আমেরিকায় আর পাঁচজনেরই মতন আরো ধনযশমান কুড়োতে?

তবু অনেকদিনের সংস্কার তো। ষ্টীম থামলেও গাড়ী চলে কিছুক্ষণ। নীসেও ভীষণ

দিলাম সঙ্গীতের। তারপর লণ্ডনেও গাইলাম তারস্বরে। শেষে স্কটল্যাণ্ডে এডিনবরায়ও লেকচার দিলাম বিখ্যাত Odd fellous Hall-এ।

অতঃপর কর্ণওয়ালে বার্টরাণ্ড রাসেলের সঙ্গে দেখা। এই প্রথম সত্যি আনন্দ পেলাম বিলেতে। কিন্তু রাসেল ছাড়া আর কারুর সঙ্গে মিশেই তেমন তৃপ্তি পাই নি ইংলণ্ডে। ঠিক করলাম তিনি যে জাহাজে আমেরিকা রওনা হচ্ছেন বক্তৃতা দিতে, আমিও সেই জাহাজে পাড়ি দেব। রাসেলের সহযাত্রী হব—ভাবতেও বুক দশহাত।

কিন্তু হা অদৃষ্ট! এ জন্যেও মনে ধিক্কার এল: এরই তো নাম ঐহিকতা। রাসেল নাস্তিক, তাঁর কাছে কী পেতে পারি আমি—যে-আমি ওদিকে শ্রীঅরবিন্দের ডাক শুনেছি?

তারপর ফের সেই অন্তহীন অন্তর্দ্বন্দ্ব। শেষে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে আমেরিকার জাহাজ কোম্পানীকে লিখে দিলাম যে আমি আমেরিকা যাব না।

অতঃপর এখানে ওখানে একটু বিচরণ ক'রে দেশে ফিরলাম। অব্যবস্থিত চিত্তের মন কবে শান্ত হয়?

১৯২৭ সালের শেষে দেশে ফিরে মন আরো খারাপ হ'য়ে গেল। একদিকে অন্তর ঝুঁকেছে পণ্ডিচেরির দিকে, অন্য দিকে মন বলছে- সাবধান! ওখানে গিয়ে কিছুই পাবে না। রবীন্দ্রনাথেরও উপদেশ চাইতে তিনি আমাকে বললেন এই সময়ে: "তুমি শিল্পী দিলীপ, যোগী হ'তে চাইছ কেন?" ব'লে অনেক বোঝালেন, কী যে স্নেহের সুরে! সে-স্নেহ কি ভোলা যায়? শেষে যুক্তিও দিলেন শুধু অকাট্য নয়, খরশান, মর্মভেদী। আমি নিজেকে বললাম: "সত্যিই তো, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।"*

এই সময়ে কৃষ্ণপ্রেমের সন্ন্যাসে ফের মন দুলে উঠল। সে কাহিনী লিখেছি অন্যত্র ফলিয়েই। তাই ভাবলাম—একবার পণ্ডিচেরী আশ্রমে গিয়ে দেখি কিছুদিন কী হয়।

*কয়েক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের এ উক্তিটি উদ্ধৃত ক'রে আমি গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দকে একটি চিঠি লিখি। উত্তরে তিনি আমাকে লেখেন: "তাঁর চেয়ে আমি তোমাকে বেশি চিনি ও জানি। তাই বলেছি তোমাকে যে তুমি জন্মযোগী (born yogi) ইত্যাদি..."

চুয়াল্লিশ

যেই এ-সংকল্প করলাম বাধারা যেন চক্রান্ত ক'রে হানা দিল আমাকে নিরস্ত করতে—তাদের সাবধানী রাগের বাদী সুরটি ছিল: "এমন কাজটি কোরো না হে উচ্ছ্বাসী—a round peg square hole-এ কদাচ বসে না, বসতে পারে না। গীতা কি ভুল বলেছে: 'পরের ধর্ম যত কেন সু-আচরিত হোক না, নিজের ধর্মে কায়েমী হ'য়ে থাকাই সুবুদ্ধির কাজ—স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহ।"

আমার মন চিরদিনই দোদুল্যমান—এ-যুক্তিতে ভয় পেয়ে ঠিক করল—সাত তাড়াতাড়ি কোনো কিছু না ক'রে অ্যাসকুইথের "wait and see" মন্ত্র জপ করাই পন্থা। ঠাকুরের কাছে কিছু পাই আগে তারপর দেখা যাবে।

তারপর অনেক কিছুই ঘটল যা বলবার ম'ত। কিন্তু সে সব একাধিকবার বলেছি: (১) আমার "অঘটন আজো ঘটে"-র শেষ অধ্যায়ে একটু আধটু বদলে; (২) "ছায়াপথের পথিক"-এর শেষার্ধে; (৩) স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় ভাগে।

"র'য়ে স'য়ে" এ-নীতিরও বিপদ আছে। আমার পথে বাধা এল বিপদ হ'য়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের করুণায় তার কাটানও এসে আমাকে ত্রাণ করল—তাকে অভাবনীয় বললে কিছুই বলা হবে না—অকল্পনীয়। শেষে এক প্রিয় বন্ধুর কথায় মন ছি ছি ক'রে উঠল। তিনি ধমকে বললেন: "ভগবানের সঙ্গে দরদস্তুর ক'রে কে কবে তাঁকে পেয়েছে? আগে দাও কিছু তবে আমি তোমার শরণ নেব—এ quid pro quo সংসারের ছন্দ হ'লেও শরণাগতির ছন্দ নয়। যে শরণ চায় সে ঝাঁপ দেয় পরিণামচিন্তা ছেড়ে।"

ঘটল অঘটন। পাঁচ মিনিট চোখের জলে প্রার্থনার পরে মন স্থির হ'য়ে গেল, লক্ষ্ণৌ থেকে গুরুদেবকে টেলিগ্রাম করলাম যে, আমি সর্তহীন হ'য়ে তাঁর পায়ে শরণ নিতে চাই। তাঁকে ঠিকানা দিলাম বম্বের—বন্ধুবর শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনের ওখানে। লক্ষ্ণৌ থেকে গেলাম সোজা তাঁর ওখানে। তিনি তো অবাক। হঠাৎ না ব'লে কয়ে? আমি উত্তরে শুধু বললাম: "আমি পণ্ডিচেরি যাচ্ছি।"

এই সময়ে আমার মন যে কী আনন্দে উদ্বেল থাকত সারাক্ষণ—ভাষায় তার বর্ণনা হয় না। কৃষ্ণপ্রেমের কথা মনে পড়ত বারবার: "Ask nothing, give everything" সর্তহীন আত্মসমর্পণের স্বাদ এই প্রথম পেলাম—যদিও এ স্বাদ বেশিদিন থাকে নি—সংশয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে চোখের আলো কালো হ'য়ে যেত থেকে থেকে। কিন্তু অস্তছায়ার পরে ফের উদয়রাগ মন রাঙিয়ে তুলত। কেবল মনে হ'ত শ্রীরামকৃষ্ণের পাশাপাশি শ্রীঅরবিন্দের কথা। আমার মনে হয়, আমি খাঁটি

গুরুবাদী নই—যেকথা আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম। কারণ আমি জোর ক'রে আজো বলতে পারি না যে শুধু শ্রীঅরবিন্দের কৃপাই আমার পথে বাতি ধ'রে এসেছে বরাবর। অনেক সময়েই আমার ধ্যানে তাঁর জ্যোতির্ময় মুখের পাশে ফুটে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাকোমল মুখ—বিশেষ ক'রে তাঁর দণ্ডায়মান সমাধিস্থ ছবি। "কথামৃত" আজো পড়ি প্রায় প্রতিদিনই। আমি তাঁর তর্পণে লিখেছিলাম অন্তরের উচ্ছ্বসিত অর্ঘ –

তোমাকে প্রণাম চির-অভিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার,
জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে মা বিনা যে কিছু জানে নি আর!
দুহাতে কেবল বিলালে অমল, জগন্মাতার মহাপ্রসাদ
ভুলিয়া মায়ার ভুলিয়া ধরায় ছিলাম আমরা যাহার স্বাদ।

গাহিলে মধুরে: "যে শিশুর সুরে কেঁদে ডাকে: মাগো কোথা তুমি?
"আয় আয়" ব'লে টেনে নেয় কোলে মা তারে কপোলে স্নেহে চুমি'
সে-প্রেমময়ীর প্রেমই বুকে বুকে ঝরে যুগে যুগে মধুরিমায়
সে-আলোময়ীর নয়নমণির আলো জ্বলে রবিশশিতারায়।

"মা তারেই পায় দেয় ঠাঁই চায় গহন হিয়ায় যে তাঁহারে।
চরণে তাঁর যে শরণ না চায় ঘুরে মরে হায় সে আঁধারে।
মানব জীবন স[illegible] সাধন হয় শুধু সুধাপরশে তাঁর
সে সুধায় যার মিটে ক্ষুধা তার থাকে কি অভাব ভুবনে আর?

"জ্ঞানের গরব বিভূতি [illegible]ভব কত ছলে জনে জনে ভুলায়!—
সোনার-হরিণ-মৃগয়ায় [illegible] রঙিন সুখ-আশায়
জানিতে সে [illegible]য়—বনবীথিকা[illegible] আছে কত শাখা পাতা ও ফুল,
তবু যায় ভুলে—ফলই প্রাণদাতা, বিদ্যাভিমান মিথ্যামূল।"

উষার বিন্দুমূর্ছনা সাথে মিশায়ে সিন্ধুনিশার তান
রবি' সে-মায়ার রাজধানী ভুলি প্রেমরবিরাগ দীপ্যমান।
ভুলে যাই—তুমি গাহিতে: "আমরা মায়ের কোলের শিশু অমর,
যে-ই ভালোবাসে পায় কোল মা-র—মহিমোজ্জল দীপঙ্কর।"

করুণাকোমল, সরল, শ্যামল, মায়ের দুলাল নিরভিমান !
ঝরাতে অঝোর বরাভয় মা-র ধরেছিলে তনু হে মহীয়ান্ !
আজ প্রার্থনা : "যেন আরাধনা করি ভক্তির হৃদয়ে নাথ।—
আনন্দে যার ঝরিত তোমার কথা গান সুর দিবস রাত।

চাওনি কিছুই আপনার তরে, করো নি চিন্তা—কী হবে কাল।
ঝরালে মোহন অমৃতবচন পতিতপাবন-রূপে দয়াল !
তাই যোগী মুনি কবি জ্ঞানী গুণী গায় নাম তব আঁখিজলে :
বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ লুটালো তোমার পদতলে।

(ধুয়া)

ধনজনমান কামনার মোহে দেখে আমাদের অন্ধ ম্লান,
ঝলকিয়া নিশা, উজলিয়া দিশা, উছলিয়া উষা এলে মহান !

গুরুবাদের নানা রূপ আছে হয়ত। জানি না। অন্তরাত্মার আত্মপ্রকাশের, চাহিদার, আনন্দ আহরণের, ভাব উদ্দীপনের কতরকম ব্যবস্থা আছে কে বলবে? কে জোর ক'রে বলতে পারে : "আমি জানি গুরুর করুণার শুধু একটিমাত্র ধারা?" আমি কেবল জানি—আমার মন শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুবরণ করার পরে শ্রীঅরবিন্দের শরণ নিয়ে আপ্তকাম হয়েছিল, শুনেছিল এই যুগলবন্ধে আমার মনের প্রাণের স্তবগান। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমি চর্মচক্ষে দেখি নি। কিন্তু আমার স্বপ্নলোকে তিনি বারবারই আমাকে আশীর্বাদ ক'রে বলেছেন : "মাভৈঃ"। স্বামী ব্রহ্মানন্দের ধ্যানদর্শন—যে "তাঁর করুণা আমাকে ঘিরে আছে"—মিথ্যা নয় আমি কতবারই তো উপলব্ধি করেছি বিশেষ ক'রে বিদেশে।

অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বল দিয়েছেন প্রতি নিষ্ঠাহীন দুর্বলতার পিছুটান কাটাতে। সবচেয়ে আশ্চর্য যে, এ প্রসাদ আমি পেয়েছি অগুন্তিবার তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কির মাধ্যমেই। জাদুকর সম্রাট্ পি. সি. সরকারের একটি খেলায় দেখেছিলাম —তিনি ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে যত্র তত্র চাবুক মারছেন আর ফুটে উঠছে কশাহত মাটিতে একের পর এক লাল নীল সাদা ফুল। মানুষ যে সবচেয়ে বেশি লড়াই করে দৈবী করুণার সঙ্গে এই সনাতন সত্যটির সঙ্গে আমার যেন নতুন ক'রে পরিচয় হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আদান প্রদানে। একদা আমি তাঁকে লিখেছিলাম হেসে : "গুরুদেব। প্রতি শিষ্যই গুরুকে ভালোবেসে তার কোনো না কোনো প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়—আবিষ্কার করে তাঁর মহিমা নব নব রূপে। আমি তোমার মধ্যে আবিষ্কার করেছি তোমার দৈবী তিতিক্ষার অমানুষিক ধৈর্যের।" মনে পড়ে—

কতবারই তাঁকে ভয় দেখিয়েছি উদ্ধত ভাবে "চললাম" ব'লে, কিন্তু প্রতিবারই ফিরে পেয়েছি তাঁর স্নেহের সুধাশিস। মনে পড়ে—পণ্ডিচেরিতে তাঁর চিঠি পাওয়া দিনের পর দিন—সে তো শুধু হর্ষ নয়—শিহরণের রোমান্স। এ অশান্তি মিথ্যা চ্যুতির মসীকৃষ্ণ জগতে যে এমন নিটোল আনন্দ-পূর্ণিমার দেখা পাওয়া যায় দিনের পর দিন অমাবস্যাকে নিরস্ত ক'রে এ কি আমি কল্পনা করতে পারতাম শ্রীঅরবিন্দের অচিন্তনীয় করুণা না পেলে? ত্রিশ বৎসর আগে আমি তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতার অর্ঘ নিবেদন করেছিলাম এই অর্ঘের অঙ্গীকারে*:

যে-মাটিতে স্বার্থবীজ ফলায় পরার্থভানে হায়
কাঁটাফুল ছদ্মবেশে; কণাদান দিয়ে দাতা চায়
নানা ছলে প্রতিদান; কবি শিল্পী সৌখীন ভঙ্গিমা—
বিহারে সদর্পে আঁকে তুচ্ছতার ক্ষণায়ু রঙ্গিমা;
যে-মাটিতে বন্ধু চায় রোপিতে মহানুভবতার
দানাঙ্কুর—বন্ধুরে বাঁধিতে ঋণে সে-বদান্যতার;
যে-মাটিতে বান্ধবী ঝরায়ে মৈত্রীমধু এতটুক
কামনার জালে বাঁধি' মিত্রে তার চায় আত্মসুখ;
বিনা স্তুতি-উদ্দীপনা সুহৃৎও প্রীতির অঙ্গীকার
ভাঙে পলে—সে-মাটিতে মঞ্জরিয়া ওঠে-যে মন্দার:
পারিতাম জানিতে কি চিনিতাম যদি না তোমায়,
আশ্চর্য দানেশ! বিনা প্রত্যাশা যে দুহাতে বিলায়
কেহ নিত্য প্রেমধন—কে জানিত? তুমি দেবদূত
হ'য়ে এলে মর্ত্যে, তাই লীলা তব অচিন্ত্য অদ্ভুত!
সাধালে সাধন সুর নিষ্ঠাহীনে আপনি সাধিয়া;
বাসিতে শিখালে ভালো সংশয়ীরে প্রেমে নিমন্ত্রিয়া;
নির্দিশা বেদনাতরী শিখালে ভিড়াতে হে কাণ্ডারী,
তোমার চেতনাকূলে; বালুচরে উদিলে ঝঙ্কারি'
ছাপিয়া দুকূল আগমনী গানে। তাই তব তীরে
নৈরাশ্যে আশ্রয় পেল পথহারা দুরাশামন্দিরে,
নিখিল যুগের জ্বালা......

* সম্পূর্ণ কবিতাটি আমার "অনামিকা-সূর্যমুখী"তে ছাপা হয়েছে "নয়নেশ্বর" শিরোনামায়

হে মন্ত্রর্ষি কবি, প্রেমতুরঙ্গম—তব স্মৃথহাসি,
নিষেধ তোমার—প্রেমবল্‌গা ; উপমা—প্রেমের বাঁশি ;
দীক্ষা—প্রেমাকাশ বাণী ; প্রেমকর—পথের পাথেয় ;
প্রেমসখ্য—তোমার দাক্ষিণ্য। প্রেমশৌর্যে হে অমেয়
ধুলায়ো নক্ষত্র জ্বালো। তাই কত গর্বী দম্ভ ছাড়ি'
তোমার চরণে নত ! কত জ্ঞানী প্রেমের ভিখারী !
নিশার্ত বসুন্ধরায় বিরহাস্ত ভঙ্গিতে তোমার
নয়নতপস্যা : নমো নয়নেশ্বর, প্রেমাধার !

পরিশিষ্ট

"স্মৃতির শেষপাতা"য় আমি চেকোশ্লোভাকিয়ার আদিরাষ্ট্রপতি মহামতি মাসারিকের (President Tomas Garrigne Masaryk) নাম উল্লেখ ক'রেই ক্ষান্ত হয়েছি। কেন—বলি।

মাসারিকের সঙ্গে আমার আলাপের একটি অনুলিপি আমি লিখে রাখতে ভুলি নি—১৯২২ সালে, প্রাগে। কিন্তু সে-অনুলিপিটিও নেই, কোন পত্রিকায় সেটি ছাপিয়েছিলাম তাও মনে করতে পারছি না—আমার স্মৃতিশক্তি সতেজ থাকা সত্ত্বেও। তবু মনে হ'ল—যেটুকু আজো মনে পড়ে লিখে রাখি—আরো এই জন্যে যে, বিশেষ ক'রে এ-যুগে এহেন ভাবুক মহাজনের কাহিনী সময়োপযোগী হবে—যখন চারদিকেই দেখি আস্তিক্য ও আদর্শবাদের আলো নিভন্ত। (এক রাজ্যসভা-সদস্য আমাকে সম্প্রতি বলেছিলেন বাঁকা হেসে যে, এ-যুগে এ-ও-তা নানা ইসম নেই, আছে কেবল একটি—গীতার ভাষায়—"পিতা ধাতা মাতা পিতামহ" -ইসম্—অর্থাৎ opportunism, সুবিধাবাদ।) তাই আমাদের আরো মনে রাখা ভালো যে, এযুগেও* এমন একজন মহানুভব কীর্তিমানের অভ্যুদয় হয়েছিল যিনি দার্শনিক হ'য়েও রাজনেতা হয়েছিলেন এবং রাজনেতা হ'য়েও কোনোদিনই অসত্যপন্থী সুবিধাবাদীদের দলে নাম লেখান নি।

শক্তিপীঠ রাজাসনে গদিয়ান হ'য়ে যে কোনো দণ্ডধর সুবিধাবাদকে পাশ কাটিয়ে সত্যনিষ্ঠ থাকতে পারেন একথা শুনে ইদানীন্তনেরা বাঁকা হাসলেও বলা চলে যে, যেমন পঙ্কেও পঙ্কজ জন্মায় তেমনি রাজনীতির মিথ্যামুখর কুরুক্ষেত্রেও সত্যাশ্রয়ী রাষ্ট্রপতির অভ্যুদয় হ'তে পারে—যদিও হয়ত ব্যতিক্রম হিসাবে। কিন্তু যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের ঊর্ধ্বচেতনার বিকাশ হ'য়ে এসেছে তো কতিপয় ব্যতিক্রমের মাধ্যমেই। তাই ব্যতিক্রমকে বাতিল ক'রে বাস্তবের ছবি নিটোল হ'তে পারে না।

রাসেলের বোধহয় Problem of China-য় পড়েছিলাম বহু বৎসর আগে যে, holders of power are generally evil men—দণ্ডধরেরা সচরাচর দুর্জনই হ'য়ে থাকেন।" লর্ড এ্যাকটনের প্রখ্যাত উক্তিটিও অপ্রতিবাদ্য: "Power corrupts". একদা এ ধরণের কথা শুনে আমি দুঃখবোধ করতাম, কারণ রাজনৈতিকদের মতিগতি দেখে মনে না হ'য়েই পারে না যে, অধিকাংশ রাজনৈতিক

* আমি ১৯১৮ সালের কথা বলছি—যখন পরাধীন চেকোশ্লোভাকিয়া হাপ্‌সবুর্গ—অষ্ট্রিয়ার কবল থেকে ("মুক্তিফৌজের" মতনই) মুক্তিঘোষণা করেছিল রিপাব্লিক নাম নিয়ে মাসারিককে রাষ্ট্রপতি-পদে বরণ ক'রে।

কীর্তিমন্তদেরই শুধু যে ভিত্তিমূল টলমলে তাই নয়, তাঁদের অন্তরে বিবেক ব'লে কোনো কর্ণধারেরও বালাই নেই। একবার শক্তিমদের স্বাদ পেলে মানুষ হ'য়ে দাঁড়ায় সেই বাঘের মতন, নরমাংসের স্বাদ পাওয়ার পরে যার আর কোনো মাংসেই রুচি হয় না। ভাষ্য: শক্তিমদ এতই স্বাদু যে তার পরে শক্তিসম্পর্কহীন অঢেল ধনজনমান প্রতিষ্ঠাও বিস্বাদ ঠেকে। তবু "অধিকাংশ" বিশেষণটি লক্ষণীয়, কারণ এমন কি এ-দেউলে যুগেও কখনো কখনো এমন আন্তরসম্পৎশালী মানুষের আবির্ভাব হয় যাঁরা "দুর্জন" নন। এঁদের মধ্যে মাসারিকের মতন মহাজনের অভ্যুদয়ে মনকে কিছুটা আশ্বস্ত করে দেখিয়ে যে, পরিবেশ আদর্শবাদের ঘোলো আনা প্রতিকূল হ'লেও মহানুভব মানুষ এখনো জগৎজোড়া আসুরিক তীরন্দাজিতে অনাহত থাকতে পারেন, সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মভাবের কবচকুণ্ডলপ্রসাদে। এ-কথাটি, আমি য়ুরোপে প্রায়ই শুনতাম প্রেসিডেন্ট মাসারিকের সম্পর্কে—যিনি শুধু যে স্বভাবে আদর্শবাদী ছিলেন তাই নয়, ছিলেন স্বধর্মে দার্শনিক, চারিত্রগুণে সর্বশ্রদ্ধেয়—সর্বোপরি, একজন বলিষ্ঠ জাতিসংগঠক—নেশনবিল্ডার। এই অক্লান্তকর্মী ভাবুক মহাজনের অবদানের গুণগান করতেন নানা লোকেই ১৯২২ সালে—বিশেষ ক'রে জর্মনিতে ও প্রাগে। তাঁদের মুখে শুনতাম তাঁর দুটি প্রখ্যাত বইয়ের নাম: "Sociological Foundation of Marxism" ও "Russia and Europe". দুঃখের বিষয় এ দুটি বই আমি সংগ্রহ করতে পারি নি সে সময়ে। কিন্তু তাঁর বইয়ের কথা থাক, বলি তার কথা আমার স্মৃতি জোয়ারে উজান বেয়ে চ'লে।

সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে ভ্লাদিয়া ও মার্থার কোরাসে মাসারিক গুণকীর্তন। বলত ওরা: "সম্প্রতি যখন একদল দেশধ্বজ একজোটে চেকোশ্লোভাকিয়ার কোনো অতীত মিথ্যামূল মহিমার জয়ধ্বনি সুরু করেছিল তখন নাকি প্রেসিডেন্ট মাসারিক অকুতোভয়েই প্রতিবাদ ক'রে বলেছিলেন: "জাতীয় গুণগান শ্রুতিমধুর হ'লেও জীবনে সত্যনিষ্ঠার জুড়ি নেই—দেশধ্বজেরা জালজুয়াচুরির নিশান উড়িয়ে আমাদের দেশকে বড় করতে চাইছে—এপথে উপস্থিত কিছু নগদবিদায় করায়ত্ত হ'লেও অন্তিমে আমরা অশ্রদ্ধেয় হবই হব।" ভ্লাদিয়া আরো বলত: "কিন্তু এ-শুধু ফলাফলবিচারের কথা নয় ভাই, আমাদের প্রেসিডেন্ট বলেন: 'এই কথাটা আমাদের ধরে রাখতেই হবে—আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে যে, শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয়—জাতীয় জীবনেও সত্যনিষ্ঠার স্থান সর্বোচ্চে।' এর ফলে তাঁর নিন্দায় লোকে মুখর হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি একের পর এক ঘা খেয়েও তাঁর সত্যভিত্তি প্রতিবাদ প্রত্যাহার করেন নি।"

প্রাগে আমি আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার পরেই প্রেসিডেন্টের নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে চমকে উঠি যে, তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান এবং তাঁর সঙ্গে

সান্ধ্যভোজের পরে যদি তাঁকে আমাদের গান শোনাই তাহ'লে তিনি বিশেষ সুখী হবেন।

ভ্লাদিমা সে চিঠি দেখেই আমাকে আলিঙ্গন ক'রে বলল: "ধন্য ধন্য!" আমি বাঁকা হেসে বললাম: "ভাই, এ-ধন্যতার উদ্ভব হয়েছে তো তোমারই মগজে।" ও তখন ফাঁশ করল—প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারি-পুঙ্গবকে ও টেলিফোনে বলেছিল যে, আমি এক পেল্লায় গায়ক, তার উপরে মহাত্মা গান্ধির খবর রাখি। ব'লেই জুড়ে দিল: "তুমি কিন্তু ছেড়ো না, তার কাছ থেকে আদায় কোরো টলস্টয়ের কথা—মাসারিককে টলস্টয় শুধু যে বন্ধুপদে বরণ করেছিলেন তাই নয়, চিঠিও লিখতেন প্রায়ই ·" ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে-সময়ে ওদেশে চেকোশ্লোভাকিয়ার জয়জয়কার। সবাই বলত—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে য়ুরোপে এক আশ্চর্য নবজাতিগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন দুটি মানুষ: মাসারিক ও তাঁর মিত্র তথা মন্ত্রী বেনেস। আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু টীকা করতে পারব না—কারণ আমি জানি না ঠিক কী ভাবে মাসারিক নবরাজ্যের জনক তথা পালক হয়েছিলেন। আমি শুধু জানি—তাঁর রাজ্যে সবাই তাকে গভীর শ্রদ্ধা করত এবং অনেকেই তাঁকে বলত মহাপুরুষ। এর কারণ—তাঁর দীপ্ত ব্যক্তিরূপ তথা সাহিত্যপ্রতিভা যার রঙে তার দার্শনিক গবেষণাও নাকি রসাল হ'য়ে উঠত—বিশেষ ক'রে (বের্গসঁ-র মত) তাঁর ভাষাশৈলীর প্রসাদে। আর জানি এই যে তিনি টলস্টয়ের সঙ্গে কথালাপ ক'রে তাঁর প্রিয় বন্ধু হ'য়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু এসবই আমার শোনা কথা। তাছাড়া বলেছি তো গোড়াতেই যে, অনেক কিছুই ভুলে গেছি গত পঞ্চাশ বৎসরে। কেবল আজো আমার মনে অবিস্মরণীয় দীপ্তিতে ঝলমল করছে তাঁর ব্যক্তিরূপ—পার্সনালিটি। তাঁর মুখে সত্যিই একটা আভা জ্বল জ্বল করত।

প্রেসিডেন্টের রোলস্ রয়েস মোটরে চ'ড়ে আমার সে কী ফূর্তি! এ পাশে মার্থা ও পাশে ভ্লাদিমা। ওরাও গদ্‌গদ। কারণ ওদের দৌলতেই আমি রাজ-অতিথি হ'লেও, আমার দৌলতেই তো ওরা সাক্ষাৎ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে ভোজনানন্দ তথা শ্রবণানন্দের নিমন্ত্রণ-বর পেল!—মহানুভব মাসারিকের কথামৃত সেবনে গৌরব বোধ না করবে কে?

প্রেসিডেন্ট মাসারিকের চেহারা আমার মনে নেই—থাকতেই পারে না মাত্র একবার দেখে—কিন্তু মনে আছে—তাঁর ব্যক্তিরূপের পুণ্যপ্রভা। সত্যই মনে সম্ভ্রম জাগত। রাজা মহারাজা তো আছে জগতে অগুন্তি। কিন্তু হাজারো তাজ তকমা কৃপাণ পরলেও ব্যক্তিরূপের আলো-কে তলব করা যায় না। এ-আলো মুখে ফোটাতে যে পারে সে আপনি পারে। যে পারে না সে কেবলমাত্র বর্ম

চর্ম শিরস্ত্রাণ-এর দৌলতে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে না। বলতে কি, আজ পর্যন্ত কেউ পারে নি ব্যক্তিরূপে গূঢ় তত্ত্বটির রহস্য ভেদ করতে। কেন যদুবাবুর অসামান্য পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি সভা-উজ্জ্বল জামাই হ'তে পারেন না, আর কেন ছিন্ন কন্থায়ও অনেক যোগী রাজকন্যার বরমাল্য পায়। কেবল এইটুকু সবাই মানে যে, এই রহস্যময় পার্সনালিটির প্রভাবেই মহাপুরুষদের কথায় সুধা ঝরে জ্যোতি ঠিকরে পড়ে।

মাসারিক ছিলেন স্বভাবে গম্ভীরাত্মা। কিন্তু মনে আছে হাসলে তাকে বড় চমৎকার দেখাত—আরো এইজন্যে যে, এই নিয়ে মার্থাতে আমাতে প্রায়ই বাধত। সে বলত সঘনে: "মাসারিক দার্শনিক ব'লেই তাঁর হাসি তাঁকেই এমন দীপ্যমান ক'রে তুলেছে"। আমি বলতাম সমান সঘনে: "দেৎ—এমন দার্শনিক ঢের দেখা যায় যাকে দেখলে মন ব্যথিয়ে ওঠে, বলে: আহা, রে! এ হেন চেহারা মূলধন খাটিয়ে কী পাবে বাছা?" ভ্লাদিমা হেসে আমার সঙ্গেই সায় দিত, তবে বলত যে মাসারিকের দার্শনিক গ্রন্থ পড়ার পরে তাঁর মধ্যে ও যেন এক নব আশ্বাসের সন্ধান পেয়েছে। হবে। কিন্তু এবার আসি রাজপ্রাসাদে কথন তথা ভোজন পর্বে।

প্রেসিডেণ্ট মাসারিককে দেখবামাত্র মনে সমীহ আসে—শুনেছিলাম ভ্লাদিমা ও মার্থার মুখে। কিন্তু আমি শুধু সমীহই বোধ করি নি, মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর আকর্ষণী শক্তিতে। এ-শক্তি রাজপুরুষদের মধ্যে প্রায়ই স্তিমিত হ'য়ে আসে তাঁদের পদবী ও তখমার দুঃসহ আত্মম্ভরিতার চাপে। আমি ঠেকে শিখেছি বহুবারই যে, যে-মানুষ কখনো রাজপদবীর নাগাল পায় নি সে রাজপুরুষ হ'তে না হ'তে বদলে যায় তার চাল চলন হাসি সম্ভাষণের ঢঙ। এ-বদল না হ'লে হয়ত অনেক সুবিধাবাদী একটু বেশি রকম চড়াও হ'তেন কাছ ঘেঁসে বসতে—জানি না। তবে যেটা জানি সেটা এই যে, হোমরাও চোমরাওদের দূর থেকে দণ্ডবৎ করাই ভালো। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট মাসারিকের সৌজন্য ও শালীনতা এতই স্বাভাবিক ছিল যে তাঁর কাছে এসে বসতে আমার মন একটুও কুণ্ঠিত হয় নি। আমার মনে হয় এর মূল কারণ তাঁর ভাবুকতা। ওমরাওরা প্রায়ই চিন্তার ধার ধারেন না, চলতি বুলি ও জিগিরেরই কারবারী হ'য়ে চলেন প্রতি হুজুগের জোয়ারে গা ভাসিয়ে। প্রেসিডেণ্ট মাসারিক এ-জাতের সুবিধা-বাদীদের দলে নাম লেখান নি। তিনি জন্মেছিলেন এক সহজাত আকর্ষণী শক্তি নিয়ে যার আরো স্ফুরণ হয়েছিল তাঁর গভীর চিন্তাশীলতার ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসাদে। তাঁর নানা মন্তব্য আজ আর মনে নেই—ভুলি নি তাঁর টলস্টয় সম্বন্ধে সসম্ভ্রম উৎসাহ। উৎসাহ—কিন্তু পূজা নয়। কারণ টলস্টয়কে

তিনি ঋষি মনে করতেন না, মনে করতেন মহানুভব রূপকার, বরেণ্য বিশ্ব-প্রেমিক। শিল্পকলা সম্বন্ধে টলস্টয়ের বাণীতে মাসারিক কোনোদিনই সাড়া দিতে পারেন নি, তাই কোনোদিনই তাঁর এ-মতে সায় দিতে পারেন নি যে, যা কিছু সর্ববোধ্য তাই প্রথম শ্রেণীর আর্ট। মাসারিক বলেছিলেন: শিল্পকলার উচ্চবিকাশের বিরুদ্ধে টলস্টয়ের জেহাদ শুধু যে অগ্রাহ্য তাই নয় তাঁর এ-যুক্তি ছেলেমানুষ যে, যাকিছুতে এখনি এখনি সবাই সাড়া দিতে না পারবে তা যথার্থ শিল্প নয়। মাসারিক বোলাঁর মতেই সায় দিয়েছিলেন যে, বড় শিল্পী সকলের জন্যেই রূপ সৃষ্টি করেন একথা অনস্বীকার্য হ'লেও যদি এ সূত্রটির ভাষ্য করি এই বলে যে, গ্রহীতার গ্রহিষ্ণুতার (receptivity) বিকাশ না হ'লেও সে মহত্তম শিল্পের গুণগ্রাহী হ'তে পারে তাহ'লে সেটা হ'য়ে দাঁড়াবে একটি হসনীয় বুলি, সস্তা জিগির। কারণ—বলেছিলেন মাসারিক গাঢ়কণ্ঠে—টলস্টয় তাঁর শেষ জীবনে যে তাঁর প্রাসাদ বিলাস ছেড়ে ধান কাটতে ছুটেছিলেন "মুজিক"—দের (কৃষাণ) সঙ্গে এবং এবং শেষে মৃত্যু বরণ করেছিলেন এক সুদূর রেল স্টেশনে, এজন্যে তাঁর হৃদয় টলস্টয়ের প্রতি গভীর ভক্তি বোধ করলেও তাঁর বুদ্ধি এ সেন্টিমেণ্টালিটিকে কোনোদিনই সমর্থন করতে পারে নি, কেন না যে-উচ্ছ্বাস আদর্শবাদের নাম ক'রে আমাদের দিয়ে বলিয়ে নেয় যে, মুজিকদের অভাবক্লিষ্ট দীনহীন জীবনই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন সে-উচ্ছ্বাস বাইরে থেকে দেখতে মহনীয় হ'লেও আসলে ঠুনকো, ধোপে টেঁকে না। একথার টিপ্পনি করতে মাসারিক বাইবেলের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন: এক প্রভু তার দুই চাকরের কাছে কয়েকটি মুদ্রা (talent) রেখে বিদেশযাত্রা করেন। তিনি ফিরে এলে একটি চাকর তাঁকে বলে: "প্রভু, আপনার টাকা কয়টি খাটিয়ে আমি ডবল করেছি—এই নিন।" প্রভু খুশী হ'যে তাকে সে সবই বখশিস দিলেন সাবাস ব'লে। অন্য চাকরটি বলল: "প্রভু, আপনার টাকা কয়টি আমি সযত্নে বাক্সজাত ক'রে রক্ষা করেছি—এই নিন।" প্রভু তার হাত থেকে টাকা কয়টি নিয়ে তাকে অর্ধচন্দ্র দিলেন। এর ভাষ্য এই—বলেছিলেন মাসারিক—যে, মানবজীবনের যে-অদৃশ্য নিয়ন্তা প্রতিভার বর দেন তিনি চান আমরা তাকে খাটিয়ে মূলধন বাড়াব—যে তার প্রতিভা মনীষা বুদ্ধি না খাটিয়ে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলে, তার জীবন অকৃতার্থই থেকে যায়। এই সম্পর্কে মাসারিক আমাদের গীতারও উল্লেখ করেছিলেন, বলেছিলেন—গীতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল যৌবনেই—এবং তখন থেকেই গীতার স্বধর্ম ও স্বভাবের আইডিয়ায় তাঁর মন সাড়া দিয়েছিল। অর্থাৎ, মানুষের স্বভাবই হ'ল তার শ্রেষ্ঠ দিশারি, স্বধর্মই তার পালনীয়। তাই যে-মিথ্যা আদর্শবাদ টলস্টয়ের মতন লোকোত্তর প্রতিভাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট

করতে চেয়ে সাহিত্য ছেড়ে ধান কাটবার উপদেশ দেয় সে-আদর্শকে তিনি বরণীয় মনে করতে পারেন না। ব'লে শেষে মাসারিক এই মন্তব্য করেছিলেন যে, টুর্গেনিভ অকারণ টলস্টয়কে অনুরোধ ক'রে লেখেন নি তাঁর বিখ্যাত পত্রটি যাতে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন যে রাশিয়ার সর্বোত্তম প্রতিভাধরের মুখে শিল্প কাব্য কলাকারুর নিন্দা আত্মঘাতের মতই শোনায়।* মাসারিক বলেছিলেন টুর্গেনিভ ঠিকই ধরেছিলেন—যে, টলস্টয়ের মহান হৃদয় কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তিকেই পরম দিশারি ব'লে বরণ ক'রে বিপথে পা দিয়েছিল। মাসারিক জোর দিয়েই বলেছিলেন যে হৃদয়াবেগ সুন্দর কিন্তু তার যথাস্থানে—আবেগের রমণীয় লোকে। চিন্তার জগতে দিশারি—নিস্পৃহ শুভ্র বুদ্ধি, হৃদয়াবেগ বা রঙিন উচ্ছ্বাস নয়।

এই সূত্রে মহাত্মা গান্ধির কথা তুলল মার্থা: তিনিও কি শুধুই মহানুভব, না ঐ সঙ্গে এ-যুগের দিশারিও বটে। (মনে রাখা চাই—এ-কথালাপ হয়েছিল ১৯২২ সালে প্রাগে।) উত্তরে মাসারিক অনেক কিছুই বলেছিলেন, সব মনে নেই, তবে এটুকু মনে আছে যে, তিনি বলেছিলেন—খৃষ্ট টলস্টয় ও থোরো এই তিনটি মহাপুরুষের মিলিত প্রভাবে প'ড়ে মহাত্মা গান্ধি যে-ভাবে তাঁর পথ কেটে চলেছেন অকুতোভয়ে, ভাবতেও তাঁর মনে সমীহ জাগে। কিন্তু তাঁর মনে হয় না—নিটোল অহিংসার পথে কোনো পাশ্চাত্য নেতার লক্ষ্যসিদ্ধি হ'তে পারে। এ-বিষয়ে তিনি জোর দিয়ে কিছু বলেন নি, তবে যা বলেছিলেন তার মর্মবাণীটি এই যে, জর্মন সৈন্যচমূ বা বলশেভিক চেকা পুলিশের রাজ্যে অহিংস অসহযোগের পথে অন্তিমে পরাজয়ের সম্ভাবনাই বেশি। এ-প্রসঙ্গে সাউথ আফ্রিকার কথা উঠতে বলেছিলেন যে, সাউথ আফ্রিকায় মহাত্মাজি দাঁড়িয়েছিলেন ইংরাজদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ইংরাজ জাতি শুধু যে স্বভাবে নিষ্ঠুর নয় তাই নয়, খতিয়ে য়ুরোপের সভ্যতম সংস্কৃতির বাণীবাহ সে-ই। জর্মন বা বা বলশেভিকদের সম্বন্ধে একথা বলা যায় না—যারা এখনো মনে করে—বলং বলং বাহুবলম্। কিন্তু তা'বলে মহাত্মাজির মহত্বকে তিনি নমস্কার করতে নারাজ নন—একথা বলেছিলেন তিনি সসম্ভ্রমেই। বলেছিলেন: "তাঁর সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয় আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিও। আমি দূর থেকে যতটা পারি বুঝতে চেষ্টা করব তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের অনস্বীকার্য মহিমা। তবে আমার মনে হয় না ইংরাজদের এলাকায়ও এ-আন্দোলনে তোমরা স্বরাজ্য পাবে।"

*টুর্গেনিভ মৃত্যুশয্যায় ১৮৮৩ সালে জুনমাসে অতিকষ্টে পেন্সিল দিয়ে একটি চিঠিতে টলস্টয়কে লেখেন: "সাহিত্যে তুমি ফিরে এসো এসো এসো। যদি আমার এ-চিঠির তুমি কোন মূল্য দাও আমার হবে সুখমৃত্যু। রুশদেশের মহাকবি। আমার প্রার্থনায় তুমি কান দাও।"

মহাত্মাজি ও টলস্টয় সম্বন্ধে তিনি আরো অনেককিছু বলেছিলেন যা স্মরণীয় ও বরণীয় হওয়া সত্ত্বেও আমার স্মৃতিলোক থেকে পিছলে গেছে। মাসারিক তর্পণের এখানেই ইতি করি শুধু আর একটি কথা ব'লে।

কথাটি এই যে, নানা দেশে মাসারিকের মতন প্রেসিডেন্ট হয়ত আরো হবে কিন্তু ভাবুক ও মনস্বী জাতিসংগঠক অদূর ভবিষ্যতে আর কোনো প্রেসিডেন্টের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠবে এমন আশা দুরাশা। এ-সম্পর্কে আমাদের দেশগৌরব প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণের কথা স্বতই মনে হয়। কিন্তু তাঁকে (প্লেটোর ভাষায়) "ফিলসফার কিং" উপাধি দিলেও "জাতিসংগঠক" অথবা দেওয়া চলে না। তবু ভাবতেও আনন্দ হয় যে, মাসারিকের পরে একমাত্র প্রেসিডেন্ট রাধাকৃষ্ণণই দাবী করতে পারেন "দার্শনিক রাষ্ট্রপতির-র" মহৎ জয়টীকা।

ABOUT MIRACLES

To February 5, 1959

Sir Paul Dukes, Poone

Knight Commander of the British Empire,

Dear brother,

I thank you for remembering to send me your book. 'Yoga For the Western World.' I have read it through with interest and feel sure that your readers in the west will have a better understanding of the message of our Yoga and, what is more, realise how it can help a genuine seeker of the truths of the Spririt even as it has helped you. You moved our hearts when you told us once, warmly, how our Yoga had proved to be "your teacher". So I was all the more interested when I read in the very first chapter of your remarkable book

"Now my only justification for saying anything at all, humbly and without any presumption, on the subject of the very ancient philosophy of Yoga is that many have found satisfaction in its common-sense idealism after suffering disappointment in their search for enlightenment in other fields It is a philosophy to which I myself owe much and I have seen it become of assistance to many who were left stranded and in despair from the confusion of voices in churches and other religious and philosophic societies".

As I was reading these significant lines, it was borne home to me how I, too, was helped once when I was left stranded and in despair, and how the Lord of Yoga worked a miracle to shed light in one of the darkest hours of my life. I feel tempted to relate it to you as, after reading your book, I feel convined that you will not laugh it away like a typical sceptic. How can you ? Have you not told more than once that you believe in the Gita's dictum : "*Shraddhavan labhate jnanam* : those who believe reverently win through to enlightenment."

But before that I owe it to the Lord of truth to confess penitently that there was a time when I used to laugh at all saints, mystics and devotees who had solemnly testified to the authenticity of such strange phenomena. I used to mouth modern slogans like hallucination, autosuggestion, self-hypnotism

and what not to explain it all away, even though my Gurudev himself came to assure me, time and time again, that such divine miracles were not only indubitably authentic—having happened to himself as well as many another—but also intrinsically beyond the understading of mental reason.

Since his passing, however, such miracles began to be enacted before my bewildered eyes so regularly every full moon, that my learned scepticism was pulverized. Only I was faced now with a new difficulty—to wit, that whenever I spoke of such miracles to my learned friends, they began, sceptically, either to dismiss them as impossible or else to explain it all away as make-believe—just as I had been wont to do of old. The tables, alas, were now turned on me to the amusement of the mystics, I presume!

A few months ago, I was talking to a friend, rather unguardedly, about such phenomena as I could attest from direct experience. I remarked, incidentally, that Divine Grace sometimes reveals itself through significant divine miracles to open our eyes to an inner reality we mostly choose, alas, to ignore. He broke in suddenly with a pointed question: "But do you really mean to tell me that there is such a thing as a divine miracle?"

Somewhat taken aback, I evaded and asked: "May I ask why you feel so unhappy about it?"

"Well", he answered a trifle hesitantly, "I don't know how to put it but···er···I am persuaded that the divine miracles which baffle us today shall seem commonplace—if not profane—tomorrow when we shall have acquired a deeper knowledge of their *modus operandi*; in other words, the more we shall find out about miracles the less will they succeed in baffling us That is my thesis, anyway."

I caught my breath, as not so very long ago, I myself used to hold somewhat the same view; then I said: "I concede it as a tenable thesis, only may I warn you darkly that the 'deeper knowledge' you look forward to may well act the other way round so that knowing more may well make you actually more sad than wise."

My friend, who had a sense of humour, laughed. "I see what you mean", he said, "for it so happens that I was lately reading a book on nuclear fission and atomic power. There the author says that the behaviour of modern electrons instead of elucidat-

ing the mystery of matter somehow puzzles scientists of today even more than the atom did their predecessors. Well, the joke does seem to hit the target in that this electron proves, alas, even more shadowy than its descredited ancestor, the ghostly atom. For all that, when all is said and done, is not this cosmos of ours essentially an orderly whole and as such must be governed by inexorable laws, physical or otherwise? For if here you agree, as I presume you do, then does it not follow that even the strangest phenomena today must become completely understandable tomorrow?"

"My answer is yes and no". I countered. "Yes, because I, too, believe that what seems utterly opaque to one person does seem less so to another who knows a little more And no, because I do not believe, with you, that the human mind can rationally demand that everything that happens in this cosmos must be understandable in the sense of being amenable to its mental logic To be more explicit, I contend that although our psychic intuition about a Divine Law working at the heart of our material world is true, it is no less true that the Divine Law-maker, not being a prisoner of His own laws, can also be a law-breaker at will. This I say, however, not from the point of view of devout faith but of indubitable experience, which, I claim, is the last touchstone of Truth. And I hold this view because I have seen again and again—especially after Gurudev's passing—that the Divine Grace has acted on me and Indira in a way which cannot but seem lawless and arbitrary to our hidebound mental reason which is at home, alas, only in the world of *karma* it has been born and bred in. In fact that is precisely why the rational scientist frowns so often on miracles—I mean, because these do confound his mind and so put him out of countenence. But he has only himself to thank for his discomfiture, because he has persisted irrationally in looking down on the mystic who has experienced Divine Grace and seen that miracles can be done by the Divine with a purpose which is other than that of satisfying the mind. Since, however, the rationalist rejects this position which we mystics have come to after direct experience of Divine Grace, how can he possibly accept our other testimony : that miracles wrought by Divine Grace can and help our spiritual evolution? At all events, my view, in a nutshell, is that miracles should be neither

poohpoohed nor explained away but made use of gratefully, in the way the Lord intends"

My friend looked a trifle mystified and said: "I thank you for your explanation, Dada. Only I am not all sure that I have understood it yet. So could you give me an illustration of this Divine Grace working a miracle—I mean an illustration from your own direct experience—and also explain how one is to 'make use of it in the way the Lord intends?'"

I hesitated for a space, then said: "Well, I will risk it, since you have asked for it. Listen.

"Divine miracles began happening to me in a most baffling way after Gurudev's sudden passing in December 1950, when I was very unhappy and restless. I will omit the first series of miracles which came to give me not only a new strength and certitude but a new vision as well, and made me realise that the Lord was not indifferent to my deep pain and suffering. But although through these incredible miracles my faith in His Grace was substantially fortified, things happened which would get me down now and again till a marvellous sign was given to cure me completely of my intermittent dejection and despair. It happened like this.

"When Gurudev died in 1950, a deepening despondence came to cast a gloom over me which I simply could not reject for good and all, because the feeling used to come over me that my Lord did not care for me, otherwise I would not have felt derelict so often. It was at this juncture that divine miracles first started happening before my eyes to lift me out of my meloncholy.

"For all that, my despondence and gloom returned time and again at frequent intervals till, sick and weary of this continual wrestling with my defeatist doubts, I began to persuade myself that I had better 'throw up the sponge'—it was no use—I could not possibly arrive—I was not fit—if I had been marked by the Lord for His own I should have realised Him when my Guru had been there in the flesh···and so on—just when the thing happened, here in Poona, two years ago and delivered me once and for all from the grip of the Demon of discouragement."

I paused and took my friend to my bedroom where I showed him under a little wooden arch a bulb over the head of our Lord's marble Image. I showed him also the button just above

it which, when pressed once; lit the bulb, and pressed again put it out. The Image stood a few yards away from my bedstead.

"It was about II P.M. and I had just gone to bed, feeling utterly lost and God-forsaken. Suddenly I felt thirsty and called out to Indira who brought me a glass of water. I was at the time praying to the Lord, in deep dejection, to show me once more a fresh sign of His Grace, as I was by now nearly at the end of my tether when, suddenly, the bulb over the Lord's Image was lit. Indira who stood near me beside my bed, cried out : 'Look, Dada : Your prayer has been heard : He has lit e bulb over the Image !'

"But no sooner had she acclaimed the miracle, than the light went out again ! I stretched out my hand in the semi-darkness—but there was Indira standing near my head, no mistake, while the Lord's Image was at least two yards away from my bed !

"I now sat up in amazement when the light flashed out again ! Then, as we both gave a smothered cry in astonishment, it went out once more. It almost seemed as though somebody were playfully going on pressing the button up and down over and over again—thus alternately lighting and putting out the bulb—till after a dozen times, the light went out for the last time leaving us in the dark, literally as well as figuratively.

"I laughed aloud and said : 'Lo and behold ! For the Lord of the universe to have grown so impotent ! Since He, evidently, did say to Himself 'let there be light'—and yet only darkness came to stay ! I had hardly cracked the flippant joke when the bulb was lit once again and this time it was a golden light that came to stay, not semi-darkness !

"I felt thrilled to the core ! What an incredible miracle and to think that it was wrought by the Lord Himself so convincingly, at the eleventh hour ; I sang out : "Jai Guru, Jai Guru, Jai Hari Jai !'

"Indira, in tears, prostrated herself before the Lord's Image and I followed suit, in a grateful exaltation bordering on ecstasy."

My friend stared at me. "But do you mean to imply," he gasped, "that He—the Lord Himself—came down to play with you, like this, just to help you out of your bleak depression ?"

"If it were not the Lord Himself," I laughed, "it must have been some agent of His who did His bidding—which in the last analysis, comes to the same thing, doesn't it! For the irrebut-table fact is that the button had been pressed down a dozen times till the tapper suddenly stopped, to leave the bulb lit. And the fact that the light came and went out alternately so many times—well, what did it amount to, in the last resort? Wasn't it just this that the Lord had made the demonstration pretty convincing because He wanted, by the sign He gave, to lift me out of the rut of my deep depression? At all events, I was reminded at the time of His assurance in the Gita: '*Na me bhaktah pranashyati*- my devotee can never perish.' Add to this the fact that this singular miracle cure me effectively of my self-pity once and for all, and you will understand why I cannot but interpret this as the Divine Grace intervening to work a miracle—not to astound but to heal, as it did through Krishna, Christ, Trailanga Swami, Sri Ramkrishna, Sri Bijoykrishna, Swami Vivekananda and a galaxy of other saints and sages in the past. Do you understand?"

My friend was impressed, at long last, thank God, and said. "I admit defeat, Dada! I will never belittle miracles again. You have convinced me that there is such a thing as Divine Grace working a miracle to help us on in our soul's pilgrimage to Him."

With love and blessings
Dada

RAMDAS ANSWERS

Question : How many types of Samadhis are there ?

Answer : There are three kinds. They are Savikalpa, Nirvikalpa and Sahaja.

Question : Please describe each type of Samadhi.

Answer : In Savikalpa Samadhi you see your Beloved in some form before you ; of course outside you. On seeing this form you go into ecstasy. You get this Samadhi in the pure state of Sattwa Guna.

Nirvikalpa Samadhi makes you lose your body-consciousness by getting merged in the absolute, the all-pervading, nameless, formless existence in which all sense of duality is completely lost. You are so much identified with the Divine that, as a separate entity, you cease to exist. In this state your senses, your mind, your feelings, your body, are all perfectly at a standstill and you are completely unconscious of them or of the world. This is the realisation of the impersonal aspect of God.

After the experience of Nirvikalpa, when the Samadhi is disturbed, you come back to the body-consciousness, still retaining your inner awareness of the immortal state. This awareness should get stabilised. Then your entire being is filled with that joy and peace which you had experienced in Nirvikalpa. Thereafter, you live, move and have your being in God in all states, in all situations and conditions. You have no more to struggle for achieving anything, as you have attained that by gaining which you have gained everything.

Question : Is not Nirvikalpa Samadhi considered by many as the final experience ?

Answer : That should not be considered as the final experience. In the self-absorption of Nirvikalpa Samadhi, you are conscious of Him, but very often, as you come out of that state to the physical plane, you lose Him. But here in Sahaja you are one with Him always, even on the physical plane, while you are engaged in the activities of life. You are ever in tune with Him and never separate from Him. The term Sahaja Samadhi suggests that even in the normal condition you are one with Him.

Question : What is your opinion about solitude for spiritual aspirants ?

Answer : For some it may be necessary that they should retire from the world for a long period and live in solitude for realising God. For some others a short period of seclusion now and again may be of great help. They do not feel the need of cutting themselves away from the world for a long time. So there is no hard and fast rule regarding solitude. The object of retiring from the world is to uproot from the mind hate, wrath and all the desires. Those who do so feel they are not able to remove these remaining active in the world where they come daily in contact with persons whose life is not such as to encourage them on spiritual path. It is necessary to avoid such worldly surroundings, go into solitude and get established in divine consciousness. Then one may return to the world, love those whom one was hating, move on friendly terms with those who were once disliked, and maintain peace and joy in all activities. It is not absolutely necessary in all cases. There were saints who lived a family life, and who still were able to be detached from the world and remember God constantly. Ramdas remembers a beautiful line of Emerson : "The great man is he who enjoys the sweetness of solitude in the midst of the crowd".

(From Ramdas's Ashram monthly, VISION · September, 1971)

AN EXCERPT FROM SIR PAUL'S SECRET AGENT "S. T. 25"

I told Mrs. M. on no account to say I was an Englishman, as I intended to return to Russia and therefore did not wish to be talked about, but to let them think I was a Swedish refugee.

I was amazed at the courageous manner in which Mrs. M. stood the strain of this formidable adventure. She had been in prison many weeks, living on scanty and atrocious prison food, subjected to long nerve-racking cross-examinations, yet she bore up better than any of the other females, and after rest-halts was always the first to be ready to restart. There were ditches to cross and narrow, rickety bridges to be traversed. And once an alarming incident occurred. Our guide, laden with parcels, suddenly vanished, sinking completely into a dyke which had filled up with drifted snow. He scrambled with difficulty up the other side, all wet from the water into which he had plunged through the ice The snow was so soft that we could find no foothold from which to jump, and it looked as if there was no means of crossing. Then the idea occurred to me that if I threw myself across on my stomach I might make a bridge with my body for the others to step over. Planting my feet firmly, I threw myself across the dyke, digging my hands into the other bank. I called to Mrs. M., who was the pluckiest, to step on my back and run accoss. She did so, and was followed by the other lady. Then came the two girls and finally Herschelman When they were all safely over I wriggled across on my stomach.

Finally I said I would accept any book she would like to choose out of her library. ··· She jumped up with alacrity, disappeared into the library, and returned with a volume of poems by Tiutchev—the "people's poet"—opened at the following lines :

> Umom Rossii nie poniatj ;
> Arshinom obshchym nie izmieritj ,
> U nici osobiennaya statj !
> V Rossiu mozhno tolko vieritj.

These lines are untranslatable in their original simplicity, but I venture to append my own free rendering :

Seek not by Reason to discern
The soul of Russia, or to learn
Her thoughts by measurements designed
For other lands. Her heart, her mind,
Her ways in suffering, woe, or need,
Her aspirations and her creed
    Are all her own—
    Depths undefined,
To be discovered, fathomed, known,
    By Faith alone.

(CHAPTER XII, "AUNT NATALIA")

পরিশিষ্ট খ

CARLYLE has aptly said : "A sincere man is a hero." Any one who has met Shahid Suhrawardy will agree with this famous dictum. He stood out – first and last and in the middle—as a sincere soul aspiring for two values : truth and beauty He suffered much but suffering only brought out the more luminously his sincerity and tolerance which made him so lovable throughout his chequered life –chequered at every bend in his life's long journey.

But not chequered only He was also brilliant a man in every sense of the term. He graduated from Calcutta University with Honours in English in 1910 and then in Oxford in 1914. He went then to Russia and spent four years there when the very ground under his feet shook under the impact of the Bolshevik Revolution. He had to escape as he had disliked the Bolshevik regime and did not mince his words when friends asked him his opinion. In Moscow he had become a producer of the world-famous Moscow Art Theatre, His friends - the far-famed Katchalov and Madame Germanova—also escaped with him into Berlin where the Moscow Kunttler Theatre stirred the hearts of thousands by their marvellous acting. It was there I first met him. He came to me to ask me to compose the music for Rabindranath's *King of the Dark Chamber* which they wanted at the time to put on the stage in the Berlin The project fell through, but Shahid became a real "cynosure of neighbouring eyes" among the German connosseurs of the histrionic art, a thing not to be wondered at as he was not only a highly gifted "regisseur" as they called him, but also a shining personality who sparkled in any gathering whether artistic or intellectual. He was cultured to his finger-tips and a remarkable linguist. He spoke fluently at least half a dozen continental languages. His command of English and Russian in which he could lecture won the admiration of all who heard him. I can almost recapture to this day the mischievous smile on his lips when he cracked his jokes or made his repartees. To give an instance or two of his wit.

I had made a number of Russian freinds in Berlin among whom were three sisters. One of them was a fine pianist and another a dancer. On the occasion of the birthday celebration of the eldest, Minna Perlemann, I invited Shahid. He turned up half an hour late for dinner. Minna pouted her lips and said : "Mais

il faut etre ponctuelle. Monsieur !"* Pat came the rejoinder : Mais je vous demande pardon, Mademoiselle ! Ponctualite, cest le commencement de materialism"** And he was forgiven in a chorus of laughter. Then he started consolidating his victory. He spoke in French, but I will give it in English.

'You chated at unpunctuality, *ma cherie*, but had you been a guest of the Nizam you would have learnt to appreciate how happy one could be if one lived in eternity as they assuredly do in Hyderabad. Listen. There was at the time I was the Nizam's guest, a high English official staying with him in the room next to mine. He had to take the train to Aurangabad : he was to see the Ellora Caves, you know. I told him not to go to the station in time as in Nizam's dominion the trains were always proverbially late. But as he was English to the core, ergo, punctual to a fault, he wouldn't listen. So, in despair, I had to go with him to the station ten minutes before the time. The guard whistled just one minute before the train was to start. So my friend smiled at me 'So my friend, you see, I was right the train *has* started in time, to the minute'. I gave him a more devastating smile and riposted : 'But no, my friend. It is yesterday's train'. And how the three sisters giggled !

I could go on detailing his brilliant jokes and wisecracks had space been at my disposal. But I have to be serious now.

Shahid made his mark wherever he went. After his Berlin stay he went to Paris, where I met him once again, as the Secretary to the Artistic Section of the League of Nations. Then he was appointed to the Nizam Professorship of Islamic studies at the Vishwabharati. Thereafter he became the Bageshwari Professor of Comparative Fine Arts at the Calcutta University where he gave brilliant lectures from 1932-43.

It was there I met him once again and we had a lovely time together with Netaji Subhas Bose who also fell under his irresistible spell. And sometimes, we used to visit Sarat Bose's house whenever Pandit Jawaharlal Nehru visited Calcutta. I was wont to exhibit Shahid in pride to my friends, itching to shine in his light as well as to thrill my friends. And Shahid never failed me for he invariably rose to the occasion to make the party go. People loved to hear him talk or, shall I say, coruscate with his quips and lampoons, anecdotes and reminiscences.

Thereafter he had to leave Calcutta for reasons I need not state. But he was not at all happy in Pakistan even though his brother H. S. Suhrawardy helped him in his hour of need by appointing him Pakistan's Ambassador to Spain in 1955.

---

* You ought to have been punctual Monsieur !

** I beg your pardon Mademoiselle ! For punctuality is the beginning of materialism.

I should have mentioned that I met him for the fourth and fifth time in New York and London respectively where I had to sing and Indira dance (in the course of our world-tour, as our cultural tour had been financed by the cultural department of the India Governmeut under Abul Kalam Azad and Pandit Nehru). He came to appreciate warmly the spiritual personality of Indira and implored her to remember him in her prayers. When we had finally settled in Poona I wrote to him and sent him our play on Mirabai entitled. *The Beggar Princess.* He wrote back at once :

Pakistan Embassy, San Sebastian August 4
Madrid, Spain. 1956 Spain.

My dear Dilip,

I cannot tell you what a pleasure it was to me to get your letter which Vladiva sent on from Italy. You call me a nomad, but I am only of this earth and not like you, of the skies. I feel all the time that you are still in the land of the living, but it is a great comfort for me to fix your abode and think of your pervasive personality in a single spot. It is true I am Pakistan's Ambassador since a year and eight months···Spain is so deeply immersed in its catholicism that it takes no interest in the spiritual experiences of other lands. Nor is it rich enough to indulge in exotic manifestations of the spirit. So I do not think that in your next wandering you will be passing by here, but if I know your dates I could meet you in London, Paris or Rome.

I am extremely happy to get news of Indira Devi. I do hope she has not quite forgotten me. Her spiritual experiences interested me deeply. What can be better than to be endowed with the gift to realise the Lord in this life of ours ?

I was delighted to read your drama on Mirabai entitled *The Beggar Princess.* Mirabai is a splendid and beloved figure and I am so glad you have been writing about her. These days we are apt to forget so many beautiful and miraculous things that have been ·····You have not lost your appreciation of precious words unfolding precious thoughts. I will be thinking of you with love.

With affectionate regards to both of you,

Yours ever,
Shahid

After that I had no news of him for seven long years. I knew of course, that he had been recalled after his brother and sponsor, H. S. Suhrawardy, had to abdicate, but did not know

where Shahid was till I heard a rumour that he was in Karachi in a derelict condition. I wrote to him at once and he wrote back that he was bed-ridden with heart-trouble. I wrote at once to Panditji about his illness requesting him to invite him to Deihi for treatment if it was at all possible, and added :

"To talk to him and hear his brilliant discourses about the cultural achievements of different races is a sheer joy apart from being an education in itself. But what endeared him most to me, Panditji, was his poetical talent which might well have evolved into genius had he only persevered in invoking the Muse to help him give voice to his deepest aspirations in the realm of art and poetry which he loved passionately since his adolescence and studied in divers lands in divers traditions."

I wrote also, in a postscript, how I used to love Shahid's lovely poems, some giving off, as it were the delicate fragrance of violets laden with a nostalgic sadness, or else, breathing the poignancy of disillusionment of a born idealist. I sent him three of his poems in three different moods, two of which I give below as they were praised by Sri Aurobindo himself—poems which I had translated into Bengali and published in my Anami, First Edition (1935).

You will not rue me
When I am dead,
Like a careless flower
Dropped from your head.
But some stormy day,
By some firelight hour,
I'll stir in your soul
Like an opening flower.
You will smile and think
And let fall your book,
And bend o'er the fire
With a far-off look.

The other is an autobiographical poem and one of the most moving poems of its kind, almost Baudelaiian in its intensity :

On those that wander in the sands,
Panting in thirst in sweltering heat ;
On those that stretch small helpless hands
To fend inexorable fate :
On those that irrevocably late
Bend down to kiss thy nailed feet,
On those who in the pale wastes of the sea
Hearken to her last threnody—
O Lord, rain pity ;

On those that in lone nights too deeply steep
Whose hearts are torn with vain despair
On those that in the prison's air
Dream flowering fields and cannot weep,
On those who in hunger cleave their night
And in sorrow keener than thy sword
On those that fall in unequal fight—
On all of them have pity Lord!
But most of all on him who has loved in vain
And thrown away the flower of his youth
For a fresh and fickle mouth
O Lord, shower thy grace
On him who in travail and in pain
Bends low his pale and sorrow sainted face
On the image of her, with wistful memory
Of the last-drunk bitter bowl
Of her caresses' treachery
O Lord, have mercy on his soul.

I pleaded with Panditji in this (somewhat unconventional) way as I was sure he was incapable of misunderstanding it. And I was not mistaken, for he did sympathise sincerely and replied to me promptly on May 29, 1963 :

My dear Dilip Kumar,

I am interested and rather sad to have news of Shahid Suhrawardy. I knew he had gone as Pakistan's Ambassador to Spain. After that I had no news of him.

I would gladly help him or do something for him. But I do not quite know what I can do. If he can come to Delhi, I would welcome and try to help him. I do not think I should write to him directly. My writing to his brother, H. S. Suhrawardy, will probably be misunderstood.

If you can, you might write to him and tell him that I have very pleasant memories of him and am sorry to learn of his illness. If he can come to Delhi he would be welcome here.

Yours
Jawaharlal Nehru

I sent a copy of this letter to Shahid who wrote back, moved.

Lakham House,
Karachi-5

My dear Dilip,

I am more than grateful to you for your love and friendship and through you also to Indira Devi for her kind wishes.